

মামলুক সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবারের  
বীরত্বপূর্ণ জীবনী

# দ্য সাহা

ইমরান আহমাদ

BanglaBook.org

সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স। চুয়ান্ন বছরের ছোট্ট একটা জীবন। তেত্রিশ বছরই যার কেটেছে অশ্বপৃষ্টে। সতেরো বছরের শাসনকাল। সতেরো মাসও নির্বিঘ্নে রাষ্ট্র চালাতে পেরেছেন কি-না সন্দেহ! সর্বদাই ছুটেতে হয়েছে শত্রুর পিছু-পিছু। দেশ থেকে দেশান্তরে। চিতার ক্ষিপ্ততায় চম্বে ফিরতে হয়েছে পাহাড়ে, জঙ্গলে-মরু বিয়াবান আর সমুদ্র উপকূলে।

আধুনিক মিশর, ইসরাইল, ফিলিস্তিন, জর্দান, লেবানন, সিরিয়া, তুরস্ক ছিল তার অবাধ বিচরণক্ষেত্র। তিন মহাদেশ ছিল কুরুক্ষেত্র।

তাকে একসাথে লড়াতে হয়েছে তিন-তিনটি দুর্ধর্ষ পরাশক্তির সাথে। তার দুর্দান্ত থাবায়ই মোঙ্গলদের পিলে চমকে উঠেছিল। ক্রুসেডমানসে ভীতি ছড়িয়েছিল। গুপ্তঘাতকরা পথ হারিয়েছিল।

ক্রুসেড যদি তাকে দিয়ে থাকে অমরত্ব-মোঙ্গলবধ করে তুলেছে আরো গৌরবদীপ্ত। গুপ্তঘাতক নিধন তার কীর্তিতে চড়িয়েছে আলাদা মাহাত্ম্য।

তীব্রগতি, বজ্রথাবার কারণে ক্রুসেডারদের চোখে তিনি ছিলেন ‘দ্য প্যাছার’-চিতারাজ। ক্রুসেডের দীর্ঘ ইতিহাসে খ্রিস্টানরা তার হাতেই সর্বশেষ ও প্রচণ্ড মার খায়। বস্তুত তার কঠোর কষাঘাতেই যবনিকাপাত ঘটে অন্তহীন ক্রুসেডের। ফলে তার ছিল আরো একটি ইউরোপীয় অভিধা-‘শেষ আঘাত’।

অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, সুলতান বাইবার্সের সেসব কালজয়ী উপাখ্যান, বর্ণাঢ্য বীরত্বগাঁথা বহুকাল ধরেই পর্দাবৃত হয়ে আছে। চেপে রাখা হয়েছে সুকৌশলে।

এই বই চায়, সামান্য হলেও মহাকালের ঘনকালো সে পর্দা সরে যাক। অনালোচিত ইতিহাসের দ্বার খুলুক। প্রজন্মের চিন্তায় গতি পাক।

# দ্য কাহিনী

ইমরান আহমাদ

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK**.ORG



কাল্পনা প্রকাশনী

তৃতীয় মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৮  
প্রথম সংস্করণ : এপ্রিল ২০১৭

© : প্রকাশক

প্রচ্ছদ : কাজী সাফওয়ান

প্রকাশক  
কালান্তর প্রকাশনী  
কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট  
01711 984821

পরিবেশক  
মাকতাবাতুল আযহার  
ঢাকা ও সিলেট  
01753 762880, 01715023118

অনলাইন পরিবেশক  
রকমারি, বইপার্ক, ওয়াফি লাইফ, রেনেসাঁ  
Price : BD ৳ 230.00, US \$ 10, UK £ 7

মুদ্রণ  
বোখারা মিডিয়া  
01712 905128

ISBN : 978 984 8871 96 7

**The Panther**  
by Imran Ahmad

Published by  
**Kalantor Prokashoni**  
+88 01711 984821  
kalantorprokashoni10@gmail.com  
www.facebook.com/kalantorprokashoni  
www.kalantorprokashoni.com

---

**All Rights Reserved**

*No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.*

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK**.ORG



# অর্পণ

আব্বা-আম্মা

যাদের বদান্যতায় 'আমি'

-----  
ইশরাত সুলতানা মারজিয়া  
ইশমাম সুলতানা মাহদিয়া  
যারা আমার চোখের শীতলতা  
আমি যাদের গভীর ব্যাকুলতা ।

উম্মাহর সেসব জিন্দাদিল মুজাহিদ  
যাদের রক্ত-ঘামে গড়ে উঠেছে মিল্লাতের ভিত...

“আইন জালুতের যুদ্ধ ছিল ইতিহাসের অন্যতম এক নিষ্পত্তিমূলক সন্ধিক্ষণ। মোঙ্গলদের অপরাধের উপাখ্যান ভেঙে গেলো চিরতরে। থেমে গেলো উত্তর আফ্রিকাপানে তাদের পশ্চিমমুখী সম্প্রসারণ প্রয়াস। নিশ্চিত হলো ইসলামের চলমান অস্তিত্ব। সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে প্রতিষ্ঠিত হলো মামলুক সার্বভৌমত্ব।”

--- প্রফেসর মেয়ার

## প্রকাশকের কথা

সঞ্জিবনী শক্তি!

মরুসাহারার মধ্যপ্রান্তরে পিপাসাকাতর কোনো এক পথিক যখন গলা ভিজানোর ফোটা আবিষ্কার করে, তখন তার গোটা অস্তিত্বে বয়ে যায় হীমশীতল এক অনুভূতি। এই অনুভব-অনুভূতি আনন্দের, উপভোগের। চেতনা জাগানিয়া টনিকের মতো তাকে পুলকিত করে। হৃদয়ে দেয় সুখের দোলা। আকাশপানে উত্থিত তার শাহাদাহ অঙ্গুলির ইশারা থেকে যেন হামদে বারি তাআলার ওয়াহদানিয়াতের স্কুলিঙ্গ টিকরে পড়ে। গায়ওয়ায়ে আহযাবের কঠিন পাথর থেকে উৎসারিত আলোর ফোয়ারায় উদ্ভাসিত কায়সার ও কিসরা বিজয়ের বিস্ময়কর ঘটনাবলীর অনুরূপ অবাক করা উপাখ্যানই হলো ‘দ্য প্যাছার’। চিত্তরাজখ্যাত সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্দের অসামান্য বীরত্ব, অনুকরণীয় জীবনচরিত, শ্বাসরুদ্ধকর টানা অভিযানের ধারাবিবরণীতে অলঙ্কৃত অনবদ্য এ গ্রন্থটি। এক চুমুকেই যেন খুঁজে পাওয়া যায় জনমের সার্থকতা।

স্যোশাল মিডিয়ায় কত লেখাই তো হররোজ আসে-যায়, ঘুরে বেড়ায়; কিন্তু কে কার দিকে তাকায়! সময় বা কোথায়! অথচ টানা ত্রিশ পর্বের প্রলম্বিত ধারাবাহিকী ‘দ্য প্যাছার’-এ এসে আমার চোখ দুটো স্থির হয়ে গেলো। বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, সোনালি যুগ পরবর্তী ইতিহাসেও এমন বর্ণাঢ্য বিজয়গাঁথা-দাস্তান আরো আছে। উমর ফারুক, খালিদ সাইফুল্লাহ, মুহাম্মাদ বিন কাসিম, তারিক বিন যিয়াদ, কুতাইবা বিন মুসলিম, ইউসুফ বিন তাশফিন, সালাহউদ্দিন আইয়ুব, সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ, সুলতান সুলাইমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্টসহ জগদ্বিখ্যাত মুসলিম বিজয়ীদের নাম আমরা অনেকই জানি। কিন্তু আশ্চর্য! আলো-আঁধারির মাঝে বহুকাল ধরে লুকিয়ে রইলো বাইবার্স আখ্যান! দুর্দমনীয় বাইবার্স ঝড়ের ইতিবৃত্ত বয়ে গেলো অপঠিত, অখ্যাতাবস্থায়-ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু পাঠকেরও অশেষদূরে, অদেখা।

আমাদের পরিচিত উদ্যানে, সরল-সহজ কাননে অবহেলিত উঠানেও যে ডায়মন্ড ছড়িয়ে থাকতে পারে; তারই জ্বলজ্বাল প্রমাণ দিলেন মাওলানা ইমরান আহমাদ। মোবাইলের কৃত্রিম কীবোর্ডে হৃদয়ের ঝঙ্কার তুলে রচিত করলেন কালজয়ী এক মহামানবের ঝলমলে এই মহাকাব্য। এভাবেও বিশাল কলেবরের কোনো গ্রন্থের ভ্রূণ তৈরি করা যায়-এটা ছিলো আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য। বিস্ময়কর হলেও এটাই আজ সত্য, রুঢ়-বাস্তব।

যে বাইবার্‌সের ভয়ে আত্মসীরা ছিল সন্ত্রস্ত, সেই চিতারাজের জাতি হয়েও আমাদের মাথায় বসে বানরেরা আজ খেলা করছে। মায়ের ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত লাশের পাশে বসে দুধের শিশু কাতরাচ্ছে। রাজসিংহাসনের মালিকেরা আজ পথের ভিখারি। প্রতিটি মুসলিম জনপদ আজ রক্তসাগরে ভাসমান। আপন ভিটে-মাটি ছেড়ে মুসলিমরা দৌড়াচ্ছে দিগ্বিদিক। আমরা হারাতে বসেছি আমাদের সোনালি অর্জন, বর্ণালি বিজয়গাঁথা। ভুলতে বসেছি নিপুণ বীরত্বের ইতিকথা। আজ সময় এসেছে ঘুরে দাঁড়াবার। আপন ইতিহাস জানার, বোঝার। নিজেদেরকে চেনার সহায়ক বাস্তবসম্মত এই ইতিহাস গ্রন্থটি অসাধারণ বর্ণনার ফল্গুধারায় সাজিয়েছেন সময়ের সাহসী এই কলম সৈনিক। লেখকের অনুপম প্রামাণ্য উপস্থাপনা, তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ভাষার কারুকার্য বইটিকে করেছে আরো হৃদয়গ্রাহী। শুধু নিজে নয়; বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনসহ জানা-অজানা সকলের কাছে বইটি পৌঁছানোর দায়িত্ব আমাদের সকলের। তবেই আমাদের শ্রম হবে সার্থক। হামদান শাকিরিনা লিল্লাহি আজ্জা ওয়া যাল্লা।

আলহামদুলিল্লাহ! মাত্র চার মাসে বইটির প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যাওয়ায় কিছুটা সংশোধনীসহ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ হল। কিছু তথ্য ও বানান বিভ্রাট ছিল; সংশোধন করা হয়েছে। তবে তথ্যগত ব্যাপারে কিছুটা বিতর্ক থাকা স্বাভাবিক। কারণ ঐতিহাসিক কোনো বিষয়ে একাধিক মত থাকতেই পারে। এরপরও কোনো ধরনের ত্রুটি ধরা পড়লে আমাদেরকে জানিয়ে বাধিত করবেন। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব।

আবুল কালাম আজাদ

প্রকাশক

কালান্তর প্রকাশনী

## উপক্রমণিকা

‘দ্য প্যাছার’। শুধু বইয়ের নাম নয়। একটা ঝলমলে গৌরবের স্মারক। সোনায মোড়ানো বিজয়ের পালক। এর সাথে জড়িয়ে আছে যুগসন্ধিক্ষণের অবিশ্বাস্য অনেক বীরত্বগাঁথা। অসামান্য সব কীর্তিকথা। এটা মূলত ভীতিকর একটা পরিচিতি। দুর্দম চিতাগতির অনুপম স্বীকৃতি। মুগ্ধ, স্নিগ্ধ, প্রতিপক্ষের স্তুতি। শিকার প্রদত্ত শিকারির উপাধি। যার নামে ক্রুসেড মুর্ছা যেত নিরন্তর—এটা সেই “বাইবার্সের” ইউরোপীয় রূপান্তর।

সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স। উন্মত্ত ক্রুসেডের ত্রাস। বর্বর মোঙ্গলদের বিনাশ। হারামি ফেদাইনদের অভিষাপ। যার চওড়া বুকের টক্করেই ক্রুসেড হারিকেন গতি হারিয়েছিল। মোঙ্গল ঝড় দিক পাল্টেছিল। ফেদাইন তুফান মুখ খুবড়ে পড়েছিল। খ্রিস্টজগত সেই তাকেই সমীহ করতো ভয়ঙ্কর সুন্দর এই অভিধায়।

তিনি ক্রুসেডের ক্ষণজন্মা আবিষ্কার। মুসলিম উম্মাহর অহঙ্কার। বিশ্বইতিহাসের অলঙ্কার। অসামান্য এক বিরল সামরিক প্রতিভা। দুর্দান্ত সাহসিকতার জীবন্ত নমুনা। তার তরবারির ডগায়ই রচিত হয়েছে মধ্যযুগের স্বর্ণিল ইসলামি ইতিহাস। বর্ণিল বিজয়াত্রার অনবদ্য সব মহাকাব্য। তিনিই একমাত্র সেনানায়ক, যার ঝুলিতেই কেবল রয়েছে শত্রুকে বিরামহীন সাড়ে চারশ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত সসৈন্যে তাড়িয়ে দেবার অবিশ্বাস্য বিশ্বরেকর্ড। ইতিহাসের পাতায়-পাতায় তিনি তাই আজও অশ্লান-ভাস্বর। মুসলিম ইতিহাসের বরণ্য বীরশ্রেষ্ঠদের অন্যতম অধিশ্বর।

তিনি কিপচাক-কুমান গোত্রীয় তুর্কি বংশোদ্ভূত সেই দুর্ধর্ষ যাযাবর যোদ্ধা-যার লৌহকঠিন খাবায় ক্রুশের নাগপাশ থেকে দ্বিতীয়বার মুক্ত হয়েছিল পবিত্র মাসজিদুল আকসা। স্বপ্নের জেরুসালেম। অপসৃত হয়েছিল হলি সেপালকারের ট্রু-ক্রুশ। সর্বাধিক চার-চারটি হিংস্র ক্রুসেড তিনি একাই সামলেছেন। একমাত্র মুসলিম সেনাপতি তিনিই, যিনি ইউরোপীয় কোনো সম্রাটকে খাচায় পুরেছেন। নরখাদক হালাকু খানকে হামেশাই দৌড়ের উপর রেখেছেন। আইন জালুত, হিমস, বিরা, আনাতোলিয়ার যুদ্ধে মোঙ্গল দর্প তিনিই সতত চূর্ণ করেছেন।

আমরা ক্রুসেড মোকাবেলার নেতৃত্বে ইমাদউদ্দিন বীরত্বে নুরউদ্দিন, কৃতিত্বে সালাহউদ্দিন আইয়ুবিকেই বুঝি, চিনি, জানি। তাঁরা ছিলেন দ্বি-শতাব্দীব্যাপী চলমান রক্তস্নাত ক্রুসেডের এক-একটি অধ্যায়ের ধারক। জঙ্গিরা প্রতিরোধের পথিকৃৎ হলে আইয়ুবি জেরুসালেমের প্রথম উদ্ধারকারী। ক্রুসেডের বাকি সব ইতিহাস, সব আখ্যান সেই কুমান-তুর্কির নিজ হাতেই লেখা। কার্যত তিনিই ক্রুসেডের বিষদাঁত ভাঙ্গার কারিগর। মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দেবার মূল রাহবার। তার

বজ্রাঘাতেই ক্রুসেডের বিষবৃক্ষ হয়েছিল বিধ্বস্ত, মূলোৎপাটিত। মুহম্মদ ক্রুসেড ঘোষণায় ইউরোপ হয়েছিল ক্ষ্যান্ত, নিরুৎসাহিত। লেভান্ট-ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূল পেয়েছিল পরিত্রাণ। চিরন্তন ক্রুসেড উন্মাদনায় পড়েছিল ভাটার টান। তিনি ছিলেন ক্রুসেডের চিরসবুজ প্রত্যাঘাত। ক্রুসেডমানসে তিনি তাই আজও চিহ্নিত “শেষ আঘাত”।

গোবির বৃকে জাগা মোঙ্গল মরুঝড়ে দুনিয়া যখন ইসলামি সভ্যতার প্রায় সমাপ্তিই দেখে ফেলেছিল, বিশাল বিস্তৃত খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য, আদিগন্ত পরিব্যাপ্ত আব্বাসি খিলাফাহ যখন ধ্বসে পড়েছিল, শ্রেফ মিশর-সিরিয়া আর হিন্দুস্তানের কিয়দাংশ বাদে সমগ্র মুসলিম দুনিয়া যখন জ্বলছিল, রক্তসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল, ঠিক তখনই বীরবিক্রমে রুখে দাঁড়ালেন একজন লৌহমানব। গমগমে কণ্ঠে যার কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট আভাস। সিদ্ধান্তের অবিচলতায় যিনি পাথুরে পর্বত। ক্ষিপ্ৰতায় দুরন্ত চিতাবৎ-তিনি রুকনুদ্দিন বাইবার্স। চিতারাজ, দ্য প্যাস্চার। বাকিটা তো ইতিহাসই। টানা ৫০৭ বছরের আব্বাসি খিলাফাহর পতন পরবর্তী মাত্র চার বছরের মাথায় উম্মাহকে ফের খিলাফাহর ছাতা উপহার-সেটাও তো তারই একক কৃতিত্ব। বস্তুত তিনিই হচ্ছেন মামলুক সালতানাতের আক্ষরিক স্থপতি। যদিও তিনি ছিলেন তৃতীয় বা চতুর্থ মামলুক সুলতান। মূলত তার হাড্ডি-খুলিতেই গড়ে উঠেছে উম্মাহর আজকের ভিত্তি। মিল্লাতের আধুনিক মানচিত্রের স্থিতি। সীমানার বিস্তৃতি।

তাকে নিয়ে যে রকম আলোচনা হওয়ার কথা ছিল বাংলা সাহিত্যে, ইতিহাসে, ভূগোলে; অজ্ঞাত কারণে এর সিকিভাগও কিন্তু হয় না, হচ্ছে না। যা আছে, তাও ছড়ানো-ছিটানো, বিচ্ছিন্ন। অগোছালো-অসংলগ্ন, বিক্ষিপ্ত। কেবল প্রচারের অভাবেই ধুলোর আন্তরণে চাপা পড়ে আছে কিংবদন্তির সেসব মহাকাব্য। হায়! আমরা অনেকেই নন্দিত সে নামটা পর্যন্ত আজও জানি না।

তাই মহাকালের নিঃসীম শূন্যতায় অধমের ক্ষুদ্র এ প্রয়াস। জামি সা, কতটুকু পূরণ হলো! তবু যদি ইতিহাসের কপাটবন্ধ দ্বার ঈষৎ হলেও খুলে যায়, প্রজন্মের চিন্তায় গতি পায়, তবেই সার্থক অধমের সব কষ্ট-ক্লেশ।

বক্ষমান গ্রন্থে সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে, নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের আলোকে “দ্য প্যাস্চার” খ্যাত সেই বাইবার্সেরই বর্ণাঢ্য জীবনচরিত্র বিবৃত হয়েছে। সাথে আছে রিলেটিভ কিছু কথা। ওঠে এসেছে তখনকার দুয়োগময় বিশ্বপরিস্থিতিও। খুব সংক্ষেপে। স্বল্প পরিসরে। কল্পিত গল্পাক্ষরে নয়। রঙ চড়ানো কাহিনীও নয়। বলা যায়, নিখাদ ইতিহাসেরই সারনির্যাস। এটা তাই গতানুগতিক কোনো উপন্যাস নয়, কালজয়ী এক উপাখ্যান।

যে কথাটি না বললেই নয়; ২০১৬ সালের জুলাই মাসে সর্বপ্রথম Sultan Baibars & Mamluks নামে ফেসবুকে একটা পেইজ আমার নজরে পড়ে। টাইমলাইনে ঢুকে বাইবার্সের অবিস্মরণীয় কীর্তিগুলো পড়া শুরু করলাম। পড়ে বেশ শিহরিত হলাম। আরো বিস্তারিত জানতে ইন্টারনেট থেকে পাঁচ খণ্ডের سيرة الظاهر بيبرس (সিরাত আয যাহির বাইবার্স) ডাউনলোড দিলাম। মনোযোগ সহকারে পড়লামও। পড়তে পড়তে বাইবার্সের একটা হৃদয়জাগানিয়া রূপ আমার সামনে হাজির হয়। ভাবলাম বাইবার্সের কীর্তিকথা আরো ব্যাপকভাবে প্রচার হওয়া দরকার। তাই ফেসবুকের উন্মুক্ত উঠানে ঘোষণা দিয়েই ধারাবাহিকভাবে একান্ত নিজের ভাষায় প্রকাশের উদ্যোগ নিলাম। বন্ধুমহল থেকে বেশ সাড়াও পাই।

গ্রন্থটি রচনায় ‘সিরাত আয যাহির বাইবার্স’ ছাড়া আরও কয়েকটি ঐতিহাসিক গ্রন্থের সহায়তা নেয়া হয়েছে। কোনোটির নাম লেখার সাথে সাথেই উল্লেখ করেছি আবার সবগুলো সূত্র শেষ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছি। বিশেষভাবে আমি Sultan Baibars & Mamluks নামক ফেসবুক পেইজের এডমিনদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, কারণ এই পেইজই বাইবার্সকে নিয়ে লিখতে আমাকে বেশি অনুপ্রাণিত করেছে।

একসময় নিজের মধ্যেও চলে আসে বিচিত্র এক অনুভূতি। ভাবতে শুরু করলাম ছেপে দিলে মন্দ কী! কিন্তু এসব কি আর শুধু ভাবলেই হয়! সাধ-সাধের ফারাকটা তাই পীড়া দিলো বড্ড করে। আর তখনি পাশে এসে দাঁড়ালো কালান্তর প্রকাশনী। মূলত তাঁদেরই একান্ত মনোবাঞ্ছা, নিঃস্বার্থ অনুপ্রেরণায় আজকের এই মলাটবদ্ধ সংস্করণ। কৃতজ্ঞতার বাগডোরে তাঁদের অবদানকে খাটো করতে চাই না।

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ আপনাদের হাতে। সকল শুকরিয়া মহান রবের। দ্বিতীয় সংস্করণে বানান ছাড়াও তত্ত্ব ও তথ্যগত কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে। বিশেষ করে প্রমিত বানানরীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও মানুষ যেহেতু ভুলের ঊর্ধ্বে নয়; তাই বানান, তত্ত্ব বা তথ্যভিত্তিক কোনো ত্রুটি ধরা পড়লে অবগত করার অনুরোধ রইলো। পরবর্তী সংস্করণে কাজে দেবে-ইনশাআল্লাহ!

ইমরান আহমাদ  
নভেম্বর ২০১৭ ঈসাবি  
হবিগঞ্জ, বাংলাদেশ

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK**.ORG





খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক। মুসলিম দুনিয়া তখন অতিক্রম করছে নিজেদের ইতিহাসের কঠিনতম ক্রান্তিকাল। চারদিকে শুধু আগুন, রক্ত আর ধ্বংসের কলরোল। পশ্চিম থেকে বানের মতো ধেয়ে আসছে একের পর এক ক্রুসেড। পূর্বদিকে কিয়ামতের বিভীষিকা নিয়ে কড়া নাড়ছে তাতারি মরুঝাড়। গোবি'র বুক চিরে জেগে উঠা এই ঝড়; সভ্য দুনিয়ার সবকিছু লগুভগু করে হিংস্রগতিতে এগুচ্ছে। দানবের গ্রাসে ইনসানিয়্যাত হয়ে পড়েছে অপাংক্তেয়। কাপালিকের কৃপাণে মানবতার খাক-খুন গড়াগড়ি ছিল নৈমিত্তিক। বিধ্বংসী মরু সাইমুমের এই তাণ্ডব সবচে' বেশি কিন্তু সইতে হয়েছে মুসলিম উম্মাহকেই!

আব্বাসি খিলাফাহর বাইরে মধ্য ও পূর্ব এশিয়া নিয়ে গড়ে ওঠা বিশাল মুসলিম খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য ছিল মোঙ্গল তুফানের প্রথম শিকার। মাত্র তিন বছরের মাথায় সমগ্র খাওয়ারিজম চলে গেলো মোঙ্গল সাম্রাজ্যের পেটের গভীরে।

মোঙ্গলরা ছিল লম্বা-চওড়া চেহারার মানুষ। গায়ের রঙ হলদেটে। এদের ঘোড়াগুলো খর্বকায় হলেও গতি ছিল তীব্র। এরা ছিল লক্ষ্যভেদী তীরন্দাজ। এদের দূরপাল্লার তীর-ধনুক ছিল বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম। এদের দ্রুতগতি, তীরের প্রাচুর্য, হিংস্রতা এবং পঙ্গপাল সদৃশ সংখ্যাধিক্যের কারণে মানুষ এদেরকে তখন ইয়াজুজ-মাজুজ বলেই ভাবতো। এদের সংগঠক ছিলেন অখ্যাত এক তেমুজিন। ইতিহাসবিখ্যাত চেঙ্গিস খান।

১২২৭ সাল। বিখ্যাত মোঙ্গল সেনাপতি জেব নেইম ও সুবুদাই বাহাদুর সাম্রাজ্যহারা শাহে খাওয়ারিজম, সুলতান আলাউদ্দিন শাহ মুহাম্মাদকে তাড়া করতে করতে আচমকা ঢুকে পড়লেন নতুন এক ভূখণ্ডে—কিপচাক।

কিপচাক। বিশাল জনগোষ্ঠীর তুর্কি বংশোদ্ভূত এক উপজাতি। বাঙালিদের সাথে তুর্কিদের পার্থক্য এটাই যে, আমাদের উপজাতিরা হয় ছোটখাট; কিন্তু মূল

তুর্কিদের তুলনায় এদের উপজাতিগুলো ছিল বিশাল। ‘কিপচাক’ তুর্কি শব্দ। যার অর্থ “ঠালা গাছের সন্তান”। কিপচাকদের কিংবদন্তি মতে, একদা বিশাল এক ফাঁপা গাছের ভেতর থেকে তাদের এক পূর্বপুরুষ বেরিয়ে আসে, সেই থেকে তাদের নাম হয় কিপচাক। ইসলাম গ্রহণের আগে তুর্কিরা এসব কিংবদন্তি-রূপকথায় বিশ্বাস করতো। কিপচাকরা ছিল যাযাবর জাতি। তারা ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধাজাত। জাতিতে কিপচাকের প্রায় সবাই ছিল মুসলিম। কাফকাজ (ককেশাস) পর্বতমালার উত্তরে, ইতিল (ভল্গা) নদীর দক্ষিণে তারা বাস করতো। তাদের নামানুসারেই ঘাসে ভরা এই ভূখণ্ড ‘কিপচাক স্টেপ’ নামে পরিচিত হয়ে উঠে।

বৃহত্তর সারকোসিয়ার অন্তর্গত আধুনিক কাজাখস্তানের ছোট্ট এই ভূখণ্ডেই অন্যান্য তুর্কি গোত্রের সাথে ‘কুমান’ সম্প্রদায়ের বাস ছিল। যারা ছিল কিপচাকেরই একটি শাখা। এরা আবার গোটা স্টেপের মধ্যেই সবচে’ দুর্ধর্ষ ছিল। শৈশবে বন্য নেকড়ে, কৈশোরে বাঘ আর যৌবনে সিংহের সাথে টক্কর দিয়েই এরা বেড়ে উঠতো। তাই প্রাকৃতিকভাবেই এরা ছিল দুরন্ত। দুর্ধর্ষ যোদ্ধাজাত। কুমানদের স্থায়ী কোনো বাসস্থান ছিল না। তাবু ছিল তাদের নিত্য আবাস। মেষ পালনেই চলতো তাদের জীবন-জীবিকা। কুমানদের মেষ ও ঘোড়া ছিল অসংখ্য। মেঘের গোশত ও দুধ ছিল তাদের খাবার। ঘোড়া ছিল বাহন। মেঘের মিহি লোম থেকেই নির্মিত হতো তাদের পোশাক। তাই এই মেঘের পাল ছিল তাদের পরমপ্রিয়। এর জন্যেই কেবল এই যোদ্ধাগোত্র একে অপরকে আক্রমণ করতো। অন্যদের মেঘের পাল লুটে নেওয়া এবং নিজেদেরটা রক্ষা করাই ছিল তাদের দৈনন্দিন কাজ।

কিপচাক স্টেপে প্রাকৃতিক সম্পদের কোনো অভাব যেমন ছিল না, তেমনি অভাব ছিল না বিপদ-আপদেরও। চিতা, শেয়াল ছিল মেঘের পালের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ। কিপচাকের চিতা, শেয়াল কেমন হিংস্র ছিল, সেখানকার সামান্য বিড়ালের হিংস্রতায়ই সেটা বোঝা যায়। কিপচাকের বিড়ালগুলো এতোই দুরন্ত ও হিংস্র ছিল যে, এরা যাযাবরদের বড় বড় তুর্কি মোরগ পর্যন্ত শিকার করে পুরোটাই খেয়ে ফেলতো! কিপচাক স্টেপে প্রয়োজনীয় সবজিও প্রচুর পরিমাণে ফলতো। এই সবজির উপর আবার ক্ষণে-ক্ষণে দলদলি হামলে পড়তো স্টেপের দুই কাঠবিড়ালী। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিরূপ এই পরিবেশের কারণেই কুমানরা ছিল নিষ্ঠুর, হিংস্র ও দুরন্ত জাতযোদ্ধা। তবুও হাতে সম্মুখযুদ্ধে এরা তাই ছিল অজেয়। আক্রমণ, আত্মরক্ষা ছাড়াও অবসরে এরা তাবুতে বসে থাকতো না। তখন এরা স্টেপের হরিণ শিকারে মেতে উঠতো।

১৯ জুলাই ১২২৩ সাল। দুর্ঘর্ষ সব যোদ্ধাদের আঁতুড়ঘর কিপচাক স্তেপের এই কুমান গোত্রের জন্ম নেন দুরন্ত এক সেনানায়ক-বে-বার্স। তুর্কিতে বে অর্থ প্রধান আর বার্স মানে চিতা, সুতরাং বে-বার্সের পুরো অর্থ দাঁড়ালো প্রধান চিতা। বে-বার্সের আরবি রূপই হচ্ছে বাইবার্স। পরবর্তীতে নামের যথার্থতা প্রমাণ করেই মুসলিম ইতিহাসে তিনি চিতারাজ আর ইউরোপীয় ইতিহাসে “দ্য প্যাঙ্কার” হিসেবে অমর হয়ে আছেন।

কিপচাকবাসী দুর্ঘর্ষ যোদ্ধা হলেও নিজেদের ভূখণ্ডে আচমকা নতুন এক প্রজাতির আগমন দেখে ভ্যাভাচ্যাকা খেয়ে যায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভেসে যায় বিদ্যুৎগতির মোঙ্গল সয়লাবে। পতন ঘটে স্বাধীন কিপচাক ভ্যালির। ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় কুমানসহ কিপচাকের অন্যান্য সম্প্রদায়। পুরুষরা গণহারে নিহত হয়। মেয়ে ও শিশুরা হয় বাজারের পণ্য-মামলুক, দাস। এদের মধ্যে পাঁচ বছরের শিশু বাইবার্সও ছিলেন। কে জানতো, কালক্রমে তিনিই হয়ে উঠবেন মোঙ্গলদের জীবন্ত ত্রাস। গুপ্তঘাতকদের অভিষাপ। ক্রুসেডের সর্বনাশ!

মোঙ্গলরা অন্য সবার সাথে তাকেও দাসবাজারে বিক্রি করে দেয়। শুরু হলো নতুন জীবন। মামলুক অধ্যায়। স্বাধীন হয়ে জন্মেও দেশ থেকে মহাদেশে চললো তার দাসত্বের ঘূর্ণন। একবছর পর; ছয় বছরের বাইবার্স দাস ব্যবসায়ীদের সাথে রাশিয়া থেকে এবার এলেন দামেশকে। মাত্র আটশ দিরহামে দ্বিতীয়বার বিক্রি হলেন ধনাঢ্য এক ব্যক্তির কাছে। তিন বছর পর; চোখের ছানির কারণে সে ব্যক্তি তাকে ফিরিয়ে দেন সেই ব্যবসায়ীর কাছেই। কিছুদিন পর আইতাকিন বান্দুকদার নামক একজন সেনানায়ক হামাহর দাসবাজার থেকে তৃতীয়বারের মতো তাকে কিনে নেন নামমাত্র মূল্যে! এবার তার গন্তব্য আফ্রিকার কায়রো। কারণ আইতাকিন ছিলেন মিশরের আইয়ুবীয় সালতানাতের একজন অভিজ্ঞ জেনারেল।

এই সেই আইয়ুবীয় সালতানাত। যার ভিত্তি গড়ে উঠেছিল ‘সৈয়দ’ সালাদিন’ খ্যাত সুলতান সালাহউদ্দিন ইউসুফের রক্ত-ঘামে। ১১৭৪ সালে গাজি সালাহউদ্দিন তার বাবা নাজমুদ্দিন আইয়ুবের নামানুসারে আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশব্যাপী এই সুবিশাল সালতানাতের গোড়াপত্তন করেন। কিন্তু গাজি সালাহউদ্দিনের গড়া বিশাল এই সালতানাতের ক্ষয় শুরু হয় তার জীবদ্দশাতেই। চূড়ান্ত অবক্ষয় ঘটে তার মৃত্যুর পর।

সালাহউদ্দিন তার একক প্রচেষ্টাতেই ক্রুসেডারদের নাগপাশ থেকে দীর্ঘ ৮৮ বছর পর ১১৮৭ সালে বাইতুল মাকদিস পুনরুদ্ধার করেন। হাতিন যুদ্ধের অনিবার্য ফলস্বরূপ আপনাতাই মুসলিম অধিকারে চলে আসে লেভান্টের অংশবিশেষ। প্রতিশোধ নিতে ইংল্যান্ড সম্রাট রিচার্ড দ্য লায়নহার্ট’র নেতৃত্বে ঘোষিত হয়

তৃতীয় ক্রুসেড। তুমুল যুদ্ধের পর ১১৯২ সালে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ শহর আক্কা (আক্রা) অধিকার করে নেন রিচার্ড। হাতিন যুদ্ধে সুলতান সালাহউদ্দিনের বিশালসংখ্যক সেনা ক্ষয় হয়ে যাওয়ায় প্রাণপণ চেষ্টা করেও আক্কার পতন তিনি রোধ করতে পারলেন না। এমন দুর্দিনে বারবার আবেদন করার পরও আক্বাসি খলিফা তাকে একজন সৈন্য দিয়েও সাহায্য করেননি। আক্কার অসহায় পতনে সালাহউদ্দিনের মনোবলে অনেকটাই চির ধরে যায়। নিদারুণ সেনাস্বল্পতায় বিজয়ী এই সেনাপতি রিচার্ডের সামনে বারবার হোঁচট খেতে থাকেন। তাই ১১৯২ সালে তাকে বাধ্য হয়ে শান্তি চুক্তিতে আসতে হয়। উম্মাহর অবিমৃষ্যকারিতায় আক্কা তো আগেই গেছে; এবার রমলা চুক্তির মাধ্যমে বাইতুল মাকদিস ধরে রাখতে বিসর্জন দিতে হয় পুরো লেভান্ট (আধুনিক ইসরাইল, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, লেবানন ও তুরস্কের পশ্চিম উপকূল)। উপর্যুপরি এই পরাজয় আর বিজিত ভূমির এমন সঙ্কর হাতছাড়া হতে দেখে তার মতো অজেয় সেনানায়ক সুস্থ থাকেন কী করে? এ কষ্ট বুকে নিয়েই তিনি দুবছরের মাথায় ইন্তেকাল করেন। আর হাতছাড়া হওয়া মুসলিম ভূমি উদ্ধারের ভার রেখে যান পরবর্তী প্রজন্মের উপর। কী আশ্চর্য! এ ভার বহনে উম্মাহর দীর্ঘ ৭১ টি বছর লেগে যায়! ১২৬৩ সালে এসে প্রায় পুরো লেভান্ট মাত্র একটা টর্নেডো অভিযানেই উদ্ধার করেন একজন লৌহমানব। নাম তাঁর রুকনুদ্দিন বাইবার্স! সালাহউদ্দিন আইয়ুবির পর আইয়ুবি বংশের অকর্মণ্যতায় ক্ষয় হতে থাকা বিশাল এ সালতানাত অবশেষে ৭৬ বছরের মাথায় ১২৫০ সালে এসে বিলীনই হয়ে যায়! আইয়ুবীয় সালতানাতের ধ্বংসস্তুপের উপর দাঁড়িয়ে যায় নতুন ইমারাত-মামলুক সালতানাত। তবে হ্যাঁ, আইয়ুবি বংশের সকলেই যে অর্থব ছিলেন ঢালাওভাবে এটাও কিন্তু বলা যাবে না। উজ্জ্বল ব্যতিক্রম দু-একজন অবশ্যই ছিলেন। তাদেরই অন্যতম একজন সুলতান আস সালিহ আইয়ুবি।

আইতাকিন বাইবার্সকে নিয়ে কায়রো পৌঁছলেন। সেখানে তখন সুলতান আস সালিহ ক্ষমতাসীন। আইতাকিন ছিলেন আস সালিহর অধীনস্থ আইয়ুবি সালতানাতের নামকরা জেনারেল। আঁড়ধনু চালনায় বিশেষ খ্যাতির কারণে তার উপাধিই ছিল আল বান্দুকদার। কায়রো এসে তিনি দেখলেন, অপরাপর কুমান ক্রীতদাস শিশুদের চেয়ে বাইবার্স অধিক তৎপর ও কর্মঠ। বিশেষ করে অস্ত্রবিদ্যার উপর তার ঝোঁকটা একটু বেশিই। তাই আইতাকিন বালক বাইবার্সকে তলোয়ারের সাথে ধনুক ও আঁড়ধনু চালনার শিক্ষাও দিতে লাগলেন। আঁড়ধনু হচ্ছে একধরনের দূরপাল্লার বিশেষ ধনুক। এটি চালনার জন্য চাই প্রচণ্ড শক্তি ও হাতের মজবুত পেশী। যা শিশুকাল থেকে অভ্যাস না করলে গড়ে ওঠে না। তাই শৈশবকাল থেকেই এ ধনুক চালনা শিখতে হয়। বালক বাইবার্স এ

কাজে এতো সাফল্য লাভ করলেন যে, আইতাকিন বুঝে নিলেন এই বালক একদিন বড় যোদ্ধা হবেই। আইতাকিনের নিবিড় তত্ত্বাবধান ও পিতৃস্নেহেই বাইবার্স পার করলেন তার সোনালি বাল্যকাল। আইতাকিনের প্রশিক্ষণে বাইবার্স ধীরে ধীরে পরিণত হয়ে উঠলেন। কিন্তু নিজের শিক্ষা-দীক্ষায় তৃপ্ত না হয়ে অবশেষে আইতাকিন বাইবার্সকে ভর্তি করে দিলেন নিয়মতান্ত্রিক সেনাবাহিনীতে। ১২৪২ সালে বাইবার্স পুরোদস্তুর সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে আরম্ভ করলেন আইয়ুবীয় সেনাবাহিনীতে!



আলমুত। বর্তমান ইরানের কাযবিন শহর থেকে ১০২ কিলোমিটারের দূরত্বে একটি পাহাড়ি শহর। সেখানে তখন সালজুক শাসন চলছে। কাম্পিয়ান হৃদয়ের তীরে, আলবুর্জ পর্বতমালার কোলে অবস্থিত এ শহরকে ঘিরেই দানা বেঁধে উঠেছিল বিরাট এক ফিতনা-হাশাশিনদের উপদ্রব। বিশ্ব ইতিহাসে যারা ‘এসাসিন’ নামে কুখ্যাত। মুসলিম ইতিহাসে এরা হাসানি, বাতিনি, ইসমাইলি, ফেদাইন (গুপ্তঘাতক) নামেও পরিচিত। এই কুচক্রের জন্মদাতা হচ্ছে, ইসমাইলি শিয়া কুলাঙ্গার হাসান বিন সাবাহ (১০৫০-১১২৪)।

সর্বশেষ শাহে খাওয়ারিজম জালালউদ্দিনের হাতে প্রথমে অতঃপর হালাকু খানের কবলে পড়ে চূড়ান্ত নিশ্চিহ্ন হবার আগ পর্যন্ত পারস্যের এই হাশাশিনরা টানা প্রায় দেড়শ বছর দুনিয়ার ভ্রাস হয়েই টিকেছিল। বিশেষত ইসলামি বিশ্বের জন্য এরা ছিল গলার কাঁটা। এরা যাকে চাইতো নির্দিষ্টায় খুন করে ফেলতো। হোক সে সুলতান বা দেশের প্রধানমন্ত্রী। এদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না কিছুই। এদের দৌরাতে ইসলামি দুনিয়া বহুকাল চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেছে। যুগে যুগে মুসলিম বিশ্বের শতশত মনীষী এদের অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছেন। সালজুক সালতানাতের কিংবদন্তিতুল্য উজিরে আজম শিয়ামুল মুলক, সুলতান মুহাম্মাদ ঘোরি এদের হাতেই নিহত হন। এমনকি সালজুক সালতানাতের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান মালিক শাহকেও এরা একাধিকবার হত্যার চেষ্টা করেছে। কথিত আছে, অবশেষে এই কুচক্রিরাই তারক-বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছে। ইমাম রাযি, গাযালিসহ অনেক মুসলিম মনীষীই এদের হাতে নিগৃহীত হন। এমনকি সালাহউদ্দিন আইয়ুবি, নুরউদ্দিন জঙ্গিদের উপরও এরা বারবার আঘাত হেনেছে। এরা গুপ্তহত্যাকে তখন একটা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। এরা এতোটাই

শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, সালজুকরা সর্বশক্তি দিয়ে পরপর দুবার সেনা অভিযান চালিয়েও এদের উচ্ছেদে ব্যর্থ হয়। ফলে সালজুক সালতানাতের মধ্যেই এরা আরো একটি সমান্তরাল রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তুলেছিল। শেষদিকে এরা এমনই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে, এদেরকে রুখার সাধ্য কার্যত কোনো মুসলিম রাজ্যেরই ছিল না। আলমুতের অজেয় প্রধান দুর্গ ঘিরে কালক্রমে এরা আরো চল্লিশটি মজবুত কেল্লা গড়ে তুলে।

এদের আরো একটি দুর্গম আখড়া ছিল ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরে এন্টিয়ক-ত্রিপোলির মাঝামাঝি ভূখণ্ডে। শামের পশ্চিমে মাসইয়াফকেন্দ্রিক তাদের উনিশটি দুর্গের সে আখড়াও ছিল চরম দুর্লভ। বাইবার্সের হাতে বিধ্বস্ত হবার আগে কোনো মুসলিম সুলতানই সেখানে অভিযান চালাতে সাহস করেননি। অতিষ্ঠ হয়ে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী একবার এদেরকে অবরুদ্ধ করলেও গুপ্তঘাতক নেতা রশিদউদ্দিন সিনানের পাষ্টা হুমকিতে তিনি অবরোধ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। ফলে মোঙ্গল ও ক্রুসেডারদের বাইরে এরা মুসলিম বিশ্বের তৃতীয় কঠিন শত্রুতে পরিণত হয়।

১২৪০ সাল। কায়রো। ক্ষয়িষ্ণু আইয়ুবীয় সালতানাতের মসনদে তখন সুলতান আস সালিহ সমাসীন। সালাহউদ্দিন পরবর্তী অর্থব আইয়ুবীয় শাসকদের মধ্যে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। রাজ্যাভিষেকের পরপরই তিনি ফেদাইনদের তরফে চরম নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করেন। তাই নিয়মিত দেহরক্ষীদের বাইরে তিনি আলাদা একটা স্পেশাল গার্ড ফোর্স গঠনে উদ্যোগী হন। গুপ্তঘাতকদের রুখার জন্য কিপচাক উপত্যকা থেকে দাস হিসেবে কিনে আনা কুমান ও অন্যান্য তুর্কি গোত্রের মামলুকদের নিজ দেহরক্ষী হিসেবে নিয়োগ দেন। কারণ আইয়ুবী বাহিনীর সকল সেনাদের মধ্যে তখন এরা ছিল অত্যধিক কর্মঠ, তেজস্বী ও নিষ্ঠাবান। সুলতানের নির্দেশে কায়রোর অদূরে নীলনদের বুকে জেগে ওঠা আর রাওদাহ দ্বীপে এদের জন্য আলাদা সেনানিবাস নির্মিত হয়। বাহাই ফকরা সাতশ মামলুককে পাঠানো হলো দ্বীপ সেনানিবাসে। সুলতান আম্মা সালিহ এই সাতশ মামলুককে দিলেন কঠোরতম প্রশিক্ষণ। কারণ এরাই হবে তার দেহরক্ষী। সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠতম রেজিমেন্ট। যেহেতু এদেরকে দাস হিসেবে কিনে আনা হয়েছিল, এজন্যে এদেরকে মামলুক বলা হতো। দ্বীপবাসী হওয়ায় ইতিহাসে তারা বাহরি মামলুক নামে পরিচিতি লাভ করে। ১২৪২ সালে মাত্র উনিশ বছর বয়সে সেরা সাতশ জনের একজন মামলুক নিযুক্ত হয়ে বাইবার্স এই রাওদাহ সেনানিবাসে আসলেন। তরুণ বয়সেই তিনি হয়ে গেলেন আইয়ুবীয় সেনাবাহিনীর স্পেশাল মামলুক ইউনিটের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

৪ জুলাই ১১৮৭ সাল। হাতিনের যুদ্ধে জেরুসালেমের রাজা গাই অব লুজিনান ও তৃতীয় রেমন্ডের সম্মিলিত বাহিনীর মুখোমুখি হন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। রক্তক্ষয়ী সে যুদ্ধে ক্রুসেড সেনাবাহিনী প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ক্রুসেডারদের জন্য এ ছিল এক লজ্জাস্কর মহাবিপর্ষয়। এ বিজয়ের পথ ধরেই টানা ৮৮ বছরের জবরদখলের হাত থেকে তিনি উদ্ধার করেন বাইতুল মাকদিস-জেরুসালেম।

কিন্তু আফসোস! উদ্ধারের মাত্র ৪২ বছরের মাথায় ১২২৯ সালে তারই অযোগ্য ভতিজা আল কামিল রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিখের বন্ধুত্ব ও অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধে আল কামিলকে পূর্ণ সাহায্যের শর্তে বাইতুল মাকদিসকে ক্রুসেডারদের হাতে তুলে দেন। আল কামিল এভাবেই ইসলামের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ফ্রেডরিখের বন্ধুতে পরিণত হন। আর এভাবেই পবিত্র নগরী আবারো খ্রিস্টানদের অধীনস্থ হয়। এর ঠিক পনেরো বছর পর আল কামিলের এই অপরিণামদর্শী আঁতাতের প্রতিবিধানে এগিয়ে আসেন সুলতান আস সালিহ!

১২১৯ সাল। বিশাল বিস্তৃত খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য। মেসোপটেমিয়া, পারস্য আফগানিস্তানসহ পুরো মধ্য এশিয়া এ সাম্রাজ্যের অধীনে। অর্থ, যশ আর সামরিক শক্তিতে তৎকালীন বিশ্বসেরা। হঠাৎ করেই খাওয়ারিজমের আকাশে দেখা দিল দুর্যোগের ঘনঘটা। দুলাখেরও বেশি সৈন্য নিয়ে মোঙ্গল সম্রাট চেঙ্গিস খান একদিন ঢুকে পড়লেন খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যে। বোখারা, সমরকন্দ, তিরমিসহ চোখের পলকে একে একে অন্যান্য শহরগুলোও ধ্বংসস্তূপে পরিণত করলেন তিনি। বীরকেশরী শাহজাদা জালালউদ্দিন বারবার আবেদন করেও কার্যকর প্রতিরোধ যুদ্ধের অনুমোদন পাননি। না হলে ইতিহাস হয়তো অন্যভাবেই লেখা হতো। তাই কয়েক লাখ সৈন্য থাকার পরেও সুলতান আলাউদ্দিনের কাপুরত্ব ও অদূরদর্শিতার কারণে পুরো সাম্রাজ্য হুজুম করে নিল মোঙ্গলরা। সেখানে চললো কিয়ামতের বিভীষিকা। সবগুলো বাড়ি-স্থাপনা মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হলো। নারী-পুরুষ-শিশুসহ প্রায় সবাইকে নির্বিচারে হত্যা করা হলো। অঘোরে মারা পড়লো দোদাঁড় প্রতাপশালী একটা সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সদস্য। মুষ্টিমেয় যে ক'জন বাঁচলো তারা এসে আশ্রয় নিল মিশর-সিরিয়াভিত্তিক আইয়ুবীয় সালতানাতে। পরবর্তীতে এরাই হলো পবিত্রভূমি উদ্ধারের গর্বিত অংশীদার।

১২৪৪ সাল। দ্বিতীয়বার বাইতুল মাকদিস হাতছাড়া হবার পনেরো বছর পর সুলতান আস সালিহ সেটি পুনরুদ্ধারের ঘোষণা দিলেন। তিনি ছিলেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া। অনেকটাই সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর ধাঁচে। তাই পূর্বসূরী অপদার্থ আল কামিলের ক্ষমাহীন ওদাসিন্যের প্রায়শ্চিত্য করতে তিনি মোট ১৩ হাজার



সৈন্য নিয়ে জেরুসালেম অভিমুখে রওয়ানা হলেন। যাদের মধ্যে ছিল মোঙ্গল নির্মমতা থেকে পালিয়ে আসা ৬ হাজার খাওয়ারিজমি পদাতিক সৈন্য। ৪ হাজার অশ্বরোহী ও ২ হাজার বেদুইন যোদ্ধা। ঠিক পেছনেই চললো নবগঠিত বাহরি মামলুক বিশেষ বাহিনীর ১ হাজার দুর্ধর্ষ সৈন্য। বিস্ময়করভাবে তাদের কমান্ড ছিল একুশ বছরের আনকোরা তরুণ অনভিজ্ঞ বাইবার্সের হাতে। অসম সাহস, অসাধারণ মেধা আর মামলুকদের উপর তার অসম্ভব প্রভাবের কারণেই হয়তো জীবনের প্রথম যুদ্ধেই তার হাতে কমান্ডিং ছেড়ে দেয়া হয়।

অবাক করা ব্যাপার হলো, এমন একটা যুগসন্ধিক্ষণের যুদ্ধেও ক্রুসেডারদের সাথে হাত মেলালো হিমস, হালব ও আল কারাকের আইয়ুবীয় যুবরাজরা। জেরুসালেমে খ্রিস্টান দখলদারিত্ব টিকিয়ে রাখতে তাই নামধারী মুসলিম ও ক্রুসেডারদের ২০ হাজার সৈন্যের সম্মিলিত বাহিনী জেরুসালেম অভিমুখে রওয়ানা হলো। কিন্তু ধূর্ততাবশত তারা সরাসরি জেরুসালেম না গিয়ে ঘুরপথে মা'ন-এ জড়ো হলো। উদ্দেশ্য, অন্তিম মুহূর্তে আচমকা পেছন থেকে অবরোধকারী মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করে পরাস্ত করা। ক্রুসেডারদের এ পরিকল্পনার বিন্দু-বিসর্গও সুলতান আস সালিহ জানতেন না।

এদিকে বাইবার্সের নেতৃত্বাধীন মামলুক বাহিনী পশ্চিমদিকেই মূল বাহিনী থেকে আলাদা হয়ে যায়। বাইবার্সের ইচ্ছা, ভিন্নপথে বাইতুল মাকদিসে হাজির হয়ে শত্রুদের তাক লাগিয়ে দেওয়া এবং কঠিন মুহূর্তে ফয়সালামূলক লড়াইয়ে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়া। দুর্ধর্ষ বাইবার্স তাই বিপদসঙ্কুল নেগেভ মরুভূমির বুক দিয়েই রওয়ানা হন। মা'ন এর কাছাকাছি পৌঁছলে তিনি শত্রুসেনার উপস্থিতি টের পান। ব্যাপক খোঁজ নিয়ে এদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য জেনে গেলেন। এরা ছিল সম্মিলিত বাহিনীর সেই ২০ হাজার সেনা। বাইবার্স এবার একটা দফারফা করেই সামনে আগানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ পেছনে শত্রু রেখে সামনে আগানো যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার! কিন্তু মুশকিল হলো, প্রতিপক্ষের চেয়ে তার সৈন্য একেবারেই নগণ্য। সীমাহীন অপ্রতুল। কিন্তু তরুণ বাইবার্স ছেড়ে দেবার পাত্র ছিলেন না। মাত্র ১ হাজার মামলুক সৈন্য নিয়েই আচমকা নেগেভের বুক চিড়ে চিতার মতো ২০ হাজার সৈন্যের শত্রুশিবিরে হাঙ্গামা পড়লেন। পরিকল্পিত একটিমাত্র তীব্র আক্রমণ; আর তাতেই সব শেষ। অজান্তেই অনেকে মারা পড়লো। বাকিরা প্রস্তুত হবার আগেই ছিন্নশির হয়ে গেলো। অভাবনীয় এ জয়ের ফলে সর্বাঙ্গিক যুদ্ধের আগেই বাইবার্স মাকদিস কার্যত বিজিত হয়ে গেল। কেননা এরাই ছিল বাইতুল মাকদিস রক্ষার মূল শক্তি। ইতিহাসে এটি 'আল হারাবিয়্যাহ' যুদ্ধ নামে পরিচিত। আর এটিই ছিল বাইবার্সের অভিশেষ যুদ্ধ।

এখানেই থামলেন না বাইবার্স। সোজা ছুটে গেলেন জেরুসালেম অভিমুখে। সেখানে খাওয়ারিজম ও আইয়ুবীয় বাহিনীর যৌথ আক্রমণে খ্রিস্টানদের অবস্থা তখন টালমাটাল। ১১ হাজার সৈন্য নিয়ে পূর্ব পরিকল্পনা মতো তারা শুধু মুসলিম বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখছিল। তারা মনে-মনে অপেক্ষা করছিল মা'ন এর সেই সম্মিলিত বাহিনীর। কিন্তু বাইবার্সের তোপের মুখে মা'ন এর বাহিনী যে ততোক্ষণে অতীত ইতিহাস হয়ে গেছে, সে খবর কারো ছিল না।

বাইবার্স এখানে এসেই তার বিশেষ বাহরি মামলুক বাহিনী নিয়ে এমন প্রচণ্ড আক্রমণ করলেন যে, জেরুসালেমের দুর্ভেদ্য প্রাচীরও তা সহিতে পারলো না। সাথে সাথে ভেঙে পড়লো খ্রিস্টানদের সব প্রতিরোধ। পনেরো বছর পর পবিত্র নগরী বাইতুল মাকদিস আবার মুসলমানদের অধিকারে আসলো। হলি সেপালকারের উপর থেকে 'ট্রু ক্রুশ' ভেঙে ফেলা হলো। অবসান ঘটলো খ্রিস্টান জোচ্ছুরির। যার প্রায় পুরো কৃতিত্বই বাইবার্সের একার! এতে করে তরুণ বয়সেই বাইবার্সের নাম গ্রেট সালাহউদ্দিনের সাথে উচ্চারিত হতে লাগলো। বাইতুল মাকদিসের দ্বিতীয় উদ্ধারকর্তা হওয়ায়, লোকমুখে রাতারাতি তিনি হয়ে গেলেন দ্বিতীয় সালাহউদ্দিন। তাই ইতিহাসে এ যুদ্ধ যতোটা বাইতুল মাকদিসের কারণে স্মরণীয়; ততোটাই আলোচিত বাইবার্সের গৌরবদীপ্ত যুদ্ধাভিষেকের কল্যাণে। আসলেই তো এ যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলমানরা যেমন বাইতুল মাকদিস ফিরে পেলো, তেমনি ক্রুসেড জন্ম দিল তার সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধাকে। আর ইসলামি ইতিহাস আবিষ্কার করলো নতুন এক সেনানায়ক রুকনুদ্দিন বাইবার্স-দ্য প্যাছার।



জেরুসালেম। পৃথিবীর একমাত্র নগরী, যা তিনটি ধর্মের কাছেই সমান পবিত্রময়। ধর্মীয় তীর্থস্থান। প্রিয় নবীজি সা.'র মহিমামণ্ডিত মিরাজের স্মৃতিবিজড়িত এবং প্রথম কিবলা হওয়ায় মুসলমানদের কাছে এটি মক্কা-মদিনার পরেই তৃতীয় পবিত্রতম শহর। বনি ইসরাইলের অসংখ্য নবীদের জন্ম ও কর্মভূমি হবার কারণে ইয়াহুদিদের কাছেও এটি তেমনি এক পবিত্র নগর। হযরত ঈসা আ.'র জন্মস্থান ও মরিয়ম সা.'র ইবাদতগাহ হিসেবে এ শহরকে খ্রিস্টানদের আঁতুড়ঘরই বলা যায়।

তাই এ শহরকে নিয়ে যুগে-যুগে এতো দ্বন্দ্ব-সংঘাত, কাড়াকাড়ি। বিশ্ব ইতিহাসের রক্তক্ষয়ী অনেক যুদ্ধের দগদগে ক্ষত লেপ্টে রয়েছে শহরটির ঐতিহ্যে। আর আগত দিনের অনিবার্য সংঘাতের আভাস তো এখনি পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমান অগ্নিগর্ভ প্রেক্ষাপটও ঐতিহাসিক এ সূত্রতারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

১২৪৪ সাল। মুসলমানরা দ্বিতীয়বারের মতো ক্রুসেডারদের হাত থেকে উদ্ধার করলো পবিত্র জেরুসালেম। ইউরোপীয়রা এটা সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। পারার কথাও নয়। ইউরোপজুড়ে চললো তোলপাড়। চাপা উত্তেজনা সর্বত্র। নয়া ক্রুসেডের পদধ্বনি শোনা গেলো ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম পাড়ে। প্রস্তুতি চললো পুরোদমে।

১২৪৯ সাল। পোপ ডাক দিলেন অনুমিত ধর্মযুদ্ধের। ঘোষিত হলো সপ্তম ক্রুসেড। কিন্তু অন্যবারের মতো এবার আর তেমন সাড়া পড়লো না। সাজসাজ রব উঠলো না ইউরোপের রাজধানীগুলোতে। এর কারণ হিসেবে প্রথমত বলা যায় বিধ্বংসী মোঙ্গল ঝড়-এশিয়া তছনছ করে যা এবার ইউরোপমুখী। পূর্ব ও মধ্য ইউরোপ তখন মোঙ্গল উত্তাপ ভালোই টের পাচ্ছিল। নিজেদের ভৌগলিক নিরাপত্তাই যেখানে হুমকির মুখে সেখানে মধ্যপ্রাচ্যের ভূত চাপবে কী করে!

দ্বিতীয়ত ১৫৪ বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা। ইতিপূর্বে ছয়-ছয়টি হিংস্র ক্রুসেডের নেতৃত্ব দিয়েছে মূলত পশ্চিম ইউরোপ। কিন্তু এ পর্যায়ে এসে তারা কিছুতেই হিসাব মেলাতে পারছে না। টানা দেড়শ বছর ধরে এতো এতো যুদ্ধ, লক্ষ লক্ষ ক্রুসেডারদের প্রাণহানী আর আকাশচুম্বী সামরিক ব্যয়; অথচ প্রাপ্তি হলো লেভান্টের কিছু অংশ। লাভের তুলনায় লোকসানটা তাই শতগুণ বেশি।

এসব কারণেই তাদের এবারের এই নিরাবেগ নীরবতা। তবে একমাত্র ব্যতিক্রম হয়ে দেখা দিল ক্রুসেডের জনক রাষ্ট্র ফ্রান্স। ক্রুসেডের ঝাণ্ডা এবার এককভাবে তুলে ধরলো ফিরিস্জিরা। অন্যরা দায়সারার জন্যই শুধু শরিক থাকলো।

লুই নবম। বিখ্যাত ফরাসি সম্রাট। অন্যান্য ইউরোপীয় সম্রাটদের থেকে তিনি ছিলেন একদম আলাদা। জোচ্ছুরি, লাম্পট্য, অনাচার ও অমিতাচার থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। সেইসাথে ছিলেন একজন ধার্মিক খ্রিস্টান। ধর্মীয় সকল রীতিনীতি তিনি পুরোপুরি পালন করতেন। একারণে গণমানুষের কাছে তিনি ছিলেন সেন্ট লুই নামে পরিচিত। তাকে সর্বস্তরের জনগণ হৃদয় থেকে শ্রদ্ধা করতো। তার প্রতি তাদের ছিল অগাধ আস্থা। সেই মহান রাজা নবম লুই এবার নামলেন ক্রুসেডে। আশাহত ইউরোপে তাই নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো।

১৩ মে ১২৪৯ সাল। নবম লুইয়ের নেতৃত্বে ফরাসি সেনাদের সাথে সম্মিলিত ক্রুসেডবাহিনী ইউরোপ ছাড়লো। ১২০টি বিশালাকৃতির জাহাজ ভর্তি সেনা ও

অস্ত্র নিয়ে নামলো ভূমধ্যসাগরে। তারা জেরুসালেম দখলের অভিপ্রায়ে পূর্বমুখী হলেও এবার রোখ করলো আইয়ুবীয় মিশরের দিকে। সেনাপতি বাইবার্সের কায়রো পানে।

ক্রুসেডের দেড়শ বছরের তেতো অভিজ্ঞতায় তারা এটা অন্তত বুঝে নিয়েছিল, জেরুসালেম বা পুরো শাম কজা করতে হলে সর্বাঙ্গে মিশর অধিকার করতে হবে। কারণ তখন শাম ছিল মিশরীয় আইয়ুবি সালতানাতে'র গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রদেশ। তাই যতোবারই শামে আক্রমণ হয়েছে, ততোবারই মিশরীয় বাহিনীর তোপের মুখে ক্রুসেডারদেরকে বিপর্যস্ত হতে হয়েছে। গাজি সালাহউদ্দিন আইয়ুবি এই মিশর থেকেই অভিযান চালিয়ে বাইতুল মাকদিস পুনর্দখল করেছিলেন। সুলতান আস সালিহও মিশর থেকে আক্রমণ চালিয়েই দ্বিতীয়বার বাইতুল মাকদিস পুনরুদ্ধার করেন। তাই মিশরে মুসলিম শাসন বহাল থাকলে শামকে কখনোই জবরদখল করা যাবে না। আর করা গেলেও; তা হবে সাময়িক। এজন্যেই এবারের ক্রুসেডের প্রধান টার্গেট হলো মিশর। ক্রুসেড বাহিনী ধেয়ে চললো কায়রো অভিমুখে।

ভূমধ্যসাগর থেকে কায়রোর পথে দুটি বন্দরের যে কোনো একটি ব্যবহার করতে হয়। আলেকজান্দ্রিয়া না হয় আদ দামিয়াত। অপেক্ষাকৃত কম সুরক্ষিত হওয়ায় ক্রুসেডাররা আদ দামিয়াত অবতরণ করলো। সেখানে ছোট্ট একটি দুর্গ ছিল। যার কেল্লাদার ছিলেন ফখরউদ্দিন। তিনি ছিলেন দুঃসাহসী যোদ্ধা। তৎক্ষণাৎ কায়রোয় সেনা সাহায্য চেয়ে দূত পাঠালেন। সেই সাথে নিজের স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়েই বুক চিত্তিয়ে রুখে দাঁড়ালেন ক্রুসেডের এই নতুন তুফানের বিরুদ্ধে। অনেকদিন ঠেকিয়ে রাখলেন খ্রিস্টান সয়লাব; কিন্তু বারবার সেনা সাহায্য চেয়েও কায়রো থেকে যখন কোন সাড়া পেলেন না, তখন তিনি হাল ছেড়ে দিলেন। এমন অসম যুদ্ধকে আত্মহত্যার নামান্তর ভেবে কেল্লা ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন কায়রো। পরে জানলেন, সুলতান মৃত্যুশয্যা গ্রহণকায় সেনা সাহায্যের বিষয়টি তাকে অবহিত করা হয়নি। আদ দামিয়াত হাতছাড়া হবার মধ্য দিয়েই শুরু হলো সপ্তম ক্রুসেড। এ বিজয়ের ফলে ক্রুসেডারদের মনোবল অনেকটাই বেড়ে গেলো। তাই কায়রো আক্রমণে তারা আরো উদগ্রীব হয়ে উঠলো। ২৬ নভেম্বর ১২৪৯ সাল। সম্মিলিত ক্রুসেড বাহিনী কায়রোর উদ্দেশে আদ দামিয়াত ত্যাগ করলো। এর তিনদিন আগেই সুলতান আস সালিহ মৃত্যুবরণ করলেন। অথচ এহেন দুর্যোগময় মুহূর্তে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রয়োজনটাই সবচে' বেশি ছিল। অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, সুলতানের এই মৃত্যুর খবর চেপে রাখা হলো বেশ কয়েকদিন। ক্রুসেড আত্মসনের মুখে আইয়ুবীয়রা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব জড়িয়ে পড়ুক, এটা চাইতেন না একজন নারী। তাঁর এই ইচ্ছাতেই

নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় সব ফরমালিটি চলতে লাগলো। এমনকি সুলতানের ঘরে নিয়মিত খাবারও পাঠানো হতে লাগলো। রাজকীয় ফারমানও জারি হলো, তাতে সুলতানের স্বাক্ষরও দেওয়া হতো! বাহরি মামলুকদের যে দলটি সুলতানের ঘর পাহারায় ছিল, তারাও জানতো না সুলতানের মৃত্যুর খবর! এসবের নেপথ্যে যে নারীর ভূমিকা ছিল, তিনি ছিলেন মূলত এক আর্মেনীয় দাসী। আব্বাসীয় খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহ এ দাসীকে উপহারস্বরূপ সুলতান আস-সালিহর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। সেই দাসী এতোটাই রূপবতী ছিলেন যে, তাকে দেখেই সুলতান অভিভূত হয়ে যান। ফলে দাসী হিসেবে না রেখে তৎক্ষণাৎ বিয়ে করে তাকে সুলতানার মর্যাদা দেন। ইতিহাসে তার সঠিক নাম জানা না গেলেও; তিনি ‘শাজারাতুদ দুর’ নামেই সমধিক পরিচিত। অনেক ঐতিহাসিক তাঁকেই মূলত মামলুক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে উল্লেখ করেন। ‘শাজারাতুদ দুর’ মানে মুক্তাবৃক্ষ। আগুনে রূপের সাথে তিনি গুণেও ছিলেন অনন্যা। ধাবমান ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় সুলতানের নামে ফরমান জারি করে সৈন্যদের দ্রুত প্রস্তুত করিয়ে নেন। মসুলে থাকা আস সালিহপুত্র তুরান শাহকে সিংহাসনে এসে বসার আহ্বান জানিয়ে চিঠিও লিখেন। মূলত তাঁর এই দূরদর্শীতায়ই সুলতানের মৃত্যুতে কোনো ধরণের রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়নি। আগত ক্রুসেডারদের জন্য অনুকূল মাঠও তৈরি হয়নি।

২১ ডিসেম্বর ১২৪৯ সাল। ক্রুসেডার বাহিনী অবশেষে বাহরুস সাগিরের তীরে এসে পৌঁছায়। খ্রিস্টানরা ছিল তিনভাগে বিভক্ত। একাংশের নেতৃত্বে আছেন সম্রাট নবম লুইয়ের তৃতীয় ভাই আলফানসো। আরেক অংশের নেতৃত্বে অপর ভাই রবার্ট। বাকি অংশ থাকলো অন্য ভাই চার্লস ও স্বয়ং নবম লুইয়ের নেতৃত্বে।

বিখ্যাত নীলনদের একটি শাখা হচ্ছে এই বাহরুস সাগির। নীলনদের চেয়ে আকারে ছোট হওয়ায় এর নাম ‘বাহরুস সাগির’ বা ছোট নদী। এই নদীর অপর তীরেই মানসুরাহ শহর। মানসুরাহ মিশরের একটি শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি। এর পতন ঘটাতে না পারলে কায়রো দখল করা অসম্ভব।

ক্রুসেড বাহিনী নদীর পাড়ে এসে দেখলো পরলোকগত সুলতানের মায়ের নেতৃত্বে মিশরীয় বাহিনী প্রস্তুত বাহরুস সাগিরের অপর তীরে। নদী পেরুবার জন্য কোনো সাঁকো না থাকায় খ্রিস্টানরা নদী ভরাট করতে শুরু করলো। জবাবে মুসলিম বাহিনী বৃষ্টির মতো তীর নিক্ষেপ করতে লাগলো। তীরবৃষ্টির মুখে খ্রিস্টানরা পিছু হটলো। এবার কাঠের চলন্ত ঘরের আড়াল নিয়ে খ্রিস্টানরা পুনরায় বাঁধ দিতে চেষ্টা করলো। মুসলিম বাহিনী এবারে নদীর পাড় কাটা শুরু করলো। খ্রিস্টানরা বাঁধ নিয়ে যতোই আগায়, মুসলিমরা ততোই পিছিয়ে দেয়।

সেই সাথে তীরবৃষ্টি তো আছেই। এভাবেই চলতে থাকলো প্রায় ছয় সপ্তাহ। কোনো ফল আসছে না দেখে ক্রুসেড বাহিনী আদ দামিয়াত ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিল। ঠিক এসময়েই স্থানীয় এক খ্রিস্টান এসে সম্রাট লুইকে জানালো, মাত্র তিন মাইল ভাটিতেই নদী পারাপারের সাঁকো রয়েছে!

৮ ফেব্রুয়ারি ১২৫০ সাল। টানা ছয় সপ্তাহ নদীর ওপারে হাসফাঁস করার পর বিশ্বাসঘাতকের দেখানো পথে অত্যন্ত গোপনীয়তায় ক্রুসেডারদের তিনটি বাহিনীর একটি রবার্টের নেতৃত্বাধীন বাহিনী নদী পেরিয়ে চলে এলো মুসলিম বাহিনীর ঘাড়ের উপর। এবং অজান্তেই ক্রুসেডারদের অশ্বারোহী বাহিনী টুটে পড়লো পদাতিক মুসলিম তীরন্দাজ সৈন্যদের উপর। ফলাফল যা হবার তাই হলো। সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেলো ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীটি। অপর দুটি ক্রুসেড বাহিনী তখনো নদী পেরুতে পারেনি। টানা দ্বিতীয় জয় পেলো ক্রুসেড বাহিনী। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস জন্মে গেলো, এবার তারা সঠিক পথেই হাঁটছে! এখন টার্গেট মানসুরাহ। কিন্তু তারা জানতো না, সেখানে তাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে! কার মুখোমুখি তারা হতে যাচ্ছে! তিনি আর কেউ নন, ক্রুসেডেরই সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা সেনাপতি—রুকনুদ্দিন বাইবার্স। দ্য প্যাহার।

বাইবার্স এখন সাতাশ বছরের টগবগে যুবক। বাহরি মামলুক রেজিমেন্টের মধ্যমণি। মামলুক সেনাদের প্রিয়পাত্র, কমান্ডার। তার নির্দেশে দুর্ধর্ষ মামলুক সেনারা উত্তপ্ত আগুনে ঝাঁপ দিতে, উত্তাল সাগরে লাফিয়ে পড়তেও কুষ্ঠাবোধ করে না।

১২৪২ সালে বাছাই করা মাত্র সাতশ সৈন্য নিয়ে মামলুক রেজিমেন্ট গঠিত হলেও আট বছরের মাথায় এসে এখন এ বিশেষ বাহিনীর সংখ্যা দশহাজারে গিয়ে ঠেকেছে। যদিও সুলতানের দেহরক্ষী বাহিনী হিসেবে এই বিশেষ ইউনিটের অভ্যুদয়; কিন্তু কালক্রমে এরাই এখন আইয়ুবীয় বাহিনীর সর্বশ্রেষ্ঠ রেজিমেন্ট। শক্তি, সাহস, ক্ষিপ্ততা, মেধা সর্বোপরি প্রশিক্ষণে এরা অন্য সবার চেয়ে একটু বেশিই ব্যতিক্রম। এরা এখন শুধুই রক্ষীবাহিনী নয় নিয়মিত সেনাবাহিনীর স্পেশাল ফোর্সের কাজও এদের দ্বারা চলছে।

১২৪৪ সালে মার্ন এর যুদ্ধে তরুণ বাইবার্সের বিচক্ষণ সিদ্ধান্তের ক্ষিপ্ত আক্রমণে বিশ গুণ বেশি সৈন্যের পুরো শত্রুবাহিনী নিশ্চেষ্ট হয়ে গেলে কার্যত এখানেই খ্রিস্টানদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়। ফলে বাইবার্স মাকদিস খুব সহজেই উদ্ধার হয়। এজন্যে তখন থেকেই লোকমানসে তিনি দ্বিতীয় সালাহউদ্দিন হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছেন। আর এ কারণেই পরবর্তীকালেও দুর্ধর্ষ বাহরি মামলুকদের কমান্ডিং তার হাতেই রেখে দেয়া হয়। এখন তিনিই এ বাহিনীর নিয়ন্তা সর্বাধিনায়ক।

এদিকে আস সালিহ পুত্র তুরান শাহ মসুল থেকে এখনো না ফেরায় রাষ্ট্রীয় সকল বিষয়-আশয় পরলোকগত সুলতানের নামেই চালিয়ে যাচ্ছেন তুরান শাহর সৎ মা সুলতানা শাজারাতুদ দুর। মর্যাদাসিক বাহরুস সাগির যুদ্ধ তাঁরই নির্দেশনায় সংঘটিত হয়। বাহরুস সাগিরের বিপর্যয়ের খবর কায়রো এসে পৌঁছলে তিনি খুবই ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হন। তিনি যেমন অসামান্য সুন্দরী ছিলেন, তেমনি ছিলেন বিচক্ষণ, দূরদর্শী।

তিনি বুঝে নিলেন, আদ দামিয়াতের পর বাহরুস সাগিরের এ বিপর্যয়ে ক্রুসেডারদের মনোবল নিশ্চয় বহুগুণ বেড়ে গেছে। তারা এবার নির্ঘাত মানসুরাহর উপর আঘাত হানবে। আর মানসুরাহর পতন মানেই কায়রোর পতন। তাই তুরান শাহর আগমনের অপেক্ষা না করে, ক্রুসেড সয়লাব প্রতিরোধে তিনি এবার তার তুণীরের সর্বশ্রেষ্ঠ তীরটাই ব্যবহার করতে চাইলেন। ডেকে পাঠালেন বাহরি মামলুক বিশেষ বাহিনীর প্রধান, সেনাপতি বাইবার্সকে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ধৈর্যে আসা বিধ্বংসী ক্রুসেডের চোয়ালভাঙ্গা জবাব যদি আইয়ুবীয় বাহিনীর কেউ দিতে পারে, তবে সে একমাত্র বাইবার্সই। তাই ঘটমান পরিস্থিতির সর্বশেষ ও আদ্যোপান্ত বর্ণনা দিয়ে সুলতানা শাজারাতুদ দুর তার কাঁধেই সমর্পণ করলেন মানসুরাহ অভিযানের গুরু দায়িত্ব। জাতযোদ্ধা বাইবার্সও এটাই চাচ্ছিলেন। বহুদিন ধরে অপেক্ষায় ছিলেন এমনই একটা মহেন্দ্রক্ষণের। তার তনুমন তাই নেচে উঠলো উন্মত্ত ক্রুসেডারদের রক্তের গন্ধে।

কিলিজ। এটা শুধু একটা তরবারির নামই নয়। একটা সোনায় মোড়ানো ঐতিহ্যের স্মারক। গৌরবময় ইতিহাসের ধারক। এটা কিপচাক-কুমানদের বিশেষ একটা তরবারি। বাইবার্সের সৌজন্যে যা আজও বিশ্বখ্যাত। ভীতি জাগানিয়া এ তরবারির অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হলো- কিলিজের একেবারে অগ্রভাগ দুধারি এবং কিছুটা সোজা। ফলে প্রতিপক্ষের পেটে সেধিয়ে দেয়া খুবই সহজ। তাছাড়া এর বড়ির তুলনায় অগ্রভাগ মোটা ও কিছুটা বাঁকানো থাকায় মাথা কাটা আরো সহজ। আর অগ্রভাগ চওড়া বলে এটা দিয়ে শত্রুকে জবাই করারও কোনো জুড়ি নেই।

১২৪৪ সালে বাইতুল মাকদিস উদ্ধারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় সুলতান আস সালিহ বাইবার্সকে পুরস্কৃত করতে চাইলে তিনি এই কিলিজকেই মামলুক সেনাদের মাঝে প্রবর্তনের অনুমোদন চাইলেন। সুলতান সম্মতি দিলে কিলিজ হয়ে ওঠে দুর্ধর্ষ বাহরি মামলুকদের প্রধান তলোয়ার। জাতীয় অস্ত্র। যার তীব্রতা দিয়েই যুগের পর যুগ তারা বর্বর মোঙ্গল ও হিংস্র ক্রুসেডারদের উদ্ধত শির নত করে রেখেছিল। পরবর্তীতে তুর্কি উসমানীয়রা মামলুক সালতানাতের দখল নিলে এই কিলিজ হয়ে ওঠে বিশাল বিস্তৃত উসমানীয় খিলাফাহরও জাতীয়



অস্ত্র। তারও পরে ব্রিটিশ রাজকীয় বাহিনীও এ তরবারি ব্যবহার করে। এমনকি দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ন বোনাপার্টও ছিলেন কিলিজের প্রতি চরম আসক্ত।

সেই কিলিজেই এবার চললো অবিরত শান দেয়া। সুলতানা শাজারা তুদ দুর এর নির্দেশে মামলুকরা শুরু করলো পূর্ণ যুদ্ধ প্রস্তুতি। মানসুরাহ ময়দানে এবার তাই কিলিজের মাজেয়া দেখার পালা।

ফেব্রুয়ারি ১২৫০ সাল। সেনাপতি বাইবার্সের নেতৃত্বে মানসুরাহ অভিযুখে ঝড়ের বেগে এগিয়ে চললো ১০ হাজার দুর্ধর্ষ মামলুক সেনা। বাইবার্স ময়দানে এসেই প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয়সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করে দেন। মাত্র ৩ হাজার সেনা রাখেন নিজ কমান্ডে। বাহরুস সাগিরের যুদ্ধে ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করা খ্রিস্ট রবার্ট পূর্ব থেকেই ছিলেন ময়দানে। তাদের অপর দুটি বাহিনী এখনো নদী পেরোয়নি। বাইবার্স তার ৩ হাজার সেনা নিয়েই সরাসরি এসে রবার্টের নেতৃত্বাধীন ১৫ হাজার সৈন্যের মুখোমুখি দাঁড়ান। ক্রুসেডারদের এ বাহিনীতে ২৯০ জন নাইট ছিল। নাইট বলা হতো একাধিক যুদ্ধে বিজয়ী, চরম বীরত্ব প্রকাশকারী, সর্বোচ্চ প্রশিক্ষিত, সর্বাধিক দুঃসাহসী, চূড়ান্ত পর্যায়ের যাচাই-বাছাই করে তুলে আনা সেরা ও দুর্ধর্ষ সৈন্যদেরকে। যাদের অধীনে সাধারণ সৈন্যও থাকতো!

বাইবার্সের হাতেগোনা সৈন্য দেখেই খ্রিস্ট রবার্ট বেসামাল হয়ে মুসলিম বাহিনীর ওপর হামলে পড়েন। আর বাইবার্স তো এটাই চাচ্ছিলেন। ক্রুসেডাররা এগিয়ে আসা মাত্রই দুপাশে আগ থেকে লুকিয়ে রাখা, ২ হাজার মামলুক সেনা একসাথে বজ্র হয়ে ভেঙ্গে পড়ে ক্রুসেড বাহিনীর মাথার উপর। আর সামনের দিকে ‘দ্য প্যাছার’ হয়ে উঠলেন সত্যিকারের চিতা। চিতাবেগেই বাইবার্স তার ৩ হাজার সেনা নিয়ে ক্রুসেডারদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। পাঁচগুণ বেশি হয়েও খ্রিস্টানরা চোখে দিব্যি সর্ষেফুল দেখতে লাগলো। কার সাথে টক্কর লড়ছে জানার আগেই মারা পড়তে লাগলো পাইকারিহারে। মানসুরাহ প্রান্তরে ক্রস-সিঙ্কেলের লড়াই চললো প্রচণ্ড। এটাই ইতিহাসের বিখ্যাত মানসুরাহ যুদ্ধ। বাইবার্স শৌর্য-বীর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন। অবশেষে বাইবার্স ঝড়ের ক্রুসেডের সম্পূর্ণ বাহিনীই বিধ্বস্ত হয়ে গেলো। প্রায় সবাই কিলিজের এসিড টেস্টে পরিণত হলো। যে দুচারজন বাঁচলো, তাড়া খেয়ে তারা বাহরুস সাগিরে ঝাঁপিয়ে মরলো। এমনকি মাত্র পাঁচজন ছাড়া সকল নাইটই বেঘোরে প্রাণ হারালো। আর খ্রিস্ট রবার্ট! তিনি স্বয়ং বাইবার্সের হাতেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন।

২৮ ফেব্রুয়ারি ১২৫০ সাল। সুলতান তুরান শাহ অভিষিক্ত হয়েই মানসুরাহর পথ ধরলেন। অবশ্য বাইবার্স ততোক্ষণে ক্রুসেডারদের এক তৃতীয়াংশ-খ্রিস্ট রবার্টের বাহিনীকে সাবাড় করে ফেলেছেন। অন্যদিকে ক্রুসেডারদের অপর দুই

বাহিনী, প্রিন্স চার্লস ও সম্রাট নবম লুইয়ের সেনাদল তখন নদী পেরিয়ে বাইবার্সের মুখোমুখি চলে এসেছে।

সুলতান তুরান শাহ ময়দানে এসেই বাহরুস সাগিরের আরো ভাটিতে চলে যান। উদ্দেশ্য, আদ দামিয়াত থেকে মানসুরাহ-এ আসার পথে খ্রিস্টানদের রসদ সামগ্রীর দখল নেয়া।

১৫ মার্চ ১২৫০ সাল। মিশরীয় নৌবাহিনী খ্রিস্টানদের সরবরাহ জাহাজগুলোর উপর সর্বাঙ্গিক হামলা শুরু করলো। অল্পসময়ের ব্যবধানে আশিটিরও বেশি জাহাজ আটক করা হয়। ফলে ক্রুসেড শিবিরে খাবারের অভাবে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। হাহাকার ওঠে গোটা খ্রিস্টান বাহিনীতে।

এর কয়েকদিন পর। নদীপথে মানসুরাহর উদ্দেশ্যে আরো একটি খ্রিস্টান নৌবহর এগিয়ে আসলো।

৬ এপ্রিল ১২৫০ সাল। সুলতান তুরান শাহ ক্রুসেডারদের এই নৌবাহিনীর উপরও চড়াও হন। এবারে খ্রিস্টানরাও ছেড়ে কথা বললো না। তারা তুমুল প্রতিরোধ গড়ে তুললো। ফলে ফারিসকুর নামক স্থানে মুসলিম ও ক্রুসেডারদের মধ্যে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইতিহাসে এটি ফারিসকুর এর যুদ্ধ নামে পরিচিত। এ যুদ্ধে ৫ হাজার খ্রিস্টান সেনা নিহত হয়। এখানেও মুসলিম বাহিনীর হাতে ক্রুসেডারদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে।

অপরদিকে ফারিসকুর এর অদূরে সেনাপতি বাইবার্স তখন তার পুরো মামলুক বাহিনীকে মানসুরাহ দুর্গের পাদদেশে একত্রিত করেন এবং ধৈর্যে আসা ফরাসি সম্রাট নবম লুইর নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত বাহিনীর মুখোমুখি হন। অবশেষে সেখানে এক ভয়ঙ্কর ফয়সালামূলক ও ব্যাপক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। ইতিহাসে এটিও মানসুরাহর যুদ্ধ নামে পরিচিত। এ যুদ্ধে মামলুকরা তাদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি সৈন্যের বিরুদ্ধে যে বীরত্ব প্রদর্শন করে, তা এককথায় অবর্ণনীয়। বাইবার্সও তার নামের সার্থকতার প্রমাণ দেন খুব বেশি করে। দুর্ধর্ষ জাতযোদ্ধা মামলুকদের টর্নেডো গতির কাছে লজ্জাজনক পরাস্ত হয় সম্রাট লুইর নেতৃত্বাধীন ক্রুসেড বাহিনী। যুদ্ধে ৭ হাজার ক্রুসেডার ময়দানেই নিহত হয়। ২০ হাজার হয় ধৃত। দুর্ভিক্ষ, মহামারি ও পালাতে গিয়ে নিহত হয় আরো প্রায় ১০ হাজার সৈন্য। সম্রাট নবম লুই বন্দি হন স্বয়ং বাইবার্সের হাতে। টানা ক্রুসেডের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো কোন ইউরোপীয় দেশের সম্রাট ধরা পড়লেন। ইউরোপের যে শ্রেষ্ঠ সম্রাট বাইতুল মাকদিস, দামেশক, কায়রো জয়ের স্বপ্নে বিশাল বাহিনী নিয়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়েছিলেন, ভাগ্যের পরিহাসে তিনি আজ যুদ্ধবন্দি হয়েই কায়রো যাচ্ছেন। জেরুসালেম তো বহুদূর! বাইবার্সের বজ্রাঘাতে কায়রোর ধার ঘেঁষার আগেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায় ক্রুসেডের

এ বিশাল বাহিনীটি। অভাবনীয় এ বিজয়ের ফলে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র, এমনকি ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের ঘরে ঘরেও আলোচিত হতে থাকে একটিমাত্র নাম-রুকনুদ্দিন বাইবার্স, দ্য প্যাছার।



তুরান শাহ। আইয়ুবী বংশের সর্বশেষ সুলতান। অন্যভাবে বলতে গেলে আইয়ুবীয় অথর্ব, অপদার্থ, সুলতানদের গণমিছিলের তিনিই সর্বশেষ সংযোজন। তিনি যেমন ছিলেন চরম অববেচক, অহঙ্কারী তেমনি চূড়ান্ত একগুঁয়ে, অপরিণামদর্শী। তার কাছে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ যতোটা মুখ্য, ঠিক ততোটাই গৌণ দেশ-জাতির বৃহত্তর স্বার্থ। মানসুরাহ রণাঙ্গণ থেকে ফিরেই তিনি স্বরূপে আবির্ভূত হন। কোথায় মানসুরাহর জাতীয় বীরদের সম্মানিত করবেন! তা না করে বরং গুরু করেন প্রবঞ্চনা। বেছে বেছে করতে থাকেন অপমানিত, পদচ্যুত।

তারই সৎমা সুলতানা শাজারাতুদ দুর। যিনি তার জন্যই কেবল আগলে রেখেছিলেন কায়রোর মসনদ। সুলতানের মৃত্যুর খবর চেপে রেখেছিলেন তারই আগমনের প্রতীক্ষায়। সেই শাজারাতুদ দুরই হলেন সবচে' বেশি লাঞ্ছিত, তিরস্কৃত। তুরান শাহ মসনদে বসেই প্রয়াত সুলতানের মৃত্যুশয্যা থেকে নিয়ে তার ক্ষমতাসীন হওয়া পর্যন্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ লিখিত হিসাব চেয়ে বসেন সুলতানার কাছে। শাজারাতুদ দুর হিসাব দিতে ব্যর্থ হলে তাকে সবার সামনেই চরমভাবে অপমানিত করেন। উপস্থিত মামলুক নেতৃবৃন্দ এর প্রতিবাদ জানালে তাদের কারো ভাগ্য জোটে তিরস্কার কারো হয় পদচ্যুতি।

সদ্যপ্রাপ্ত ক্ষমতার গরমে তুরান শাহ এতোই নির্বোধ হয়ে যান যে, মানসুরাহ যুদ্ধে বাইবার্সের হাতে গ্রেপ্তার ফরাসি সম্রাট নবম লুইকে মঙ্গল যুদ্ধবন্দী হিসেবে কায়রোর রাজ দরবারে নিয়ে আসা হলো, তখন সুলতান তুরান শাহ কারো কোনো পরামর্শের তোয়াক্কা না করেই দশ লাখ দিনারের বিনিময়ে এবং কেবলমাত্র আদ দামিয়াত ছেড়ে দেবার শর্তে সম্রাটকে মুক্তি দিয়ে দেন। তার এই হঠকারি সিদ্ধান্তে মামলুক নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রের বিশ্বস্ত অনেকেই তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। জনগণ হয়ে ওঠে প্রতিবাদমুখর। কারণ সম্রাট লুই ছিলেন ইউরোপের পরাজিত ফ্রান্সের সম্রাট। তিনি এমন এক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সম্রাট, যার বিনিময়ে চাইলে অকল্পনীয় অনেক কিছুই আদায় করা যেতো। খোদ বাইবার্স,

যিনি সম্রাটকে বন্দি করেছিলেন তিনিও এ সহজ শর্ত মেনে নিতে পারেননি। তিনি চাচ্ছিলেন, মুক্তিপণ হিসেবে ফরাসিদের আরব উপনিবেশ, লেবাননভিত্তিক কান্ট্রি অব ত্রিপোলি যেন মুসলিমদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু তুরান শাহর কাছে মুসলিম ভূখণ্ডের চেয়ে অর্থমূল্যের গুরুত্ব ছিল সবচে' বেশি। ফলে বাইবার্স তুরান শাহর উপর ক্ষেপে যান। তাছাড়া বিজয়ী মামলুক বাহিনীর প্রতি তুরান শাহর অন্যায় আচরণ, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে বিশ্বস্ত লোকদের হটিয়ে নিজের অযোগ্য অনুচরদের পুনর্বাসন, মামলুকদের প্রতি অসম্ভব রকমের সহমর্মী সুলতানা শাজারাতুদ দূরকে লাঞ্ছিতকরণ এবং রাষ্ট্রীয় আরো নানাবিধ বিষয়ে অন্যায় হস্তক্ষেপের কারণে অবশেষে মামলুকরা তাকে হত্যার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে ফেলে।

২ মে ১২৫০ সাল। তুরানশাহ এক ভোজসভা থেকে ফেরার পথে আগ থেকেই ওঁৎ পেতে থাকা মামলুকরা তার উপর হামলা করে। জীবন বাঁচাতে তিনি কোনোক্রমে নীলনদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অদূরেই তখন ছিলেন বাইবার্স। তুরান শাহ বেঁচে যাচ্ছেন দেখে তিনিও নীলের বুকে ঝাঁপ দেন। একপর্যায়ে তাকে হত্যাও করে ফেলেন। তুরান শাহর এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যদিয়ে মিশর-সিরিয়ায় ৭৬ বছরের আইয়ুবীয় শাসনের অবসান ঘটে। তুরান শাহ মাত্র দুমাস চারদিন মসনদে ছিলেন। আইয়ুবীয় শাসকদের মধ্যে সালাহউদ্দিন, আল আদিল, আস সালিহ বাদে প্রায় সকলেই ছিলেন চরম পর্যায়ে অযোগ্য এবং বিলাসী। যে কারণে সেখানে কোন্দল, হানাহানি লেগে থাকতো প্রতিনিয়ত। বিদ্রোহ-গৃহযুদ্ধ ছিল নৈমিত্তিক। ফলে অকালেই সম্ভাবনাময় একটা সালতানাতের অপমৃত্যু ঘটলো।

তুরান শাহ নিহত হবার পর মামলুকদের সমর্থনে সুলতানা শাজারাতুদ দূর কায়রোর মসনদে বসেন। যুগ্মভাবে সুলতান করা হয় তুরান শাহর শিশুপুত্র আল আশরাফ মুসাকে। প্রধান প্রশাসক নিযুক্ত হন মামলুক আমির আইবাক। আল আশরাফ মুসার ডাকনাম ছিল খলিল। তাই শাজারাতুদ দূর উপাধি ধারণ করেন উম্মুল খলিল। মিশর-সিরিয়ায় শুরু হয় বাহরি মামলুক শাসন। যার পরোক্ষ নেতৃত্বে আছেন দুজন। সেনাবাহিনীতে দুরন্ত বাইবার্স, মন্ত্রীসভায় প্রভাবশালী আমির আইবাক।

বাইবার্স তুরান শাহকে হত্যা করে মিশরে মামলুক শাসন প্রতিষ্ঠা করলেন ঠিকই; কিন্তু এর সুফল তিনি ভোগ করতে পারেননি না। অথচ এ পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সবচে' বেশি লাভবান হলেন আমির আইবাক। প্রধান প্রশাসক হয়েই নিজের আখের গোছাতে শুরু করলেন তিনি।

তুরান শাহকে হত্যা করায় বাইবার্‌সের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো তুরান শাহর বন্ধু-অনুচররা। ঝোপ বুঝে কোপ মারলেন আমির আইবাকও। বাইবার্‌সের বিরুদ্ধে জ্বলেওঠা এ আশুনকে পুরোমাত্রায় উস্কে দিতে লাগলেন আমির আইবাক। অথচ এই আইবাক তুরান শাহ হত্যায় প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ জড়িত ছিলেন। এমনকি তুরান শাহকে সরাতে তিনিও ছিলেন লালায়িত।

একজন মামলুক হয়েও আইবাক কেন বাইবার্‌সের পিছু নিলেন, এর কারণ হিসেবে ঐতিহাসিকরা বলেন, কিশোর বয়সেই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি যুদ্ধে বিশাল বিজয় ও অসীম সাহসিকতার কারণে একজন মামলুক হওয়া সত্ত্বেও পুরো মিশর-সিরিয়ায় বাইবার্‌স ছিলেন অসম্ভব জনপ্রিয় ব্যক্তি। অপ্রতিদ্বন্দ্বী সমরনায়ক। আর মামলুক রেজিমেণ্টে বাইবার্‌সের প্রভাব তো দেহের উপর মস্তিষ্কের মতোই। অথচ এসবের নূন্যতমও ছিল না আইবাকের ব্যক্তিত্বে। তাই চতুর আইবাক বুঝে নিলেন, মিশরের ভবিষ্যৎ মামলুক শাসনে বাইবার্‌সই হবেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সেখানে আইবাক হবেন অপাংক্তেয়। তাই পথের কাঁটা সরাতে আইবাক বাইবার্‌সের পিছু নিলেন। তাকে কলুষিত করতে উঠেপড়ে লাগলেন।

বাইবার্‌স যখন বুঝলেন, কায়রো তার জন্য আর নিরাপদ নয়। ক্রমেই পরিস্থিতি তার প্রতিকূলে চলে যাচ্ছে, তখন তিনি দামেশকে চলে গেলেন। তখন দামেশকের গভর্নর ছিলেন আন নাসির। যিনি ছিলেন আইবাকের ঘোর বিরোধী। আইবাকের স্বভাব কটিলতার কারণে তিনি তাকে দেখতে পারতেন না দুচোখে। তাই বাইবার্‌সের মতো বীর যোদ্ধাকে পেয়ে খুশিই হলেন আন নাসির। সাগ্রহে বরণ করে নিলেন বাইবার্‌সকে।

সুলতানা শাজারাতুদ দুর যেমন ছিলেন রূপসী, বুদ্ধিমতি, বিচক্ষণ; তেমনি তিনি ছিলেন একজন উচ্চাভিলাষী নারী। শ্রেফ সুলতানা হয়েই তিনি থেমে থাকেননি; জুমআর খুতবায়ও তার নাম ঘোষণার হুকুম জারি করলেন। সেইসাথে মিশর-সিরিয়ার সুলতানা হিসেবে নিজেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে বাগদাদের আব্বাসি খিলাফাহর দরবারে দূতও পাঠালেন। দূত মারফত সব জেনে খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহ ভীষণ চটে গেলেন। কারণ শাজারাতুদ দুর ছিলেন তারই ক্রীতদাসী। তাই অনুমতি দেবার পরিবর্তে কায়রোর আমিরদের কাছে ব্যঙ্গাত্মক একখানা পত্র লিখলেন: “তোমাদের মধ্যে যদি কাউন্ট শাসন করার মতো কোনো পুরুষ লোক না-ই থাকে, তাহলে আমাকে বললেই পারতে! আমি না হয় একজন পুরুষ পাঠিয়ে দিতাম!”

খলিফার এ ব্যঙ্গোক্তি শুনেই মামলুক আমিররা সুলতানা শাজারাতুদ দুরকে তৎক্ষণাৎ অপসারণ করেন। তদস্থলে ইয়যুদ্দিন উপাধি দিয়ে আমির আইবাককে নতুন সুলতান হিসেবে মনোনীত করেন। সুলতানা শাজারাতুদ দুর এর

শাসনকাল ছিল মাত্র চল্লিশ দিন। শাজারাতুদ দূর ক্ষমতা হারানোর পর এবং আইবাক ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই উভয়ের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায়। ফলে রাজচক্রে ঘোরপাক খাওয়া একটা বিশাল সালতানাতে আপাত স্থিতিশীল আবহ তৈরি হয়। এভাবেই চললো কয়েক বছর।

কিন্তু আইবাক ছিলেন কূটিল চরিত্রের একজন বদমেজাজি লোক। তাই তার কঠিন শাসনে বিভিন্ন অঞ্চলে ধুমায়িত হতে থাকলো অসন্তোষ। দিকে দিকে দানা বাঁধলো ক্ষোভ। সর্বত্র দেখা দিল বিদ্রোহের ঘনঘটা। বাইবার্শের সাথে শত্রুতার জেরে স্বয়ং মামলুক সেনারাও তখন তার বিরোধী। মামলুক সেনাদের অধিকাংশই তাই কায়রো ছেড়ে দামেশকে অবস্থান নিয়েছে বাইবার্শের সাথে। এমন একসময় জাযিরায় দেখা দিল বিদ্রোহ। কূটিল আইবাক বিদ্রোহ দমন না করে শুরু করলেন কূটচাল। অবশেষে তার জন্য এটাই হয়ে উঠলো কাল। আইবাক গোপনে জাযিরার আমিরের মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। উদ্দেশ্য, বিদ্রোহ দমিয়ে মৈত্রী স্থাপন। কিন্তু এ খবর যার না শোনাই ছিল ভালো, তিনিই শুনে ফেললেন সর্বাত্মে। শাজারাতুদ দূর চটলেন বেশ। তার আত্মসম্মানে লাগলোও খুব। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে আইবাককে তাই হত্যার হুকুম দিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ সে হুকুম কার্যকরও হয়ে গেল। ১২৫৭ সালে ঘাতকদের হামলায় গোসলরত অবস্থায় হাম্মামখানায় নিহত হন আইবাক। আবার পালাবদল ঘটলো সদ্য অভ্যুদয় ঘটা মামলুক সালতানাতে। এবারে সুলতান হিসেবে মামলুক সিংহাসনে সমাসীন হলেন সুলতানা শাজারাতুদ দূর ও সুলতান আইবাকের ছয় বছরের নাবালক পুত্র আলি। তাকে উপাধি দেয়া হয় আল মানসুর। সেইসাথে উপ-সুলতান হিসেবে মঞ্চে আসলেন এক নতুন মুখ-সাইফুদ্দিন কুতুজ। তেরো বছর আগে সুলতান আস সালিহর বাইতুল মাকদিস অভিযানে খাওয়ারিজমের যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী অংশ নিয়েছিল, সে বাহিনীরই নেতা ছিলেন এই কুতুজ। তাঁর আরো একটা বড় পুষ্টিচয় হলো, তিনি হলেন খাওয়ারিজমের বিখ্যাত সুলতান আলাউদ্দিন শাহ মুহাম্মাদের নাতি। কুতুজের পিতা খান সুলতান ছিলেন শাহ মুহাম্মাদের তৃতীয় পুত্র।

ছয় বছরের শিশু আলি নামে সুলতান হলেও সব ক্ষমতা নবনিযুক্ত উপ-সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজের হাতে চলে আসে। মিশরীয় মামলুক সালতানাতে এবার কার্যত শাসন চললো খাওয়ারিজমি।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, কুতুজ ছিলেন আইবাকের ঘোর সমর্থক। তাই আইবাক হত্যার দায়ে শাজারাতুদ দূর এর উপর তিনি ছিলেন বেজায় রুষ্ট। তাছাড়া শিশু সুলতানকে যথেষ্ট ব্যবহার করতে গেলে মা শাজারাতুদ দূর বাগড়া দিতে পারেন, এই ভয়ে শাজারাতুদ দূর এর একটা বিহিত করার মনস্থ

করলেন কুতুজ। সেমতে তাকে গ্রেফতার করালেন তিনি। তাকে পাঠিয়ে দিলেন আইবাকের প্রথম স্ত্রী, সুলতানা শাজারাতুদ দুর'র সতীনের কাছে। কুতুজের প্রশ্নে সেই ডাইনি মিশরের সাবেক সুলতানা শাজারাতুদ দুরকে হিন্ধবস্ত্র করে কায়রোর রাজপথে ঘোরালো। অবশেষে কাঠের খড়ম দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয় তাকে। এই নির্মমতার এখানেই শেষ নয়; শাজারাতুদ দুর'র রক্তাক্ত নগ্নপ্রায় মৃতদেহ প্রকাশ্যে বুলিয়ে রাখা হয় নগরদুর্গের মিনারে! কুতুজের এই জঘন্য কর্মকাণ্ডে মিশরজুড়ে ধিক্কার ওঠে। সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন নারী; যিনি কি-না তাদেরই একসময়ের সুলতানা। তার এমন লাঞ্ছনা মিশরবাসী মেনে নেয়নি। ক্ষোভে ফুঁসে ওঠে জনগণ। শেষ পর্যন্ত কিছু সাহসী মুসলিমের প্রচেষ্টায় সুলতানা শাজারাতুদ দুর'র ক্ষত-বিক্ষত লাশ সেখান থেকে নামিয়ে সমাহিত করা হয় তারই প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায়।

দামেশকে অবস্থানরত বাইবার্সের কানে এ ঘটনার বৃত্তান্ত গেলে তিনি রেগে জ্বলে উঠেন। মামলুকরাও ক্রোধে ফেটে পড়ে। কারণ এ ঘটনা শুধুই একজন নারীর অপমান নয়; বরং গোটা নারীজাতির জন্যই কলঙ্কজনক। তাছাড়া মামলুকরা সুলতানা শাজারাতুদ দুরকে নিজেদের মাতৃসম ভাবতো। ফলে কুতুজের কাছ থেকে এর চরম প্রতিশোধ নিতে মামলুকরা সংকল্পবদ্ধ হলো। মিশরে যখন এসব অস্থিতিশীলতা চলছিল, ঠিক তখন বাগদাদে আঘাত হানতে ফণা তুললো বর্বর মোঙ্গলরা। তারও আগে এই বর্বররা সুবিশাল খাওয়ারিজম সালতানাতকে বিধ্বস্ত করেছে। যেহেতু 'দ্য প্যাঙ্কার' এর সামনের ইতিহাসটা মোঙ্গল সংশ্লিষ্ট, সেহেতু মোঙ্গলঝড়ের ঐতিহ্যবাহী আলোচনা কিছুটা পেছন থেকেই নিয়ে আসা বাঞ্ছনীয়। এবার আমরা তাই একটু পেছন ফিরে যাবো। বাইবার্সের জন্মেরও বেশ ক'বছর আগে।



ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনাকাল। আব্বাসীয় খিলাফাহ। মানচিত্রেই কেবল বিশাল সাম্রাজ্য। ভেতরটা পুরোই অন্তঃসারশূন্য। রুহানিয়্যাতে নাম-গন্ধও নেই। কার্যকর কর্তৃত্বের অস্তিত্বও সেখানে অনুপস্থিত। তাই কাসরুল খুলদের প্রতি মানুষের ভাব নিতান্তই ফরমালিটি। অমুসলিম বিধে বাগদাদের সম্মুখ-ভয় স্রেফ সীমান্তের সক্রিয় সালতানাতগুলোর সৌজন্যে। তখন মুসলিম বিশ্বের পূর্বদিগন্ত নিয়ন্ত্রণ করছে খাওয়ারিজমিরা। গোবির বুকে ফণা তোলা মোঙ্গল ঝড়ের মুখে



দাঁড়িয়ে এরাই সুরক্ষা দিচ্ছে বিশাল-বিস্তৃত উম্মাহকে। পশ্চিম দিকের পাহারাদার আইয়ুবির। ভূমধ্যসাগর থেকে ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠা ক্রুসেড হ্যারিকেন এরাই সামলাচ্ছে যুগের পর যুগ। সেইসাথে নিশ্চিত করেছে মিল্লাতের পবিত্র ভূমিগুলোর সার্বিক নিরাপত্তা। আর মাঝখানে নির্বিকার বসে বসে উম্মাহর সাথে তামাশা করছে অপদার্থ আব্বাসীয় খলিফারা। দুনিয়ার বুকে জান্নাতকে নামিয়ে আনার প্রতিযোগিতা চলছে নিরন্তর। বিলাসিতা, আদিখ্যেতার অন্ত নেই তাদের। জাতিসত্তার কোন ফিকির তো নেই-ই, যা আছে তা শুধুই অন্তর্যাত। রাষ্ট্রীয় অপচয়ের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মিসাল খুঁজতে গেলে, প্রথম কাতারে এরাই বেরিয়ে আসবে। ইন্দ্রপূজা এদের কাছে ছিল কমন একটা ব্যাপার। হালাল-হারামের বাছ-বিচার তো দূরের বাতিঘর, এরা এমন সব আদিম পাপাচারকেও অবলীলায় আপডেট দিচ্ছে; যা লিখতেও ঘেন্না হয়! রুচি বিকৃত গিলমান প্রথাকে এরা তখন একটা শৈল্পিক রূপে দাঁড় করিয়েছে। দাড়ি-গোফহীন খাদেমদের সাথে সমকামিতায় এরা এতোটাই আসক্ত হয়ে পড়েছিল, নারীর প্রয়োজন এরা আদৌ বোধ করতো না। স্বয়ং লুত সম্প্রদায়ও এদের বেলেছাপনায় নস্যি হয়ে পড়েছিল। এদের এই অবাধ বিকৃতাচার, সর্বাপ্লাবী পাপাচার খাওয়ারিজমিরা সহ্য করতে পারতো না মোটেই। ফলে শক্তিশালী একটা সালতানাতের সাথে ভঙ্গুর খিলাফাহর দূরত্বের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন কার্যকারণে ক্রমেই তা রেষারেষির পর্যায়ে চলে যায়। কালক্রমে উদ্ভব ঘটে শত্রুতার! তখন মুসলিম জাহানের পূর্ব দিগন্ত শাসন করছিল প্রচণ্ড শক্তিদ্বর এই খাওয়ারিজম সালতানাত। যার পরিধি ছিল বর্তমান পাকিস্তানের অংশবিশেষসহ পুরো আফগানিস্তান, মধ্য ও পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে। এরা ছিল তখনকার দিনের বিশ্বশক্তি। যাদের অশ্বারোহী বাহিনীর সংখ্যাই ছিল পাঁচলাখ। সীমান্ত ছিল শত শত মাইলজুড়ে। দিগন্ত বিস্তৃত এদের সামরিক তাবু। বিখ্যাত সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ শাহ তখন ক্ষমতায়। আব্বাসীয়দের বন্নাহীন বিলাসিতা, ক্ষমাহীন পাপাচার ও বিকৃত যৌনাচারের দরুণ মুহাম্মাদ শাহ তাদের উপর এমনিতেই ছিলেন ত্যক্ত-বিরক্ত, ক্ষিপ্ত। ঠিক সে সময়ই একটা বিশেষ ঘটনা ধুমায়িত ক্ষোভের সে আগুনকে উস্কে দিল। বহুমানুষ। যার জন্য পুরোপুরিই দায়ী ছিল অবিবেচক আব্বাসীয়রা।

সে সময় ইসমাইলি শিয়া গুপ্তঘাতক হাসান বিন সাবাহর সাক্ষাৎ বংশধর জালালউদ্দিন হাসান তাওবা করে ইসলাম গ্রহণ করলে মুসলিম জাহানের প্রতিটি ব্যক্তিই খুশি হন। অকুণ্ঠ মোবারকবাদ জানান। কিন্তু তাকে একটু বেশিই ফেতার দিতে গিয়ে, সীমাছাড়া অভিনন্দিত করতে যেয়েই আব্বাসি খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহ পরাক্রমশালী খাওয়ারিজম শাহের সাথে প্রকাশ্য শত্রুতার সূত্রপাত করেন।

হজের সময় মুসলিম বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি খাওয়ারিজম সুলতান মুহাম্মাদ শাহর পতাকা জালালউদ্দিন হাসানের মায়ের পতাকার পেছনে রাখেন খলিফা মুসতাসিম। এতে চরম অপমানিত বোধ করেন শাহ মুহাম্মাদ। তিনি ক্রুদ্ধ হন প্রচণ্ড রকম। তার কথা হলো, নওমুসলিম জালালউদ্দিনকে সম্মান দেখাতে তার কোনো আপত্তি নেই। খলিফা জালালউদ্দিনের পতাকা আগে রাখলেই পারতেন। কিন্তু তা না করে তার মায়ের পতাকা আগে রাখবেন কেন? যে কি না একজন কটর শিয়া! তাই খলিফার ইচ্ছাকৃত এই ধৃষ্টতার জবাব দিতে শাহ মুহাম্মাদ বিশাল বাহিনী নিয়ে বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। উদ্দেশ্য, দুশত্রিও খলিফাকে উৎখাত করে তার পীর সায়্যিদ আলাউল মুলক তিরমিযিকে খলিফা করা। এই অগ্রাভিযানে দেখতে দেখতে গোটা উত্তর ইরাক তার দখলে চলে আসে। কিন্তু চূড়ান্ত আঘাত হানতে ১২১৪ সালে তিনি যখন বাগদাদের পথ ধরলেন, তখন শাহ মুহাম্মাদের সেনাবাহিনী তুমার ঝড়ের কবলে পড়ে। এতে বিধ্বস্ত হয়ে যায় তার পুরো বাহিনী। ফলে ব্যর্থ হয়েই ফিরতে হয় শাহ মুহাম্মাদকে।

মুসলিম বিশ্ব যখন আব্বাসীয়-খাওয়ারিজম দ্বন্ধে টালমাটাল, ঠিক সে সময় কারাকোরাম বসে মঙ্গোলিয়াসহ মহাচীনের অংশবিশেষ শাসন করছেন মানবেতিহাসের সর্বাধিক নিষ্ঠুর শাসক, নৃশংস সেনাপতি তেমুজিন। ইতিহাসে যিনি চেঙ্গিস খান নামে ব্যাপক পরিচিত। তখন ইসলামি দুনিয়ার বাইরে পূর্ব গোলার্ধে তার বর্বরতা ছিল প্রবাদতূল্য। অত্যন্ত নির্মমতার সাথে তিনি দেশের পর দেশ, রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে ক্রমাগত তার সাম্রাজ্যের পরিধি বাড়িয়েই চলছেন। মুসলিম দুনিয়া তখন পর্যন্ত মোঙ্গল ঝড়ের কবলে না পড়লেও সেই বিধ্বংসী তাণ্ডবের উত্তাপ ঠিকই টের পাচ্ছিলো। এতোদিন চেঙ্গিস খানও ইসলামি সীমান্ত সযত্নে এড়িয়ে চলতেন। তার মনে মুসলিম ভীতি ছিল সর্বদাই জীবন্ত। মুসলমানদের কিংবদন্তিতূল্য বীরত্ব, ইস্পাতদৃঢ় কাহিন্য, সোনালি ইতিহাস, বর্ণালি ঐতিহ্য তখন পর্যন্ত তার কাছে ছিল রূপকথার মতো। আর একারণেই খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের সাথে কৃত শান্তিচুক্তি তিনি সততই নিষ্ঠার সাথে মেনে চলতেন।

কিন্তু একটামাত্র উপলক্ষই মুসলিমদের প্রতি তার সকল সমীহভাব নাড়িয়ে দিল। কেটে গেলো ভয়। টুটে গেলো বিশ্বাস। সেই উপলক্ষের নাটেরগুরু আবার একজন মুসলিম। যেনতেন নয়; স্বয়ং মুসলিমদের অভিভাবক আব্বাসি খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহ।

১২১৪ সালে শাহ মুহাম্মাদ কর্তৃক ইরাক আক্রান্ত হলে অপদার্থ খলিফা মুসতাসিমের জেদ আরো বেড়ে যায়। তাই খাওয়ারিজমের সাথে ইতিহাসের

নিকৃষ্ট নীচতার আশ্রয় নিতে তার বিবেকে বাঁধেনি মোটেই। নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রাভঙ্গের মতো স্পর্শকাতর একটা বিষয়ে দ্বিতীয়বার ভাবেননি। নিজের অসৎ জিঘাংসা চরিতার্থে তিনি লাখ লাখ মুসলমানকে অবলীলায় গিনিপিগ বানান। শক্তিশালী একটা মুসলিম সালতানাতকে করেন বলিরপাঁঠা। খাল কেটে কুমির আনার মতোই তিনি হিংস্র চেঙ্গিস খানকে সহসাই খাওয়ারিজম আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান।

অথর্বরা আর কিছু না পারলেও কূটবুদ্ধিতে সবসময়ই এগিয়ে থাকে। যেহেতু বাগদাদ থেকে কারাকোরাম যেতে খাওয়ারিজমের উপর দিয়ে যাওয়া ছাড়া বিকল্প পথ নেই, তাই খলিফা পত্রবাহী দূতদেরকে সুবিশাল খাওয়ারিজমের উপর দিয়েই পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। উদ্ভাবন করলেন অভিনব এক পন্থা!

দূতের মাথা কামিয়ে তার ন্যাড়া মাথায় ছুরির তীক্ষ্ণ ডগা দিয়ে লিখে দিলেন: “আমাকে আপনার বন্ধু হিসেবেই জানবেন। আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আপনি খাওয়ারিজমের শাহ মুহাম্মাদকে ধ্বংস করুন।” লেখার পর সুরমা দিয়ে তা ভরে দেওয়া হলো এবং কিছুদিন অপেক্ষা করা হলো চুল গজানোর জন্য। অবশেষে সে দূত মুসলিম বিশ্বের প্রলয় পরোয়ানা মাথায় করে রওয়ানা হলো চেঙ্গিস খানের কারাকোরাম অভিমুখে। পথে শাহ মুহাম্মাদের প্রহরীরা তল্লাশি করে দূতদের কাছে কিছুই পেলো না। আব্বাসি দূতেরা কারাকোরাম পৌঁছলে দূত তার মাথা কামিয়ে ফেললো এবং চেঙ্গিস খানকে মাথার তালুতে লিখা অভিনব সেই চিঠি পড়ে শোনানো হলো। কিন্তু চেঙ্গিস খান খলিফার কথায় বিশ্বশক্তি খাওয়ারিজম শাহর সাথে তৎক্ষণাৎ সংঘর্ষের ঝুঁকি নিলেন না। খলিফাকে জানিয়ে দিলেন: “শাহ মুহাম্মাদের সাথে আমার সন্ধি আছে, আমি সেটা ভাঙতে পারি না।”

চেঙ্গিস খান আব্বাসি দূতকে ফিরিয়ে দিলেন ঠিকই; কিন্তু তার মনোজগতে চললো তোলপাড়। বলখ, বোখারা, সমরকন্দ, গজনি, নিশাপুর—তা আছেই খাওয়ারিজমের গণ্ডি পেরিয়ে তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো স্বপ্নের বাগদাদ, দূরের দামেশক, ঐতিহ্যের কায়রো! ইসলামি সীমান্ত মাড়ানোর কল্পনাও এতোদিন যিনি করেননি, সেই চেঙ্গিস খান একসঙ্গে অনেকটা নির্ভর হয়ে উঠলেন। ভাবলেন, খলিফার প্রশ্নে খাওয়ারিজম আক্রমণ করলে মুসলিম বিশ্বের প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই মিশ্র হবে। তখন খলিফা নীরব থাকলে অন্যান্য সালতানাত প্রতিকার চাইতে আসবে না—ফলে খাওয়ারিজমকে একাই সহিতে হবে মোঙ্গল তাণ্ডব! এসব ভেবে চেঙ্গিস খান একসময় খাওয়ারিজম আক্রমণে সাহসী হয়ে উঠলেন।

১২১৯ সাল। চেঙ্গিস খান দুলাখ সৈন্যের দুর্ধর্ষ এক তাতারি বাহিনী নিয়ে হঠাৎ করেই হামলে পড়লেন সুবিশাল খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের সীমান্তে। খাওয়ারিজমি সুলতান আলাউদ্দিন শাহ মুহাম্মাদের নির্বুদ্ধিতা ও কাপুরুষতার কারণে মোঙ্গলরা প্রায় বিনা বাঁধায় শহরের পর শহর ধ্বংস করে এগিয়ে চললো। সর্বশক্তি একত্র করে মোঙ্গল সয়লাবে বাঁধ দেবার ইচ্ছায় সীমান্ত খুলে দেয়া হলো। এটা করতে যেয়ে তাতারি গতির কাছে পরাস্ত হয়ে বিচ্ছিন্নভাবেই মার খেতে থাকলো খাওয়ারিজম বাহিনী। কোথাও তারা একত্রিত হতে পারেনি, তাই কার্যকর কোন প্রতিরোধও গড়ে ওঠেনি। আর এভাবেই বিশ্বখ্যাত গুরগঞ্জ, বলখ, বোখারা, সমরকন্দ, তিরমিয, হেরাতসহ একে একে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিক নগরীগুলো। সকল সেক্টরেই অপরিবর্তিত পিছু হটায় খাওয়ারিজমিদের টলে যাওয়া পা আর কখনোই জমতে পারেনি। ফল যা হবার তাই হলো। সমগ্র সালতানাত মোঙ্গল ভোগের অসহায় শিকার হলো। গণহত্যা, লুণ্ঠন চললো সর্বত্র। মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হলো বিশ্বসভ্যতার প্রাচীন নগরগুলোকে। অধিকাংশ সৈন্যসহ বিশাল খাওয়ারিজমের প্রায় পুরো জনসংখ্যাকেই নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হলো। নারীরা হলো গণহারে ভোগ্যপণ্য। যে দুচারজন পারলো মিশর-সিরিয়ায় পালিয়ে বাঁচলো। মোঙ্গল তাগুবকে অনেকেই তখন ইয়াজুজ-মাজুজের হামলা ভেবে ভুল করেছিল। বিধায় শাহ মুহাম্মাদও প্রতিরোধের সাহস হারিয়ে পালাতে লাগলেন। আশ্রয় নিলেন কাস্পিয়ান হ্রদের নির্জন এক দ্বীপে। অথচ শ্রোতের বিপরীতে পুরো খাওয়ারিজমে একজন অন্তত এমন ছিলেন, যার কাছে ভীতি বলে কিছু ছিল না। যিনি বারবার কার্যকর প্রতিরোধের উদ্যোগ নিয়েও বাঞ্ছিত অনুমতি পাননি। তিনি মুহাম্মাদ শাহর জ্যেষ্ঠপুত্র বীরকেশরী শাহজাদা জালালউদ্দিন।

একদিকে বারবার অনুমোদন চেয়েও প্রতিরোধের অনুমতি মিলছে না। অপরদিকে প্রায় বিনা বাঁধায় বিশাল সাম্রাজ্য গ্রাস করে নিচ্ছে বর্বর মোঙ্গলরা। খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য আয়তনে এতোই বিশাল বিস্তৃত ছিল যে, প্রায় বিনা যুদ্ধে তা দখল করতেই চেঙ্গিস খানের লেগে গেলো টানা তিন বছর।

১২২১ সাল। যখন খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য হারিয়ে খেগ মহাকালের গর্ভে, হয়ে গেলো অতীত ইতিহাস; তখন শাহ মুহাম্মাদ সিংহল পুত্রের গুরুত্ব বুঝতে পারলেন। তার কোমরে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের প্রতীক তুলে দিয়ে বললেন: “এখন একমাত্র জালালউদ্দিনই পারে আমরার রাজ্য উদ্ধার করতে। সে দুশমনকে ভয় তো করেই না; বরং তাদের বিরুদ্ধে সর্বদাই লড়াইয়ের সুযোগ খোঁজে।”

জালালউদ্দিন জবাব দিলেন: “খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের শাসনভার আমি তখন পাচ্ছি, যখন তা মোঙ্গলদের গ্রাসে চলে গেছে। আমি এমন এক বাহিনীর

সেনাপতি হতে চলছি, যা আজ কেবল নামেই সৈন্যবাহিনী। এরা ঝড়ের মুখে ঝরে পড়া বিক্ষিপ্ত পাতার মতোই। মুসলিম বিশ্বের উপর ঘনিষে আসা এই অন্ধকার রাতে আমি বরং পাহাড়ে-পর্বতেই যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে যাবো। আমি সাহসী লোকদের একস্থানে জড়ো করবো। আমৃত্যু মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে লড়েই যাবো।” জালালউদ্দিন কাম্পিয়ানের দীপে করা সেই প্রতিজ্ঞা পরবর্তীতে অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছিলেন। স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়েই টানা দশ বছর মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছেন। সত্যিই পাহাড়ে-পর্বতে তিনি বছরের পর বছর জিহাদের দীপশিখা জ্বালিয়ে যান। তাই বাংলা ভাষার অনন্য একটা পংক্তির স্বার্থক মিসদাকং হয়েই তিনি আজও অমর হয়ে আছেন ইসলামি ইতিহাসের পাতায় পাতায়-

“অসত্যের কাছে কভু নত নহে শির,

ভয়ে মরে কাপুরুষ লড়ে যায় বীর!”

এই জালালউদ্দিনই প্রথম ব্যক্তি যার হাতে তিন-তিনবার মোঙ্গলদের পরাজিত হতে হয়েছে! মোঙ্গলদেরকে হারানো অসম্ভব, এরা ইয়াজুজ-মাজুজ-এ ধরনের অনেক আগুবাধ্য ও ভুল ধারণার অসাড়া তিনই প্রথম প্রমাণ করেন! এমনকি স্বয়ং চেঙ্গিস খানকেও তিনি একবার পালাতে বাধ্য করেন। সিঙ্ঘু তীরের যুদ্ধে তিনি মাত্র ৭০০ সৈন্য নিয়ে ৬০ হাজার মোঙ্গল সৈন্যের উপর এমন প্রচণ্ড আক্রমণ চালান, এর তীব্রতায় দানব মোঙ্গলদের কাতার পর্যন্ত ভেঙে যায়! তিনি মোঙ্গল বৃহৎ ভেদ করে চেঙ্গিস খানের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে তার দিকে অগ্রসর হন। চেঙ্গিস খান মোকাবেলায় না এসে প্রাণভয়ে পালিয়ে যান। তখন চেঙ্গিস খান হুকুম দিয়েছিলেন: “কেউ যেন শাহর চুলও স্পর্শ না করে, তাকে বরং জীবিত ধরা চাই।” একসময় ৬০ হাজার মোঙ্গল সেনা মাত্র ৭০০ মুসলিম সৈন্যকে কোণঠাসা করে ফেললো। জালালউদ্দিন কাপালিক চেঙ্গিস খানের হাতে ধরা দিবেন কেন? ধরা পড়া অবশ্যম্ভাবী দেখে বর্ম-শিরস্ত্রাণ ছুঁড়ে ফেলে সিঙ্ঘু নদের তীরবর্তী ত্রিশ ফুট উঁচু পাহাড় থেকে ঘোড়াসহ তিনি অদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন! তিনি এতোই দক্ষ অশ্বারোহী ছিলেন যে, ঝাঁপ মার্ত্য থেকে সাঁতারে নদী পার হওয়া পর্যন্ত অশ্বপীঠেই অনড় থেকে যান। এবং সে অবস্থাতেই মোঙ্গলদের উপর তীর নিক্ষেপ করতে থাকেন। নদী পেরিয়ে ঝাঁপায় উঠার পর সেই দুর্ধর্ষ বীর যোদ্ধা এবার নিজ তরবারি হাতে তুলে নেন। উপরের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে অবিস্ম্য এ দৃশ্য দেখতে থাকা চেঙ্গিস খানকে তরবারি উঁচিয়ে ডাকতে থাকেন। অতঃপর হারিয়ে যান গভীর জঙ্গলে। দুঃসাহসী এ দৃশ্য দেখে চেঙ্গিস খান লজ্জা-অপমানে দুহাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেলেন এবং নিজ পুত্রদের বলতে থাকেন: “বাপের চাই এমন বেটা-ই।”

সেখান থেকে জালালউদ্দিন চলে গেলেন সোজা হিন্দুস্তানে। সুলতান ইলতুতমিশের কাছে গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় চাইলেন; কিন্তু চেঙ্গিস খানের ভয়ে ইলতুতমিশ “হিন্দুস্তানের আবহাওয়া আপনার স্বাস্থ্যের অনুকূল হবে না” বলে এড়িয়ে যান। অবশেষে ১২৩১ সালে তিনি জনৈক কুর্দি আততায়ীর হাতে শহিদ হন। তার মৃত্যুর মধ্যদিয়েই দুঃখজনক অবসান ঘটে ঐতিহ্যবাহী খাওয়ারিজম রাজবংশের।



চেঙ্গিস খান। একটি প্রলয়ঙ্করী তুফানের নাম। গোবির বুক চিড়ে লাফিয়ে ওঠা প্রচণ্ডগতির বিশ্ববিধ্বংসী এক মরু সাইমুম। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক। বর্তমান মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলানবাটরের দু’শ মাইল উত্তর-পূর্বে ওনোন নদীর তীরে বোরজিগিন বংশে জন্ম নেয় নিরীহ এক ছোট্ট শিশু-তেমুজিন। কালক্রমে সে-ই হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর বিশ্বত্রাস-চেঙ্গিস খান। মাত্র ন’বছর বয়সেই নিহত হন তার পিতা। পরিবার হয় বাস্তুচ্যুত, গোত্রছাড়া। অপহৃত হয় তার বাগদত্তা। পালিয়েই কাটে তার শৈশব, কৈশোরকাল। মানবেতিহাসের সর্বকালের সর্বাধিক নিষ্ঠুর এই যোদ্ধা তাই প্রাথমিক জীবনে ছিলেন নিতান্তই নিগৃহীত, বঞ্চিত। হয়তো এরই রুঢ় প্রভাব প্রতিবিম্ব হয় তার পরবর্তী জীবনে। চার কোটি বনি আদমের হত্যার দায়ে বিশ্ব ইতিহাসের আবহমান কাল ধরে তিনি যদিও খলনায়করূপে পরিচিত, তথাপি আধুনিক মঙ্গোলিয়ায় তিনি একজন সম্মানিত বিশিষ্টজন ও বরেন্য ব্যক্তি হিসেবেই চিরন্তন বিবেচিত। মোঙ্গল জাতির প্রতিভূ-জনক বলে সেখানে তিনি আজও সমান সমাদৃত। ১২০৬ সালে মোঙ্গল সাম্রাজ্যের মহামতি খাকান হিসেবে অধিষ্ঠিত হওয়ার আগে নিজের অসামান্য নেতৃত্বগুণে পূর্ব ও মধ্য এশিয়ার অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন ক্ষমতার জাতিগোষ্ঠীকে তিনি একই সূত্রে গ্রহিত করেন। একটিমাত্র সামাজিক পরিচয়ের অধীনে নিয়ে আসেন বহুবিভক্ত একটা মানবসম্প্রদায়কে। সুসংঘবদ্ধ এই জাতিসত্তাই পরবর্তী ইতিহাসে মোঙ্গল নামে অভিহিত হয়। যুদ্ধ রূপকার ছিলেন চেঙ্গিস খান খ্যাত সেই অবহেলিত তেমুজিন।

১২০৬ থেকে ১২২৭ সাল। মাত্র একুশ বছরে মরুচারী দুর্ধর্ষ এই বেদুইনদের নিয়েই তিনি গঠন করেন সর্বকালের সর্ববৃহৎ ও অবিভক্ত এক গ্রেটেস্ট স্টেট-মোঙ্গল সাম্রাজ্য। চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর সময় যার পরিধি ছিল উত্তর চীন,

পারস্য, মধ্য-পূর্ব এশিয়া ও ইউরেশিয়া অঞ্চলব্যাপী বিস্তৃত। আধুনিক তুরস্ক, রাশিয়া, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, পাকিস্তান, এমনকি অখণ্ড কোরিয়াও তখন ছিল মোঙ্গল শাসনাধীন!

চেঙ্গিস খান গঠিত মোঙ্গল এই জাতিসত্তা হচ্ছে, পৃথিবীর জ্ঞাত ইতিহাসেরই সবচে' বেশি বর্বর-অসভ্য একটা সম্প্রদায়। হয়তো প্রস্তর যুগেও এদের মতো নির্বোধ, অজ্ঞ আর নিষ্ঠুর কোনো প্রজাতি এ ভূমণ্ডলে ছিল না। এদের নির্মমতার সঠিক মাত্রার শব্দ যোগাতে অভিধান নিশ্চিতভাবেই অক্ষম। হিংস্র, রক্তপায়ী, নরখাদক, পিশাচ-এসব অভিধা আসলেই ক্লিশে। একমাত্র ইয়াজুজ-মাজুজের তাণ্ডবের সাথেই এদের তুলনা চলে। গতির হিংস্রতায় যেমন, তেমনি ধ্বংসের নিষ্ঠুরতায়। বিজিত জাতির সাথে ক্ষমা, দয়া, সহানুভূতি, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ছিল এদের কাছে অকল্পনীয়। সৃষ্টি তো নয়ই; ধ্বংসই ছিল এদের মূল লক্ষ্য। আলো ঝলমল বলখ, বোখারা, সমরকন্দ, বাগদাদ, দামেশক এদের নখরাঘাতে সত্যিকারের মৃত্যুপুরীতেই পরিণত হয়েছিল। তাই এসব নগরীর পুনর্গঠন প্রক্রিয়া সারতে মানবজাতির পরবর্তী পাঁচশ বছর পর্যন্ত লেগেছিল। এদের রোষ যেসব নগরীর উপর সর্বাধিক পড়েছিল, পরবর্তী কয়েক যুগ সেগুলো নিরেট জঙ্গল হিসেবেই পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়ে গিয়েছিল। কারণ এরা যে ভূখণ্ডে হামলে পড়তো সেখানকার মানুষ তো বটেই; কোনো প্রাণীকেই জীবন্ত ছাড়তো না।

বিজয়ী জাতি সাধারণত বিজিতদের সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, কৃষ্টি, সভ্যতার ভালো দিকগুলো গ্রহণ করে নিজেদের জীবনযাত্রা, সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে থাকে; কিন্তু এরা ছিল ভিন্ন ধাঁচের! এরা সভ্যতা বিনির্মাণ নয়, গুড়িয়ে দিয়েই পরমানন্দ লাভ করতো। তাই লাখ লাখ গ্রন্থের সমৃদ্ধ লাইব্রেরি যেমন এরা নির্দিধায় জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিতো, তেমনি নির্বিচারে গুড়িয়ে দিতো তিলোত্তমা অট্টালিকা, সুরম্য প্রাসাদসমূহও। এরা জানতো না, আদর্শহীন গা জোয়ারি শক্তির স্থায়িত্ব হয় কচুপাতার পানির মতোই ঠুনকো। এজন্যেই তো মধ্যযুগের দৌর্দণ্ড মোঙ্গল সাম্রাজ্য এখন শুধুই অস্তিত্বহীন ইতিহাস মাত্র। একসময় প্রায় পুরো বিশ্বকে শাসন করা সেই মঙ্গোলিয়া বিশ্বদরবারে আজ নিঃশব্দ, রিক্ত, অনাথ হয়েই টিকে আছে।

এই মোঙ্গলরা ছিল নিরক্ষর, মূর্থ। বিধায় সভ্যতা সংস্কৃতি এদের কাছে ছিল খেলো একটা বিষয়। এরা ছিল মরুচারী যাক্ষসেরা। তাই নগর কাঠামো ছিল এদের কাছে অসহ্য। আর ধর্মীয়ভাবেও এরা ছিল ভিন্ন-ভিন্ন ঘরানার অধিকাংশই-শামানবাদি, সূর্য পূজারি। স্বয়ং চেঙ্গিস খানও ছিলেন কল্পিত এ ধর্মের অনুসারী। তবে উল্লেখযোগ্য একটা অংশ বুদ্ধিস্টও ছিল। কসাই হালাকু খান শেষ সময়ে এসে এই বৌদ্ধ ধর্মই গ্রহণ করে। তেমনি একটা অংশ আবার

খ্রিস্টানও ছিল। আইন জালুতের প্রধান সেনাপতি কিতবুঘা, এমনকি হালাকু খান পত্নী ডোকুজ খাতুনও ছিলেন নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টান। তাছাড়া মুসলমানও ছিল কিছুসংখ্যক। তাই সাধারণ মোঙ্গলরা শিয়াল, সাপ, ব্যাঙ, কুকুর, শুকরসহ সবধরনের হিংস্র জানোয়ার গণহারে ভক্ষণ করলেও মুসলিম মোঙ্গলরা এগুলো সতর্কভাবেই এড়িয়ে চলতো। ঘৃণা করতো। কথিত আছে, মোঙ্গলরা প্রয়োজনের সময় নিজেরই ঘোড়ার পীঠে ছুরি বসিয়ে ঘোড়ার তাজা রক্ত খেয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করতো। কিন্তু মুসলিম মোঙ্গলরা এসব নোংরামির ধারেও ভিড়তো না। ফলে মুসলিম মোঙ্গলরা ছিল অন্যদের চক্ষুশূল। মুসলিম রীতিনীতির এমন ব্যতিক্রমী কালচারের কারণে পুরো মুসলিম জাতিসত্তার উপরই সাধারণ মোঙ্গলরা ছিল ক্ষ্যাপা। আর এ কারণেই সম্ভবত মোঙ্গল ঝড়ে সবচে' বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মুসলিম জাহান। লওভও হয়েছে ইসলামি সভ্যতা।

চেঙ্গিস খানের অনেকগুলো সন্তান থাকলেও মৃত্যুর সময় তার চার পুত্র- যোচি, ওগদাই, চাগতাই, তুলুই; কেবল এদের মধ্যেই তিনি নিজ সাম্রাজ্য বণ্টন করে যান। একমাত্র বড় ছেলে যোচি বাদে বাকি সবাই ছিল চরম ইসলাম বিদ্বেষী। কনিষ্ঠ তুলুই ও তার সন্তানরা তো এ ব্যাপারে ছিল এককাঠি সরস। বাগদাদের কসাই হালাকু খান ছিল এই তুলুই-এর ছেলে। নৃশংসতায় বলা যায় চেঙ্গিস খানের যোগ্য নাতি, স্বার্থক উত্তরসূরী। কিন্তু মুসলিম না হলেও যোচি ছিলেন অনেকটাই মুসলিমবান্ধব। একটু বেশি সহানুভূতি ও সহনশীল। অথচ সাহস, বীরত্ব ও নানাবিধ যোগ্যতায় চেঙ্গিস সন্তানদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বসেরা। তারই বড় ছেলে মহাবীর বাতু খান, যিনি ছিলেন খ্রিস্টান ইউরোপের জীবন্ত ত্রাস। সেই বাতু খানের বাল্যশিক্ষক ছিলেন একজন মুসলিম-হাজি আবদুর রহিম বাগদাদি! এরচেয়েও বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, যোচির কনিষ্ঠ ছেলে বার্কৈ খান; তিনি তো ছিলেন আগাগোড়াই এক ধার্মিক মুসলমান। হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংসের ঠিক দশ বছর আগে ১২৪৮ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। বলখের একদল মুসলিম ব্যবসায়ীর প্রণোদনায় তিনি অত্যন্ত চর্চা এই সিদ্ধান্ত নেন। এসব কারণে যোচি পরিবার সবসময়ই ছিল মুসলমানদের প্রতি সদয়। যা স্বয়ং চেঙ্গিস খান থেকে নিয়ে পরবর্তীতে তার অন্য সন্তানরাও ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। আর একারণেই মোঙ্গল আততায়ীর হাতে যোচিকে শেষ পর্যন্ত নিহতও হতে হয়! যার রেখে যোচির সন্তানদের মধ্যে চেঙ্গিস খানের অন্য সন্তান-পৌত্রদের দীর্ঘ বিরোধ-সংঘাত লেগেই রয়েছে।

চেঙ্গিস খানের বণ্টন অনুযায়ী যোচি খান পেলেন আজারবাইজানসহ ইউরেশিয়ার কিছু অঞ্চল। তুলুই পেলেন মোঙ্গল সাম্রাজ্যের কারাকোরাম কেন্দ্রিক মূল ভূখণ্ড। অপর দুই পুত্রের ভাগে পড়লো সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ। তবে মূল কমান্ড থাকলো



কারাকোরামের তুলুই'র হাতে। পরবর্তীতে তুলুই পুত্র হালাকু খান গড়ে তুলেন পারস্যকেন্দ্রিক আরো একটি মোঙ্গল রাজ্য-ইলখানাত।

যোচি খান তার প্রাপ্ত ভূখণ্ড নিয়েই গড়ে তুললেন নিজস্ব খানাত বা রাজ্য। চেঙ্গিস খান পরবর্তী সময়ের দুনিয়া কাঁপানো পাঁচটি মোঙ্গল রাজ্যের মধ্যে এটি ছিল অন্যতম একটি। চেঙ্গিস পুত্রদের মধ্যে সবচে' যোগ্য ও দুর্ধর্ষ ছিলেন এই যোচি খান। বাবার এই পরাক্রম আবার একটু বেশি মাত্রায়ই পেয়েছিলেন যোচিপুত্র বাতু খান। যিনি কৈশোরে পা দিয়েই সেনাবাহিনীর সামনে বলেছিলেন: “হে বীরপুরুষের দল! তোমাদের তরবারিতে জং ধরে গেছে। আমি তোমাদের নিয়ে যাবো মহানদী ইতিলের (ভল্গা) ওপাড়ে। আমি ইউরোপের কাপুরুষ জাতিগুলোর (খ্রিস্টান) উপর তাণ্ডব চালাবো।”

যেমন বলা তেমন কাজ। যোচি খানের জীবদ্দশাতেই সত্যি সত্যি একদিন ভল্গা নদী অতিক্রম করে ইউরোপের উপর হামলে পড়েন যুবরাজ বাতু খান। তার অপ্রতিরোধ্য বাহিনী চোখের পলকে অধিকার করে নেয় বর্তমান হাঙ্গেরিসহ ডালমাসিয়া উপকূল পর্যন্ত ইউরোপের বৃহৎ এক অঞ্চল। ইউরোপীয় রাজাদের কোমর ভেঙ্গে দেবার সাথে সাথে অজস্র সোনা-রূপাসহ অপরিমিত ধন-সম্পদও আহরণ করেন তিনি। তাই সোনা দিয়েই তিনি তার তাবুকে মুড়িয়ে রাখতেন। এই সোনালি তাবু থেকেই সিরওর্দা শব্দের উৎপত্তি। ‘সিরওর্দা’ মোঙ্গল শব্দ। যার অর্থই হলো সোনালি তাবু। যোচি খানের মৃত্যুর পর বাতু খান সিংহাসনে আরোহণ করেই তার রাজধানী এশিয়া থেকে ইউরোপের রাশিয়ায় স্থানান্তর করেন। নতুন রাজধানী হয় সারাই। আর তখন থেকেই বাতু খান শাসিত রাজ্যের নতুন নাম হয় সিরওর্দা খানাত-সোনালি তাবু। এই সিরওর্দাই Golden Horde নামে ইতিহাসে ব্যাপক পরিচিত।

বাতু খানের মৃত্যুর পর তারই পুত্র সারতাক খান সিরওর্দার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সারতাক খানের পর উলাঘচি খান। অতঃপর মোঙ্গল রাজ্যে সিরওর্দার মসনদে আসে অবিশ্বাস্য এক পরিবর্তন। চোখ কপালে তোলা বিশ্বয়কর চমক। পুরো মোঙ্গল সাম্রাজ্যের প্রতিটি অংশে তুমুল আলোড়ন তুলে ১২৫৭ সালে সিরওর্দার মসনদে বসেন একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম। যোচিপুত্র মহাবীর বার্কৈ খান। এই সেই বার্কৈ খান, যিনি মুসলিম রক্তপানী চেঙ্গিস খানের পৌত্র হওয়া সত্ত্বেও ১২৪৮ সালেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মুসলিম বার্কৈ খানের অভাবনীয় এই রাজ্যাভিষেকে মোঙ্গল সাম্রাজ্যের অন্য খানরা স্বাভাবিকভাবেই খুশি হতে পারেননি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাকে মেনে নিতে না পারলেও কার্যকর কিছু করার সাহস কিন্তু তাদের ছিল না। কারণ বার্কৈ খান তার নামের মতোই ছিলেন প্রচণ্ড ‘শক্তিশালী’ এক লৌহমানব শাসক। বীরবল সেনাপতি।

বার্কে খানের ক্ষমতারোহণ যতোটা বিস্ময়ের; ততোধিক ভয়ানক ছিল তার প্রথম রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ! ক্ষমতায় বসেই তিনি পরোক্ষে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বসেন কারাকোরামের কেন্দ্রীয় কমান্ডকে। কাফের, বিধায় কারাকোরামের খাকানের আনুগত্য অস্বীকার করে প্রকারান্তরে তিনি স্বাধীনতারই দুঃসাহসী ঘোষণা দিয়ে বসেন! এমনকি গতানুগতিক মোঙ্গল খান না হয়ে, তিনি নিজেই একজন মুসলিম শাহানশাহ বলেই ঘোষণা দেন। এতে পিলে চমকে ওঠে অন্য সকল মোঙ্গল খানদের। স্বয়ং কারাকোরামের খাকান মঙ্গু খান তেতে ওঠেন বার্কের খানের প্রতি। কিন্তু করার ছিল না কিছুই। সবাইকেই সবকিছু নীরবে হজম করতে হয়। কারণ মোঙ্গল সাম্রাজ্যের একমাত্র খানাত হচ্ছে সিরওর্দা, যারা কোনোদিনই কোনো যুদ্ধে হারেনি। স্বয়ং খাকান খান ও অন্য খানরা একাধিকবার পরাজিত হলেও যোচিপুত্ররা ছিলেন এক্ষেত্রে শতভাগ সফল। তাছাড়া সিরওর্দার সীমানা, প্রভাব তখন ছিল ইউরেশিয়ার সংকীর্ণ গণ্ডি পেরিয়ে ইউরোপের বিশাল অংশজুড়ে বিস্তৃত। ফলে আপাতত বাধ্য হয়েই সিরওর্দার প্রতিপত্তি, বার্কের খানের চপেটাঘাত স্বয়ং মঙ্গু খানকেও মুখ বুজে সহ্য করতে হয়।

বার্কের খান সিংহাসনে বসেই সিরওর্দার রাজধানী আধুনিক রাশিয়ার স্টালিনখাদের অদূরে স্থানান্তর করেন। নাম দেন সারাই বার্কের। বার্কের খান এমনতেই ছিলেন জাত্যাভিমানী এক দুরন্ত সেনানায়ক। এবার সিংহাসনে আরোহণের মাধ্যমে সিরওর্দার দাপট, ক্ষমতা ও শক্তির শীর্ষবিন্দুতে তিনি আরোহণ করেন। তার বড় ভাই মহাবীর বাতু খান ইউরোপের একেবারে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত যেভাবে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন এবং একের পর এক খ্রিস্টান রাজ্য পদানত করে নিয়েছেন। তার পেছনে এই বার্কের অবদানও কম ছিল না। বাতু খানের সময়েই বার্কের খান সাইবেরিয়ার বিস্তৃত ভূখণ্ড রিয়াজান, সুজদাল, হাঙ্গেরি ও আধুনিক রাশিয়ার বহু রাজ্য অধিকার করেন। এমনকি বাতু খানের পর সারতাক খান ও উলাঘচি খানের হাত থেকে যেসব ইউরোপীয় রাজ্য ছুটে গিয়েছিলো, শাহানশাহ হয়েই বার্কের খান তার সবকিছু আবার উদ্ধার করেন। গালিসিয়া, পোল্যান্ড, লিথুনিয়া ও হাঙ্গেরি মের সিরওর্দা সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

শুধু তাই নয়, বার্কের অপ্রতিরোধ্য বাহিনী একসময় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বুলগেরিয়া ও থ্রেস পর্যন্ত দখল করে নেয়। আরো মজার বিষয় হলো, মোঙ্গল খানদের গ্রাস থেকে খাওয়ারিজমসহ মা-অরাউন নাহারের অর্ধেকটাও চলে আসে বার্কের নিয়ন্ত্রণে। সেইসাথে সাইবেরিয়ার আকওর্দার খানদের অধিকার থেকে

আধুনিক কাজাখস্তানও তিনি কেড়ে নেন। তখন খাকান খান, মঙ্গু খান ও কুবলাই খান এসব দেখেও না দেখার ভান করলেন।

তবে সবচে' অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, বার্কের প্রবল প্রতাপে গ্রিক অর্থডক্স খ্রিস্টানদের ধর্মগুরু স্বয়ং বাইজান্টাইন সিজার পর্যন্ত তখন আনুগত্য স্বীকার করে নিয়মিত কর প্রদানে বাধ্য হন। কারণ মুসলিম বার্কের এই গোলামি স্বীকার না করে কোনো উপায়ই যে ছিল না বাইজান্টাইন সিজারের। না হলে বার্কের প্রবল আক্রমণে খোদ বাইজান্টাইন রাজধানী কনস্টান্টিনোপলও মুসলিম মোঙ্গলদের পদানত হতো।

১২৫৬ সাল। মোঙ্গল গ্রাসে খাওয়ারিজম সালতানাত বলতে বিশ্বমানচিত্রে অবশিষ্ট আর কিছু নেই। হয়ে গেছে অতীত ইতিহাস। মহাচীন থেকে ইউরেশিয়ার সুবিস্তৃত অঞ্চল তখন মোঙ্গল সাম্রাজ্য্যধীন। ততোদিনে মোঙ্গলরা হয়ে ওঠেছে অপ্রতিহত বিশ্বশক্তি। তখনকার দিনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুপার পাওয়ার। কারাকোরামের মসনদে বসে চার-চারটি (পঞ্চম রাজ্য ইলখানাত তখনও প্রতিষ্ঠা পায়নি) বিশাল মোঙ্গল রাজ্যের মাধ্যমে প্রায় পুরো বিশ্ব শাসন করছেন তুলুইপুত্র খাকান খান মঙ্গু খান। মোঙ্গলদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে, আক্ষরিক অর্থেই সে সময় এমন কোনো শক্তি ছিল না। অপর বিশ্বশক্তি মুসলিম মিল্লাত তখন ক্ষয়িষ্ণু। মোঙ্গল জুজুতে বিপর্যস্ত, কম্পমান। খ্রিস্টানরা রীতিমত নতজানু, মোঙ্গল দাসানুদাস।

কিন্তু তখনো একটা গোষ্ঠী ছিল সুপ্ত অথচ সক্রিয় বিশ্বগ্রাস। ক্ষণে ক্ষণে সর্বত্রই এরা আতঙ্ক ছড়াতো। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এদের অসহায় শিকারে পরিণত হতো। এরা ছিল পেশাদার গুপ্তঘাতক। হাসান বিন সাবাহর হাতেগড়া ফেদাইন গোষ্ঠী। ইতিহাসে যারা এসাসিন নামেই ব্যাপক পরিচিত। তিল-তিল করে এতোদিনে গুপ্তহত্যাকে এরা একটা শিল্পের রূপ দিয়ে ফেলেছে। দু-একটা ব্যতিক্রম বাদ দিলে এই অশুভ চক্রের সফলতা বলা যায় শতভাগই ধর্মীয়ভাবে এরা ছিল ইসমাইলি উগ্র শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। অর্থের বিনিময়ে এদেরকে যে কেউ ব্যবহার করতে পারতো। তাই সকলেই ছিল এদের তীরের অব্যর্থ নিশানায়। এদের মূল আখড়া ছিল পারস্যের আলমুত দুর্গে। আলমুত অর্থ ঈগলের বাসা। নামের মতোই বড় দুর্ভেদ্য ছিল সে দুর্গ। সমুদ্রতট থেকে যার উচ্চতা ছিল ২ হাজার ১৬৩ মিটার। ৪৯ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এ দুর্গের আশপাশে ফেদাইনরা আরো চল্লিশটি সুজবুত দুর্গ গড়ে তুলেছিল। ফলে এতোদিন এই আলমুত দুর্গ অজেয় হয়েই ছিল। ফেদাইনরাও হয়ে পড়েছিল বেসামাল। গোদের উপর বিষফোঁড়া ভেবে খাকান খান মঙ্গু খান এবার এদেরকে সমূলে উৎপাটন করতে চাইলেন। স্বীয় ছোট ভাই হালাকু খানের নেতৃত্বে দুলাখ

অশ্বারোহী সৈন্যের বিশাল এক বাহিনী আলমুত অভিমুখে পাঠালেন। মোঙ্গল ইতিহাসের হাজারো অনিষ্টের ধারাবাহিকতায় সম্ভবত এই একটা সুকীর্তিই ছিল উল্লেখ করার মতো!

হালাকু খান বিশাল বাহিনী নিয়ে আলমুত পানে এগিয়ে চলছেন। রওয়ানা হয়েই কুচক্রি শিয়া গুণ্ডঘাতকদের উচ্ছেদে তিনি সমকালীন প্রায় সকল বিশ্বশক্তির সহযোগিতা চাইলেন। এমনকি বাগদাদের আব্বাসি খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহর কাছেও দূত মারফত চিঠি পাঠালেন; কিন্তু নির্বোধ বৃদ্ধ খলিফা হালাকু খানের সেই চিঠির অপমানজনক জবাব দিলেন। অথচ হালাকু খানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পারস্যের আতাবাক সা'দ এবং সালজুক রুমের দুই সুলতান আইজউদ্দিন ও রুকনুদ্দিন পর্যন্ত মোঙ্গল বাহিনীর সাথে যোগদান করলেন। গবেট খলিফা ভেবেছিলেন, শক্তিশালী সালজুক তুর্কিরা বারবার চেষ্টা করেও যে আলমুত পদানত করতে পারেনি, হালাকু খান তা পারবে কেন? কী আশ্চর্য! এই অপদার্থ খলিফাই মাত্র কয়েক বছর আগে স্বজাতীয় সুবিশাল মুসলিম খাওয়ারিজম সালতানাত ধ্বংসে মোঙ্গলদের সর্বোতভাবে সাহায্য করেছিলেন! অথচ আলমুতের শিয়া শয়তানদের রক্ষায় তিনি আজ কেমন নির্লজ্জ বেপরোয়া ভাব প্রদর্শন করলেন!

খলিফার অনীহায় হালাকু খান কিন্তু ফিরে গেলেন না। একসময় ঠিকই সরোবে আছড়ে পড়লেন আলমুতের দুর্জয় দুর্গে। দুর্ব্বল মোঙ্গলদের প্রচণ্ড আক্রমণের কার্যকর কোনো জবাব জানা ছিল না ফেদাইন গোষ্ঠীর। তাদের ঘরের মতোই ভেঙ্গে পড়লো তাদের সব প্রতিরোধ। দেখতে দেখতে আলমুতসহ অন্য চল্লিশটি ফেদাইন দুর্গও মোঙ্গলদের পদানত হলো। অবশেষে সবগুলো দুর্গের সকল অধিবাসীকেই পাইকারি গণহত্যায় নিক্ষেপ করা হয়। এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে উৎপাত করে আসা ফেদাইনদের ধর্মদ্রোহী রাজ্যের পতন ঘটে। অবসান হয় হাশাশিন আতঙ্কের। ফেদাইনরা তাদের গুরুকে শাইখুল জাবাল হিসেবে অভিহিত করতো। তাদের শেষ শাইখুল জাবাল ছিলেন রুকনুদ্দিন খুরশাহ। মোঙ্গল থাবায় সবার সাথে তিনিও অঘোরে নিহত হন। কিন্তু চাটুকারিতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে একজনমাত্র ব্যক্তি সেদিন বেঁচে যায়। যিনি বিশ্ব ইতিহাসে একজন বিজ্ঞ মুসলিম জ্যোতির্বিদ হিসেবেই খ্যাত। অথচ তিনি ছিলেন কটর ইসমাইলি শিয়া ফিদায়ি। যিনি ছিলেন শাইখুল জাবাল খুরশাহর উজির। সেই তিনিই পরবর্তীতে ভোল পাল্টে ফেললেন হালাকু খানের তোষামুদি করে-করে তার নৈকট্যও হাসিল করেন। নির্লজ্জ চাটুকারিতার মাধ্যমে একপর্যায়ে তিনি হালাকু খানের পরামর্শক হিসেবেও নিয়োজিত হন। অবশেষে তারই তৈলাক্ত প্ররোচনায় হালাকু খান বাগদাদ ধ্বংসে ব্রতী হন। নাম তার নাসিরুদ্দিন তুসি!



বাগদাদ। মধ্যযুগের তিলোত্তমা নগরী। বর্ণময় আশ্চর্য এক ঐশ্বর্যপুরী। কর্মময় ব্যস্ত মহানগরী। আলো বলমল অনন্য এক স্বপ্নপুরী। এর অসামান্য রূপ-লাবণ্য, অনিন্দ্য সুন্দর অঙ্গসজ্জা, দৃষ্টিনন্দন গঠন প্রকৃতি; একে সত্যিই করে তুলেছিল জগতের অপার বিস্ময়! সারি সারি অট্টালিকা, কাড়ি কাড়ি ধন-রত্ন এর গায়ে চড়িয়েছিল আলাদা মাহাত্ম্যের চাদর। অবিশ্বাস্য নাগরিক সৌকর্য, অসাধারণ প্রশাসনিক সৌন্দর্য একে দিয়েছিল ব্যতিক্রমী মর্যাদা। তাই ইউরোপের ঘোর অন্ধকার যুগেও বাগদাদ ছিল দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্তিক মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এক ডাকে বিখ্যাত ছিল নগরকন্যা নামে। পারিপার্শ্বিক সবদিক বিবেচনায় আজকের প্যারিস, ভেনিস, লন্ডন, বার্লিন, মেলবোর্ন, নিউ ইয়র্ক সে তুলনায় কিছুই না। তৎকালীন ইউরোপের সবগুলো রাজধানীর টোটাল বাসিন্দার প্রায় সমপরিমাণ ছিল এক বাগদাদেরই মোট জনসংখ্যা—বিশ লাখ! এমনকি অধুনা ইউরোপের দু-চারটি সিটি বাদে প্রায় সকল শহরই আজও এরচে' কম জনবহুল।

৭৬২ সালে আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মানসুর রূপকথার এই নগরীর নির্মাণকাজ শুরু করেন। গোড়াপত্তনের পর থেকেই বিস্ময়কর এ শহর বিভিন্ন নামে পরিচিত হতে থাকে। বৃত্তাকার বিধায় এর এক নাম মুদাওয়ারা, মানে গোলাকার। স্থপতি খলিফা এর নাম দিয়েছিলেন দারুস সালাম বা শান্তিনিবাস। কিন্তু সব ছাপিয়ে অপরূপ এ শহর বাগদাদ নামেই বিশ্ব দরবারে ব্যাপক পরিচিত হয়ে উঠে। যার অর্থ ন্যায়বিচারের উদ্যান। শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত খলিফার রাজপ্রাসাদ কাসরুল খুলদ (অনন্তধাম) দর্শকদের মনে অপার বিস্ময়েরই জন্ম দিতো। সেই প্রাসাদের বিশাল সবুজ গুম্বুজ কুরবানুল খাজরা, যার নির্মাণশৈলী দেখে মানুষ মাত্রই হোঁচট খেতো। চিত্তাশক্তি হারাতে!

সেই অতুলনীয় বাগদাদ একদিকে যেমন ছিল প্রমোদ, সৌন্দর্য, পর্যটন ও বাণিজ্য নগরী; অপরদিকে তেমনি ছিল জ্ঞান-বিস্তার, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও মননশীলতা চর্চার তীর্থভূমিও। একে ইসলামি সভ্যতার উর্বর লালনভূমি, এমনকি আঁতুড়ঘর বললেও অত্যুক্তি হবে না। তৎকালীন বাগদাদে শুধু যে তুঙ্গস্পর্শী প্রাসাদই ছিল এমন নয়; ছিল শত শত স্কুল, কলেজ। হাজারে হাজারে মাদরাসা, মক্তব। অজস্র বিশ্ববিদ্যালয়। অসংখ্য মোডিকেল কলেজ হাসপাতাল। অগণন সায়েন্স ল্যাবরেটরি। বেগুমার গ্রন্থাগার, লাইব্রেরি। বাগদাদবাসীর কমতি ছিল না কোনো কিছুতেই। সহায়-সম্পদ, অর্থ-বিস্তার আর প্রাচুর্যে তারা ছিল টাইটুমুর।

তাই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও সেখানে ছিল উপচেপড়ার মতোই। এতো প্রাপ্তির মাঝেও একটা জিনিসের কিন্তু তাদের বড় বেশি অভাব ছিল—উম্মাহপ্রীতি, আল্লাহপ্রীতি! মুসলিম জাতিসত্তা জাহান্নামে যাক, এতে তাদের কোন বিকারই ছিল না। সেখানকার গানের আসর, মদের বার সততই থাকতো হাউসফুল; অথচ ধর্মীয় মাহফিল, বাইতুল্লাহ মসজিদ ছিল খা-খা বিরাণ। নিঃসার শিয়া-সুন্নি বিতর্ক, চটকদার শাফিয়ি-হানাফি বাহাস ছিল নৈমিত্তিক উপজীব্য। এ নিয়ে সর্বত্রই দাঙ্গা-ফ্যাসাদ ছিল হররোজ উপভোগ্য। ঠিক তখনই সম্মিলিত ঔদাসিন্যের, সর্বাপ্লাবী আলস্যের শান্তি হিসেবে আদের তুফান হয়ে এদের উপর আপতিত হয়েছিল হালাকু খানের মোঙ্গল ঝড়!

১২৫৮ সাল। বাগদাদের মসনদে সমাসীন বয়োবৃদ্ধ খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহ। টানা ৫০৭ বছরের আব্বাসি খিলাফাহর প্রথম পর্বের তিনিই সর্বশেষ খলিফা। এই সেই অর্থব মুসতাসিম বিল্লাহ যিনি ইতিপূর্বে খাওয়ারিজমের মুসলিম সালতানাত ধ্বংসে নরখাদক চেঙ্গিস খানকে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। চার দশকের মাথায় এবার এলো খোদ তারই পালা। খলিফার পাপের প্রায়শ্চিত্য করলো পুরো বাগদাদবাসী। খাল কেটে কুমির ডেকে আনা কতোটা নিকৃষ্ট নিরুদ্ভিতা, বিশ্বস্ত বাগদাদই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তখন বাগদাদের উজিরে আজম ছিলেন ইবনে আলকামি। যিনি ছিলেন আপাদমস্তক একজন শিয়া দুষ্টিকারী। মানসিকতায় নিকৃষ্ট খবিস প্রকৃতির। তথাপি তার প্রতি ছিল খলিফার অগাধ আস্থা, বিশ্বাস। খলিফা তার সব পরামর্শ চোখ বুজে মেনে নিতেন। নির্বোধ খলিফা রাষ্ট্রীয় সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই তার উপর ছিলেন পুরোমাত্রায় নির্ভরশীল। তাই তার হাতেই সবকিছু সমর্পণ করে খলিফা হয়ে পড়েছিলেন কার্যত নির্বিকার। নির্ভর হয়ে মত্ত ছিলেন আকর্ষণ পাপাচার-বিলাসিতায়। বিভোর ছিলেন সাড়ম্বর ব্যভিচার, সমকামিতায়। এরই সুযোগ নিলেন ইবনে আলকামি। শান্ত বাগদাদকে সহসাই কয়েক তুললেন অশান্ত। শিয়া-সুন্নি দাঙ্গার তুফান বইয়ে দিলেন বাগদাদের অলি-গলিতে। উশ্জ্বল শিয়াদের পরিকল্পিত সন্ত্রাসের দায় সুকৌশলে চাপিয়ে চললেন সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নিদের ঘাড়ে। সুন্নিরা হতে থাকলো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিগৃহীত। রাষ্ট্রীয় দমনাভিযানে নিরন্তর নিষ্পেষিত। এসবই হয়ে চললো শিয়া উজির ইবনে আলকামির নিবিড় তত্ত্বাবধানে। খলিফা এসব ব্যাপারে ছিলেন সম্পূর্ণ বেখবর, উদাসীন। কিন্তু খলিফাপুত্ররা ছিলেন সচেতন, জাগরুক। তারা ইবনে আলকামির এসব ভণ্ডামি রুখে দাঁড়ালেন। খলিফার দরবারে তারা ইবনে আলকামির মুখোশ খুলে দিলেন। সহিংসতায় ইবনে আলকামির সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হওয়ায় খলিফা তার উপর চটলেন বেজায়। তিরস্কার করলেন খুব করে।

খলিফার ভর্তসনায় ইবনে আলকামি প্রকাশ্যে কিছু না বললেও ভেতরে ভেতরে ফুঁসে উঠলেন। চরম প্রতিশোধ নেবার সংকল্পে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়লেন। ইবনে আলকামি শুধু দুই প্রকৃতিরই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন ধুরন্ধর উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিও। তিনি শ্রেফ উজির হয়েই সম্ভ্রষ্ট থাকতে চাইলেন না, বাগদাদের ভাবি শাসক হিসেবেও দিবানিশি নিজেকে কল্পনা করতেন। মনের কোণে দীর্ঘদিনের লালন করা সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবার বহুগুণ উষ্ণে উঠলো। মজ্জাগত সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে এবং অসহনীয় অপমানের কঠিন প্রতিশোধ নিতে এবার তিনি চরম আত্মঘাতী এক সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন! হালাকু খানের কাছে বাগদাদ আক্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়ে দূত পাঠালেন। এমনকি তাকে বাগদাদের ভবিষ্যৎ শাসক করার শর্তে বাগদাদ অভিযানে হালাকু খানকে সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিলেন!

সুন্নি খিলাফাহর শিয়া উজির ইবনে আলকামির তরফ থেকে বাগদাদ ধ্বংসের আমন্ত্রণ এলো হালাকু খানের টেবিলে। সেখানেও ঘাপটি মেরে ছিলেন আরেক শিয়া। হালাকু খানের পরামর্শক নাসিরুদ্দিন তুসি। তিনি প্রাণান্ত করে বাগদাদ আক্রমণে হালাকু খানকে প্ররোচিত করতে লাগলেন। কিন্তু হালাকু খান ছিলেন এ ব্যাপারে নিরাবেগ, নিস্পৃহ। তার মনের কোণে যদিও স্বপ্নের নগরী বাগদাদ দখলের সুপ্ত বাসনা ছিল; কিন্তু মুসলিম ভীতি ছিল এর চেয়েও প্রচণ্ড। তাছাড়া বাগদাদ ছিল ঐতিহ্যবাহী ইসলামি সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। মুসলিম দুনিয়ার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। আবার বিশাল বিস্তৃত ইসলামি সাম্রাজ্যের রাজধানীও। তখনকার বাস্তবতায় এর দিকে হাত বাড়ানো চাট্টিখানি কথা নয়। তাই রূপকথার অনবদ্য এ নগরী আক্রমণ করতে তার মন সায় দিল না। তিনি প্রবল প্রতিক্রিয়া ও তুমুল প্রতিরোধের আশঙ্কায় ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু নাসিরুদ্দিন তুসি ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। ইনি-বিনি-অবশেষে তিনি হালাকু খানকে রাজি করিয়ে ফেললেন। তবে হালাকু খান শর্ত দিলেন, যে কোনো অজুহাতে ইবনে আলকামিকে অবশ্যই বাগদাদ সেনাবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা সঙ্কুচিত করে ফেলতে হবে।

ভীত হালাকু খানের এ শর্ত বাস্তবায়নে ইবনে আলকামি এবার উঠেপড়ে লাগলেন। নির্বোধ খলিফাকে তিনি বুঝালেন, বাগদাদ মুসলিম বিশ্বের রাজধানী তাই এ শহরে কোন শত্রুবাহিনী আক্রমণ দূরে থাক; সে চিন্তাও কখনো করে না। অতএব এতো এতো সৈন্য পোষে কী লাভ? খামোখাই রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় হচ্ছে! সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করে ফেললে শিগগিরই কোষাগার স্ফীত হয়ে উঠবে। ইবনে আলকামির দেখানো ষ্ঠেত মুলোয় অপদার্থ খলিফার লোভাতুর চোখ দুটি চকচক করে উঠলো। আগ-পিছ না ভেবেই তিনি তৎক্ষণাৎ সেনা

ছাঁটাইয়ের হুকুম দিয়ে দিলেন। ইবনে আলকামি সুযোগ পেয়েই বেছে বেছে প্রতিভাবান সেনাদের দ্রুততার সাথে ছাঁটাই করতে লাগলেন। যুবরাজদের প্রবল আপত্তির মুখেও এ গণছাঁটাই অভিযান চললো। অল্পদিনেই বাগদাদ সেনাবাহিনী রূপান্তরিত হয়ে গেল নখ-দন্তহীন একটা নিষ্কর্মা সেনা ইউনিটে। অবশেষে হালাকু খানের কাক্ষিত ক্ষেত্র তৈরি হয়ে গেলে ১২৫৮ সালের ২৯ জানুয়ারি দুলাখ মোঙ্গল সেনা নিয়ে তিনি বাগদাদ অবরোধ করে বসেন।

মোঙ্গল, চায়না, আর্মেনীয় খ্রিস্টান ও এন্টিয়কের ক্রুসেডারদের নিয়ে গড়া দুলাখ সৈন্যের সুবিশাল বাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ বাগদাদ। ৯০ ফুট উঁচু অনতিক্রম্য শহর রক্ষা পাঁচিলের ভেতরে হাসফাঁস করছে বিশ লাখ নগরবাসী। ছাঁটাইয়ের পর নিয়মিত বাহিনীর পঞ্চাশ হাজার সৈন্য এখনো বিদ্যমান। কিন্তু আব্বাসি খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহ তার সৈন্যদের শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে মোঙ্গলদের রুখে দাঁড়ালেন না। স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে কার্যকর প্রতিরোধের কোনো উদ্যোগও নিলেন না। অবশ্য মানসিক সে শক্তি, সাহস, উদ্যম, যোগ্যতা; কোনটিই তার ছিল না। হালাকু খান বিনা বাঁধায় জায়গায় জায়গায় নাফতুন (বিশালকায় পাথর নিক্ষেপক যন্ত্র) বসিয়ে অবরোধ শুরু করলেন এবং দুর্ভেদ্য পাঁচিলগাত্রে ক্রমাগত ভারী পাথর বর্ষণ করে যেতে লাগলেন। অথর্ব খলিফা তখনও মোঙ্গলদের অবরোধ ভাঙার বা বিধ্বংসী নাফতুনগুলো ধ্বংস করতে তার অশ্বারোহী বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন না! বরং এটাই ঐতিহাসিক সত্য, বাগদাদের সুদৃঢ় প্রাচীরের উপর যখন দফায় দফায় অগ্নিগোলক নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল খলিফা তখনও ছিলেন ব্যভিচারে লিপ্ত!

অবশ্য খলিফা নেতৃত্ব না দিলেও জাত্যাভিমानी যুবরাজদের প্রচেষ্টায় বাগদাদ বাহিনী একাধিকবার শহর ছেড়ে বেরিয়ে এসে প্রচণ্ড আক্রমণ ঠিকই শানিয়েছে; কিন্তু মোঙ্গল সয়লাবের সামনে আনকোরা এ বাহিনী কখনোই জমে দাঁড়াতে পারেনি। বারবার ব্যর্থ হওয়ায় সেনাবাহিনীসহ নেতৃত্বহীন নগরবাসীর মনোবল অনেকটাই ভেঙে পড়ে।

এদিকে মোঙ্গল অগ্নিগোলকের প্রচণ্ডতায় একসময় খলিফার ঘুম ভাঙলো। তিনি জাগলেন; তবে চিতা হয়ে নয়, শিয়াল হয়ে! গা ছমছম করা মোঙ্গল নাকারায় তিনি ভীত হয়ে পড়লেন। তখন গাদ্দার ইবনে আলকামি রঙ চড়িয়ে খাওয়ারিজম ধ্বংসের গল্প শুনিye শুনিye তাকে আরো বিপর্যস্ত করে তুললো। “একমাত্র আত্মসমর্পণ করলেই প্রাণে বাঁচা সম্ভব, আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের মোঙ্গলরা কোন দয়াই করে না।”

অহর্নিশ এসব কানমন্ত্র দিয়ে খলিফাকে দেশ-জাতির রক্ষার বাস্তবিক কোনো উদ্যোগ নিতেও দেয়নি সেই হারামি ইবনে আলকামি। একদিন ইবনে



আলকামির কথায় সম্মত হয়ে খলিফা হালাকু খানের মত জানতে চাইলেন। হালাকু খান খলিফার সমস্ত ধন-রত্ন সমর্পণ করে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে বললেন। অবশেষে তাই হলো। খলিফার সমস্ত ধন-সম্পদ হালাকু খানের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

১০ ফেব্রুয়ারি মাত্র ২১ দিন অবরোধের পর দুর্বলচেতা খলিফা আত্মসমর্পণ করলেন! মোঙ্গলদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হলো বাগদাদের। হালাকু খানের আদেশে বৃদ্ধ আরামপ্রিয় খলিফাকে গালিচায় মুড়িয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়! পতন ঘটে টানা ৫০৭ বছর ধরে চলা জাঁকজমকপূর্ণ আব্বাসীয় খিলাফাহর। ইতিহাস টেনে দেয় তার ঘটনাবহুল একটি অধ্যায়ের সমাপ্তিরেখা। দুনিয়াবাসীর জন্য রেখে যায় অনেকগুলো উপদেশসম্ভার! শিক্ষণীয় অজস্র বাণী চিরন্তনীর ভাণ্ডার।

১০ ফেব্রুয়ারি ১২৫৮ সাল। উন্মুক্ত সদর দরজা দিয়ে রক্তপিপাসু মোঙ্গল বাহিনী এবার শ্রোতের মতো ঢুকে পড়ে রূপকথার স্বপ্নপুরীতে। পৈশাচিক উন্মত্ততায় হামলে পড়ে নগরবাসীর উপর। ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষুধিত পশুর মতো। টানা তিনদিন ধরে চলে পাশবিক বর্বরতা। নির্বিচারে নিষ্ঠুর গণহত্যা। নারী, শিশু, বৃদ্ধ, পঙ্গু, প্রতিবন্ধী, এমনকি হাসপাতালের রোগী কেউই রেহাই পায়নি পাইকারি এ নিধনযজ্ঞ থেকে। রাস্তায় রাস্তায় লাশের স্তূপ জমে উঠে। রাজপথে রক্তের শ্রোত বয়ে যায়। সেদিন বাগদাদের অলি-গলিতে এ পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল যে, সে রক্তের ধারা ড্রেন হয়ে অবিরাম দাজলায় পড়ার কারণে বিশালবক্ষা দাজলার পানির শ্রোত মাইলের পর মাইল বাস্তুবেই রক্তবর্ণ ধারণ করেছিল। লাখ লাখ অবোধ নারী-শিশুর মরণ চিৎকারে সেদিন বাগদাদের বাতাস সত্যিই হয়ে পড়েছিল ভারী, স্তব্ধ। পুরুষ-শিশুরা মোঙ্গল সাক্ষাতেই হতো অসহায়ভাবে নিহত। নারীরা পেতো সামান্য একটু সময়; কিন্তু এ অবকাশ মুক্তির নয়, এদের জন্য বরং নিয়ে আসতো দ্বিগুণ অভিশাপ! মোঙ্গল পাশবিকতায় কৈরীমার্য লুণ্ঠিত হবার পর তারাও হতো ওপারের যাত্রী। বাগদাদের নারীরা ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত সুন্দরী, তাই মোঙ্গলরা কোনো নারীকেই বিনা ধর্ষণে হত্যা করেনি। শুধু মানুষ কেন? সুবিশাল বাগদাদের সকল নাগরিক স্থাপনা-মসজিদ, মাদরাসা, মাজার, উদ্যান, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, লাইব্রেরি, অট্টালিকা, প্রাসাদ, এমনকি নির্বাক পশুরাও এদের ধ্বংসের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। বিশালকায় ইমারতগুলো নির্বিচারে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়া হয়! ৫১৬ বছর ধরে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য শিল্পীদের হাড়ভাঙা পরিশ্রমে গড়ে উঠা আলিশান নগর, সমৃদ্ধ এই বাগদাদকে নিমিষেই মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়! মাত্রই তিনদিনের একটা ঝড়ে বিশ্বমানচিত্র থেকে বাগদাদ সম্পূর্ণ উধাও হয়ে যায়। হয়ে উঠে পৌরাণিক

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। আক্ষরিক অর্থেই বাগদাদ হয়ে পড়ে স্থাপনাত্মক জন-মানবহীন ভয়াবহ এক মৃত্যুপুরী! বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন বলেন, মোঙ্গল তাম্বকে লোকেরা তখন খোদ কিয়ামত ভেবে ভুল করে বসেছিল। মোঙ্গলদের সবচে' বেশি আক্রোশ ছিল ইসলামি শিক্ষা-সভ্যতার প্রতি। তাই বাগদাদে ঢুকেই এরা চড়াও হয় শতশত বছর ধরে গড়ে তোলা বিশাল বিশাল গ্রন্থাগারগুলোর উপর। বাছ-বিচার ছাড়াই সবধরনের গ্রন্থে এরা আগুন লাগিয়ে দেয়। বিক্ষিপ্ত নিক্ষেপ করতে থাকে জ্ঞানের এসব ভাণ্ডারকে। কথিত আছে, নিক্ষিপ্ত বইয়ের স্তূপ ও ছাই-ভস্মে দাজলার রক্তশ্রোতে সেদিন জায়গায় জায়গায় বাঁধ পর্যন্ত পড়ে গিয়েছিল!

বাগদাদের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির বিশাল ভবনের সামনে এসে স্বয়ং হালাকু খান জিজ্ঞাসা করলেন এটা কী? এখানে এতো বই কেন? তখন তার দুই শিয়া চাটুকার নাসিরুদ্দিন তুসি ও ইবনে আলকামি বললেন এটা বিশ্বের সর্ববৃহত্তম গ্রন্থাগার। নিরক্ষর হালাকু খান এটা জানামাত্রই গ্রন্থাগারে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার আদেশ দেন। কিন্তু তার দুই মোসাহেবই তাকে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত রাখার চেষ্টা করেন। হালাকু খান তখন সখেদে বললেন: “মুসলিমরা কি এতো এতো বই পড়েও শিক্ষা নেয়নি; কী করে নিজেদের রাজ্য রক্ষা করতে হয়? যে বই তাদের নিজেদেরই রক্ষা করতে শেখায়নি, সে বই দিয়ে কী হবে?” অবশেষে সেটিকেও জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়া হয়।

ইতিহাস ধিকৃত সর্বকালের নৃশংসতম এ গণহত্যায় ষোল লাখ মুসলিম নিহত হয়! বাকি চারলাখের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ ছিল খ্রিস্টান। যারা মোঙ্গল বর্বরতা থেকে সেদিন রক্ষা পেয়ে যায় একজনমাত্র নারীর তদবিরে! তিনি হালাকুখান পত্নী ডোকুজ খাতুন। যিনি ছিলেন নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টান। কিছুসংখ্যক মুসলমানও সেদিন শ্রেফ ভাগ্যগুণে বেঁচে যায়। তারা গিয়ে আশ্রয় নেয়, পার্শ্ববর্তী শাম-মিশরে। এদের মধ্যেই বেশ পাল্টিয়ে মিশে গিয়েছিলেন দুজন যুবরাজসহ শাহি পরিবারের বেশ ক'জন সদস্য।

১২৫৮ সাল। হালাকু খানের হাতে পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয় বাগদাদ। অবসান ঘটে আব্বাসীয় খিলাফাহর। অভ্যুদয় হয় আরো একটি নয়া মোঙ্গল রাজ্যের। উন্মেষ ঘটে পারস্যভিত্তিক নতুন খানাতের। প্রতিষ্ঠিত হয় ইলখানা-ছোট সাম্রাজ্য। নামে ছোট হলেও আয়তনে কিন্তু সেটি ছিল বিশাল বিস্তৃত। মূলত কারাকোরামের খাকান খান মঙ্গু খানের সাম্রাজ্যের তুলনায় ছোট এবং তার অধীনস্থ হওয়ায় হালাকু খান ইলখান উপাধি ধারণ করেন। যার অর্থ ছোটখান। ফলে তার অধিকৃত সাম্রাজ্যের নামও হয় ইলখানা।

বাগদাদ পতনের অনিবার্য ফলস্বরূপ পারস্য, সাওয়াদ, এশিয়া মাইনর (আনাতোলিয়া) ও পূর্ব আরবব্যাপী সুবিশাল অঞ্চল নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় এই ইলখানাত। অবশ্য এশিয়া মাইনরের কর্তৃত্ব এর অনেক আগেই মোঙ্গলদের হাতে চলে আসে। ১২৪৩ সালে কাযাদাগের ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সালজুক রুমিদের পরাক্রমে অনেকটাই ভাটা পড়ে। সে সময়ই তাদের হাত থেকে খসে যায় এশিয়া মাইনর। তারা মাথানত করতে বাধ্য হয় মোঙ্গল প্রতিপত্তির সামনে। শুধু সালজুকরা কেন, পুরো মুসলিম জাহানই তো তখন ছিল প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ মোঙ্গল শাসনাধীন! শানদার আব্বাসীয় খিলাফাহ, বিস্তীর্ণ খাওয়ারিজম সালতানাত, শক্তিশালী সাকারতেলোস, দুর্ভেদ্য আলমুত রাজ্য, সবই দিব্যি হজম হয়ে গেছে মোঙ্গল রাষ্ট্রসঙ্ঘের পেটের গভীরে। এমনকি হিন্দুস্তানের নবগঠিত মুসলিম সালতানাতও তখন মোঙ্গল তাণ্ডবে যথারীতি হাপিত্যেশ করছিল। ইলতুতমিশের তৈলাক্ত মোঙ্গলনীতিও তাই কোনোই কাজে আসেনি। সমৃদ্ধ পাঞ্জাব-সিন্ধু যথারীতি চলে গেলো মোঙ্গল ভোগে। বাকি রইলো শুধুই মিশর-সিরিয়াভিত্তিক মামলুক সালতানাত। এতোদিন এরা মোঙ্গল বীভৎসতার বাইরেই ছিল। ইলখানাতের একমাত্র অক্ষত মুসলিম প্রতিবেশী এই মামলুক সালতানাতই এবারে হালাকু খানের চক্ষুশূল হয়ে উঠলো। উত্তর আফ্রিকার প্রবেশদ্বার হিসেবে মিশর-সিরিয়ার দখলটাও এবার তিনি বুঝে নিতে চাইলেন।

হালাকু খানের স্ত্রী ডোকুজ খাতুন ছিলেন একজন নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টান। এই ডোকুজ খাতুনের মাধ্যমেই হালাকু খানের সাথে ইউরোপীয় ক্রুসেডার ও আর্মেনীয় খ্রিস্টানদের দাসত্বের মৈত্রী গড়ে ওঠে। সভ্যতার লীলাভূমি বাগদাদ ধ্বংসে অসভ্য মোঙ্গলদের সাথে এসব খ্রিস্টানরাও তাই সমান ভাগিদার ছিল। এমনকি বাগদাদের কসাই খ্যাত মোঙ্গল সেনানায়ক স্বয়ং কিতবুঘা, যিনি হালাকু খানের দক্ষিণহস্ত ছিলেন-তিনিও একজন খ্রিস্টান।

ক্রুসেডযুদ্ধে খ্রিস্টানরা সর্বত্র মার খেয়ে এবার নির্লজ্জ নোংরামিতে মত্ত হয়। নিজেদের শক্তিতে মিশর-সিরিয়ায় কুলিয়ে উঠতে না পেরে তারা এবার মোঙ্গলদের শরণাপন্ন হয়। জেরুসালেম ফের কজা করতে তারা বিশ্বমানবতার দূশমন এই জংলীগোষ্ঠীরই ধারস্থ হয়। এমনকি মুসলিম উচ্ছেদে এই খ্রিস্টানরা মোঙ্গলদের সব কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে তাদের ঘণ্য অনুগামীতেও পরিণত হয়। তাছাড়া হালাকু খানের মন্ত্রণাদাতা নাসিরুদ্দিন তুসি ছিলেন একজন কট্টর শিয়া। যার প্রণোদনাতেই বাগদাদ হয়েছিল বিরোধভূমি। এরা সকলেই সুবিশাল মোঙ্গল সাম্রাজ্যের একমাত্র অটুট মুসলিম প্রতিবেশী মামলুক সালতানাতের উপর ক্ষিপ্ত ছিল প্রচণ্ড রকম। তাই এবারে এরা সবাই মিলেই হালাকু খানকে অহর্নিশ প্ররোচিত করতে থাকে মুসলিমদের এই শেষ আশ্রয়স্থল ধ্বংস করে দিতে।



১২৫৯ সাল। বাগদাদ ধ্বংসের পরের বছর। সবার উত্থানিতে অবশেষে হালাকু খান উৎসাহী হয়ে উঠলেন মামলুক রাজধানী কায়রো অভিযানে। ঠিক সে সময় খাকান খান মঙ্গু খান মৃত্যুবরণ করেন। হালাকু খানের মনে যেহেতু পুরো মোঙ্গল সাম্রাজ্যের খাকান খান হবার সুপ্ত বাসনা ছিল, তাই ভাই মঙ্গু খানের কুরিলতাই (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া) এ যোগ দিতে হালাকু খান তৎক্ষণাৎ মোঙ্গল সাম্রাজ্যের রাজধানী কারাকোরাম যাত্রা করেন। অবশ্য তার সে আশা পূর্ণ হয়নি। অপর ভাই কুবলাই খান সে পদ গ্রহণ করেন। কারাকোরাম যাবার আগে ইলখানাতের কর্তৃত্ব কিতবুঘার উপর ছেড়ে যান এবং তাকে মামলুক সালতানাত অধিকার করার কড়া নির্দেশ দিয়ে যান। দায়িত্ব পেয়েই কসাই কিতবুঘা স্বরূপে আবির্ভূত হন। দূত মারফত চরমপত্র পাঠান কায়রোর রাজ দরবারে। সাথে চারজন পদস্থ মোঙ্গল কর্মকর্তা। পত্র পেয়েই শঙ্কিত হয়ে পড়েন সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ। বিহ্বল হয়ে পড়ে দরবারি আমিররা। সমগ্র মুসলিম জাহান হয়ে ওঠে ভীত-সন্ত্রস্ত। চারদিকে শোর ওঠে—মোঙ্গলরা আসছে! মোঙ্গল! এবার মিশরের আর নিস্তার নেই!

মোঙ্গল জুজুতে হালব, হিমস, দামেশকসহ শামের শহরগুলোতে রীতিমত হলস্থূল পড়ে যায়। ধ্বংসপ্রাপ্ত বাগদাদ ও অধুনাবিলুপ্ত আব্বাসি খিলাফাহর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ পালিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে শাম ও মিশরে। মুসলমানরা মোঙ্গল তাণ্ডবকে ইয়াজুজ-মাজুজের নির্মমতা ভেবে ভুল করে ঘোরের মধ্যেই পড়ে রয়েছে। তাই কেউ এদেরকে প্রতিরোধের চিন্তাও করছে না। এমনকি অনেক স্থানে ওয়াজ-মাহফিল করা হচ্ছে ইয়াজুজ-মাজুজের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া-কলাপ নিয়ে! অনেকে কুরআন খতম করছে। কথিত ইয়াজুজ-মাজুজের কবল থেকে রেহাই পেতে বিভিন্ন আমল চলছে মুসলিমদের মধ্যে। কারণ সবার বিশ্বাস, সত্যিই ইয়াজুজ-মাজুজ আত্মপ্রকাশ করে গেছে! আর মোঙ্গলরাই হচ্ছে কুরআন প্রতিশ্রুত সেই ইয়াজুজ-মাজুজ। খ্রিস্টানদের বাইবেল, ইয়াহুদিদের ওল্ড টেস্টামেন্টে যারা Gog-Magog নামে উল্লেখিত। মোঙ্গলদের অবিশ্বাস্য গতি ও অকল্পনীয় হিংস্রতার কারণেই উল্লিখিত তিন ধর্মের অনেকেই তাদেরকে ইয়াজুজ-মাজুজ ভেবে ভুল করতে বাধ্য হয়েছে। তারা এত দ্রুত পথ চলে যে, নিজের চোখে না দেখলে কেউ সেটা বিশ্বাসই করবে না। তাদের দূরপাল্লার ধনুক ছিল তখনকার দিনের বিশ্বত্রাস। তৎকালীন বিশ্বসেরা তীরন্দাজ

ও হিংস্র যোদ্ধাজাত কেবল এরাই ছিল। এরাই এবার ধৈর্যে আসছে সিরিয়া-মিশর অভিযুগে। তাই মানুষ এদের সামনে পড়ার আগেই ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে। এদের ভয়ে খোদ মিশরের সুলতান পর্যন্ত ভীত!

শুধু একজনমাত্র লোক তখনো এমন ছিলেন, যার মনে মোঙ্গলভীতি তো নয়ই; এদেরকে তিনি ইয়াজুজ-মাজুজ ভাবতেও নারাজ। মোঙ্গলদেরকে প্রতিরোধ সম্ভব—এ আওয়াজ মিশর-সিরিয়ায় তিনিই প্রথম উচ্চকিত করেন। যার গমগমে কণ্ঠস্বরে রয়েছে কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট আভাস। গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা। নীল দুচোখের একটির আলো কম। তিনি এতোটাই দুর্ধর্ষ যে, একসাথে দুই তরবারি চালাতে পারেন। গুর্জ চালানোয় এমনই সিদ্ধহস্ত যে, কারো মাথায় একবার আঘাত করলে শিরস্ত্রাণ থাকলেও সে মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। অশ্ব চালনায়ে তিনি এতোই দক্ষ, একসাথে দুই ঘোড়ার পীঠে দু'পা রেখেও তিনি দিব্যি দু'ঘোড়া দৌড়াতে পারেন। এমনকি সে অবস্থাতেই অব্যর্থ নিশানায় তীরও ছুঁড়তে পারেন! তিনি তার সৈনিকদেরও সে শিক্ষাই দিয়েছেন। তিনি আর কেউ নন, হালবের শাসনকর্তা দুর্ধর্ষ বাহরি মামলুকদের নয়নমণি—সেনাপতি বাইবার্স। যিনি রাজচক্রের মারপ্যাঁচে পড়ে কয়েক বছর আগেই অধিকাংশ মামলুক সেনাসহ মিশর ছেড়ে শামে চলে গিয়েছিলেন।

কিতবুঘার চরম অবমাননাকর বিখ্যাত সেই চিঠির ভাষা ছিল এই— “পূর্ব ও পশ্চিমের রাজাদের রাজা মহান শাসকের পক্ষ থেকে দাস কুতুজের প্রতি, যে আমাদের তরবারি থেকে এখনো বেঁচে আছে। তুমি চিন্তা করে দেখ, অন্য দেশগুলোতে কী হয়েছে? আমরা কী করেছি? তুমি নিশ্চয়ই শুনেছো, আমরা কীভাবে বিশাল বিস্তৃত একটা সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছি এবং সমস্ত রোগের দূষণ থেকে বিশ্বকে পরিশুদ্ধ করেছি। তুমি আমাদের সেনাবাহিনীর ভয়ে পালাতে পারবে না। আর কোথায়-ই বা পালাবে? আমাদের হাত থেকে বাঁচতে তুমি কোন পথ ব্যবহার করবে? আমাদের ঘোড়াগুলো দ্রুতগতিসম্পন্ন, আমাদের তীর সুতীক্ষ্ণ, আমাদের তরবারি বজ্রপাতের মতো, আমাদের অস্ত্র-পোহাড়ের চেয়েও কঠিন, আমাদের সৈনিক বালুকণার মতো অসংখ্য। না কোনো দুর্গ আমাদের রুখতে পারে, আর না কোনো সেনাবাহিনী। সুসমুদ্র প্রতি তোমার নামাজ আমাদের বিরুদ্ধে কোনো কাজে আসবে না। কাউকেই ন্যূনতম ছাড়ও দেয়া হবে না। শুধু তারা বাদে, যারা আমাদের কাছে ক্ষমা ও সাহায্য শিক্ষা চায়। যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠার আগেই আমাদের উত্তর দাও। নতুবা তোমার উপর জরিমানাস্বরূপ বড় বিপর্যয় নেমে আসবে। আমরা তোমাদের মসজিদ ও আল্লাহর প্রতি দুর্বলতাকে ধ্বংস করে দেবো। আমাদের সেনারা তোমাদের শিশু-বৃদ্ধদেরও মেরে ফেলবে। বর্তমানে তুমিই আমাদের একমাত্র শত্রু, যার বিরুদ্ধে

আমাদের তরবারি আজও উখিত হয়নি। তার বিরুদ্ধেই আমরা এবার অগ্রসর হচ্ছি।”

পত্রপাঠে সুলতান কুতুজ মারাত্মক অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি ভালোমতোই বুঝলেন, এই দুঃসময়ে একমাত্র বাইবার্সই পারে এদের বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে রুখে দাঁড়াতে। কারণ এই বাইবার্স তরুণ বয়সেই বাইতুল মাকদিস দ্বিতীয়বার উদ্ধার করেছেন। এই বাইবার্সই মানসুরাহর ভয়াবহ যুদ্ধে জয় ছিনিয়ে এনেছেন এবং ক্রুসেডের দীর্ঘ ইতিহাসে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি কোনো ইউরোপীয় ক্রুসেডার সশ্রুটকে বন্দি করেন। সুলতান কুতুজ তাই বাইবার্সেই শেষ ভরসা খুঁজে পেলেন। সেমতে ডেকেও পাঠান বাইবার্সকে। কিন্তু বাইবার্স কি কুতুজের আহ্বানে সাড়া দিবেন? বাইবার্স যে কুতুজকে প্রচণ্ড ঘৃণা করেন! কুতুজের কাছ থেকে সুলতানা শাজারাতুদ দূর এর হত্যার প্রতিশোধ নিতে মামলুকরাও তো সংকল্পবদ্ধ হয়ে রয়েছে!

কিতবুঘার চরমপত্রে সুলতান কুতুজ রাগে অগ্নিশর্মা হলেও এর জবাবে কার্যকর কিছুই করলেন না। অবশ্য সে মুরোদ তার ছিলও না। মোঙ্গল প্রতিনিধিদেরকে তাই জবাবের অপেক্ষায় বসিয়ে রেখে সুলতান তার সভাসদদের সাথে ক্ষণে ক্ষণে কেবল নিঃসার বৈঠকে মিলিত হতে লাগলেন। এ চরমপত্রের জবাব কী হতে পারে, কেমন হবে? তা নিয়েই চললো রুদ্ধদ্বার বৈঠক; কিন্তু কোনো সমাধানই আসলো না। আসলে এর মোক্ষম জবাব তাদের জানাও ছিল না। অবশেষে সুলতান কুতুজ অনন্যোপায় হয়ে বাইবার্সের কাছে দূত পাঠানোর মনস্থ করলেন। অথচ তিনি ঠিকই জানতেন বাইবার্স তাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করেন। তবু নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে তিনি এ সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হন। কুতুজ বাইবার্সকে প্রস্তাব দিয়ে পাঠান, বাইবার্স যদি তার মামলুক বাহিনী নিয়ে সুলতান কুতুজের সাথে মোঙ্গল বিরোধী যুদ্ধে যোগ দেন, আর সম্মিলিত মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হয় তাহলে বাইবার্সকে দামেশকের গভর্নর করা হবে। কুতুজের প্রস্তাবে বাইবার্স সহজেই রাজি হয়ে যান। কারণ তিনি মোঙ্গলদের মুখোমুখি হতে মুখিয়ে ছিলেন। তিনি শুধু বললেন: “কুতুজ আবার বৈষম্য করলে তাকে প্রাণ দিয়েই এর খেসারত দিতে হবে।” অবশেষে বাইবার্স তার দুর্ধর্ষ মামলুক রেজিমেণ্টসহ কায়রো এসে পৌঁছলেন।

সবার মতামতের ভিত্তিতে মোঙ্গল দূতদের জবাব প্রদানের ভার এবার বাইবার্সের উপর বর্তালো। কিন্তু দায়িত্ব পেয়েই বাইবার্স এমন এক চরম সিদ্ধান্ত নিলেন, যা কেউ কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেনি। এমন এক দুঃসাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন, যা মানুষের কল্পনা শক্তিকেও হার মানায়।

আসলে বাইবার্স চাচ্ছিলেন যুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলতে। কারণ মোঙ্গলদের সাথে তার অনেক হিসেব চুকানোর বাকি ছিল। তিনি মোঙ্গলদের উপর ছিলেন আজন্মই ক্ষাপা। চারিদিকে চলমান মোঙ্গল বিভৎসতার মধ্যদিয়েই তার জন্ম, বেড়ে ওঠা। সর্বশেষ বাগদাদ ট্রাজেডি এখনো তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। খিলাফাহর এমন ভুলঠনও তার মনোজগত কখনো মেনে নেয়নি। তাই মোঙ্গলদের অসভ্য পত্রের লিখিত কোনো জবাব না দিয়ে তাদের মতো করেই অভিনব একটা জবাব দিলেন। স্বয়ং দূতসহ পত্র নিয়ে আসা সকল মোঙ্গল কর্মকর্তাকেই তিনি হত্যার হুকুম জারি করলেন। সাথে সাথে দূতসহ চারজন পদস্থ মোঙ্গল কর্মকর্তাকেই হত্যা করা হয়! বাইবার্স বজ্রের এখানেই শেষ নয়; এমনকি সেই চারটি মৃতদেহ রাজধানী কায়রোর চারটি প্রবেশপথে লটকেও দেয়া হয়! আর মোঙ্গল দূতের কর্তিত মাথা কায়রোর বিখ্যাত প্রবেশদ্বার বাব আল জুয়েইলার উপর ঝুলিয়ে রাখা হয়। সারাবিশ্ব জানলো মোঙ্গল ইলখানাতের ইটের জবাব মামলুক মিশর পাথর দিয়েই দিয়েছে। মোঙ্গলদের অপমানজনক চিঠির জবাবে মামলুকরাও ভয়ঙ্কর পাল্টা চ্যালেঞ্জ হুঁড়ে দিয়েছে। এ ঘটনার ফলে মোঙ্গল রোষের ভয়ে এবার জনমনে ছড়িয়ে পড়লো আতঙ্ক। কায়রোর সর্বত্র বিরাজ করলো ভীতিকর ত্রাস। কিন্তু দুর্ধর্ষ মামলুকরা হয়ে উঠলো উল্লসিত। তাদের সামনে দূরন্ত মোঙ্গলরা যে আসছে! এবারে লড়াই হবে সেয়ানে সেয়ানে!

মামলুক সালতানাত কর্তৃক মোঙ্গল দূত হত্যার দুঃসাহসিক সংবাদ শোনামাত্রই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন ইলখানাতের ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা কিতবুঘা নোয়ন। চরম প্রতিশোধ নিতে বিশাল বাহিনীসহ তৎক্ষণাৎ তিনি রাজধানী মারাগা ত্যাগ করেন। উদ্দেশ্য, মিশর-সিরিয়াভিত্তিক মামলুক সালতানাত ধ্বংস করা। হালাকু খানের কেন্দ্রীয় বাহিনীর দুলাখ সৈন্যের অধিকাংশই তখন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল ইলখানাতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে। তাই গুরুত্বপূর্ণ মিশর অভিযানে কেন্দ্রীয় বাহিনী থেকে কিতবুঘা নিতে পারলেন মাত্র ১০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য। সেই সাথে চললো তার নিজস্ব কমান্ডের ১০ হাজার অশ্বারোহী সেনা। অপর খ্যাতিমান মোঙ্গল সেনাপতি বায়দারের নেতৃত্বাধীন আরো ১০ হাজার অশ্বারোহী মিলে মোট মোঙ্গল সেনাসংখ্যা হলো ৩০ হাজার দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী। ইলখানাতের করদরাজ্য জর্জিয়ার খ্রিস্টান রাজা দিলেন আরো ১০ হাজার সৈন্য। আরেক করদরাজ্য সিলিসিয়া দিলো বাছাই করা ৫০০ নাইট। সেই সাথে মোঙ্গল বাহিনীর সামনে চললো ২০ হাজার পরাজিত বাগদাদি মুসলিম সেনা, যাদের অধিকাংশই শিয়া। এবার কিতবুঘার মোট সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ালো ৬০ হাজার ৫০০! বিশাল এ বাহিনী নিয়ে মিশর অভিমুখে সিরিয়া সীমান্তে আছড়ে পড়লেন কিতবুঘা।

১৩ জানুয়ারি ১২৬০ সাল। উত্তর শামের শ্রেষ্ঠ শহর হালবের (আলেপ্পো) পতন ঘটলো মোঙ্গলদের হাতে। প্রাণভয়ে পালিয়ে বাঁচলো হালবের অধিবাসীরা। যারা পালাতে পারলো না তারা ভেড়া-বকরির মতোই পাইকারি জবাই হতে লাগলো। শহরের পর শহর ধ্বংস করে মোঙ্গলরা দুর্বীর গতিতে এগিয়ে চললো সিরিয়ার রাজধানী দামেশকের দিকে। অবশেষে ১২৬০ সালের মার্চ মাসে পতন ঘটলো রাজধানী দামেশকেরও! এখানেও সমান তালে চললো মানুষ জবাই! নির্বিচার গণহত্যায় উজাড় করা হলো ঐতিহ্যবাহী নগরী দামেশক। এরপর উন্মত্ত মোঙ্গলদের হাতে একে একে বিধ্বস্ত হলো বালাবাক, আস সুবাইবা ও আয়লানের মতো শহর। এসব শহরের তারাই শুধু বাঁচলো, যারা মোঙ্গল হানার আগেই পালাতে পারলো। যেসব নারী, শিশু, বৃদ্ধ পালাতে পারেনি, তাদের সকলেই হয় মোঙ্গল পৈশাচিকতার নির্মম শিকার। পুরো সিরিয়াজুড়েই চলে রক্তের এ হোলি উৎসব। পলায়নপর মানুষের ভিড়ে মিশর এবারে সত্যিকার অর্থেই হয়ে উঠলো মুসলিম বিশ্বের সর্বশেষ আশ্রয়কেন্দ্র। আর এভাবেই একসময় পুরো সিরিয়া চলে যায় ইলখানাতে পের্টের ভেতর। এক মিশর বাদে প্রায় পুরো মুসলিম মিল্লাত গ্রাস করে নিল মোঙ্গল দৈত্য। ইলখানাত সাম্রাজ্য তার বিস্তৃতির ইতিহাসে সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। এরপর থেকেই শুরু হয় তাদের পতন পর্ব! আইন জালুতের যুদ্ধ দিয়েই সূচিত হয় মুসলিম বিজয়যাত্রার নতুন যুগ!

পুরো সিরিয়া লণ্ডভণ্ড করে, দিগ্বিদিক কাঁপিয়ে ৬০ হাজার মোঙ্গল সেনা তুফান বেগে মিশর পানে ধেয়ে আসছে। সংবাদ পেয়েই সচকিত হয়ে উঠলেন সুলতান কুতুজ। তিনি মিশরের বাইরেই এ তুফান ভেঙে দেবার ইচ্ছা করলেন। সে লক্ষ্যে তিনি সসৈন্যে কায়রো থেকে রওয়ানা হন। তাঁর বাহিনীতে ছিল ১০ হাজার মিশরীয়, ১০ হাজার খাওয়ারিজমি এবং ইরাক-সিরিয়া থেকে পালিয়ে আসা অনিয়মিত আরো ৭৮ হাজার সৈন্য। সাথে ছিল বাইবার্সের বিশেষ প্রশিক্ষিত, দুর্ধর্ষ ও জানবাজ ১২ হাজার মামলুক সেনা। সর্বমোট মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ঠেকলো গিয়ে ১ লক্ষ ১০ হাজারে। সেনাসংখ্যার বিচারে মোঙ্গলদের তুলনায় মুসলিম বাহিনী বিরাট হলেও মামলুক ও মিশরীয়রা বাদে বাকি সবাই মোঙ্গলদের ভয়ে থরো-থরো কাঁপছিল! কারণ এরা ছিল মোঙ্গল বিভৎসতা থেকে কোনোরকম জান নিয়ে বেরিয়ে আসা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক পলাতক সৈনিক। একটু নিরাপদে মাথা গোঁজার জন্যই এদের মিশর আসা। এরা স্বচক্ষে দেখে এসেছে মোঙ্গল তাণ্ডব। এরা মোঙ্গলদেরকে ইয়াজুজ-মাজুজ ভেবে এখনো সেই ভ্রমেই রয়েছে। ভাবছে, ইয়াজুজ-মাজুজের সাথে মানুষ আবার টক্কর নেয় নাকি! তাই মোঙ্গলভীতি ছিল এদের মনে বদ্ধমূল। আর এ কারণেই মিশর সীমান্ত পার



হওয়ার পরপরই তারা আর অগ্রসর হতে চাইলো না। তখন সুলতান কুতুজের হুমকি-ধমকিতে তারা ফের অগ্রসর হলো ঠিকই; তবে তা খুবই দুর্বলচিত্তে, নড়বড়ে পদক্ষেপে। অবশেষে মুসলিম বাহিনী ঐতিহাসিক আইন জালুত প্রান্তরে এসে মোঙ্গল বাহিনীর মুখোমুখি হলো।

আইন জালুত। বর্তমান ফিলিস্তিনের গাজার নিকটবর্তী একটি ঐতিহাসিক স্থান। ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারক মুসলিম-মোঙ্গল ভয়াবহ যুদ্ধের কারণেই কেবল এ প্রান্তর ঐতিহাসিক নয়। বহুকাল পূর্বে এখানে আরো একটি ফয়সালামূলক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ প্রান্তরের নামকরণও রয়েছে সে যুদ্ধের প্রচ্ছন্ন ছাপ। প্রায় চারহাজার বছর আগে আল্লাহদ্রোহী জালুত (Goliath) কে এ প্রান্তরেই নবী দাউদ আ. গুলতি মেরে হত্যা করেছিলেন। জালুত ছিল ফিলিস্তিন অঞ্চলের কাফির সম্রাট। পনেরো ফিট উঁচু বিশালদেহী এ কাফিরের নিহতের মধ্য দিয়ে অবসান হয় জালুতের সাম্রাজ্যের। অভ্যুদয় ঘটে বনি ইসরাইলি মুসলিম রাজ্যের। ঠিক যেখানে জালুত নিহত হয়, সে স্থানকে আইন জালুত (জালুতের পতনস্থল) হিসেবে পরবর্তী ইতিহাস স্মরণ করে আসছে। এর পাশেই রয়েছে একটি প্রবহমান খাল, ভূগোলে যা নাহরে জালুত নামেই পরিচিত! নাহরে জালুতের পার্শ্বস্থ আইনে জালুতে এসেই মোঙ্গলরা তাদের বিজয়ের দীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম থমকে দাঁড়ালো। প্রথমবারের মতো তাদের সামনে তারা সমকক্ষ অথবা শ্রেষ্ঠ কাউকে খুঁজে পেলো!

৩ সেপ্টেম্বর ১২৬০ সাল। আইন জালুত প্রান্তর। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিবদমান দুটি বাহিনী। একদিকে স্বগৌরবে উড়ছে হলুদের মাঝে অর্ধচন্দ্র খচিত মামলুক পতাকা। অপরদিকে পতপত করছে ত্রিশূল আঁকা লাল-হলুদের ইলখানাত ঝাণ্ডা। কী হবে এবার? তবে কি চিরন্তন চিত্রনাট্য মেনেই ত্রিশূলের দোদণ্ড দাপটে আবারো ভেঙ্গে চুরমার হবে ইসলামের হিলালি নিশান? নাকি ইতিহাসের উল্টোযাত্রায় দুমড়ে-মুচড়ে যাবে ধারালো ত্রিফলা! তাৎপর্যের বিচারে আইন জালুত আসলেই ছিল তৎকালীন বিশ্ব ইতিহাসের গতিনির্ধারক এক টার্নিং রণক্ষেত্র। বরাবরের মতো মোঙ্গল সয়লাবে সেদিন সেখানে কার্যকর বাঁধ দিতে না পারলে, আজকের ইতিহাস হয়তো অন্যভাবেই লেখা হতো।

যুগসন্ধিক্ষণের সেই মহারণে মোঙ্গল বাহিনীর নেতৃত্বে আছেন বহুযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ, নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টান, দুইয় সেনাপতি কিতবুঘা নোয়ন। মুসলিম বাহিনীর মূল কমান্ড যথারীতি থাকলো খাওয়ারিজমি বংশোদ্ভূত মামলুক সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজের হাতে। সুলতান কুতুজ তাঁর বাহিনী সাজালেন এভাবে-

আইন জালুতের একদম উত্তর প্রান্তে তিনি মোতায়েন করলেন বাইবার্সের নেতৃত্বাধীন ১২ হাজার দূরন্ত মামলুক সৈন্য। এর সামান্য দক্ষিণে স্বয়ং সুলতান কুতুজের নেতৃত্বে থাকলো ১০ হাজার মিশরীয় সেনা। আরো একটু দক্ষিণে আল মানসুর মুহাম্মাদের নেতৃত্বে পাঠালেন ১০ হাজার সৈন্যের খাওয়ারিজমি বাহিনী এবং গিলবোয়া পাহাড়ের উত্তরে নাহরে জালুতের দক্ষিণ পাশে আল আশরাফ মুসার নেতৃত্বে প্রস্তুত রাখলেন ৭৮ হাজার সৈন্যের শাম, ইরাকসহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উদ্ধাস্ত হয়ে আসা অনিয়মিত বাহিনীকে।

মোঙ্গল সর্বাধিনায়ক কিতবুঘাও তার সৈন্য বিন্যাস করলেন অনেকটা সেভাবেই। ৩০ হাজার দুর্ধর্ষ মোঙ্গল সৈন্যসহ তিনি নিজে অবস্থান নিলেন খোদ সুলতান কুতুজের মুখোমুখি এবং তার উত্তরে রাখলেন অপর সেনাপতি বায়দারের নেতৃত্বে ৩০ হাজার ৫০০ সৈন্যের অবশিষ্ট বাহিনীকে, যা মূলত ছিল বাগদাদি শিয়া, সিলিসিয়ান নাইট ও জর্জিয়-আর্মেনীয় খ্রিস্টান সৈন্যদের নিয়ে গঠিত যৌথবাহিনী।

তৎকালীন অপ্রতিরোধ্য বিশ্বশক্তি মোঙ্গল বাহিনীর এমন একটা ব্যতিক্রমী নিজস্ব যুদ্ধচাল ছিল, যার প্রকৃত জবাব কারোরই জানা ছিল না। যুদ্ধের শুরুতেই জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে প্রায় সকল প্রতিপক্ষ তাদের সেই ভয়ঙ্কর ফাঁদে ফেঁসে যেতো। একবার সেই জালে আটকে গেলে বিধ্বস্ত হওয়া ছাড়া মুক্তি মিলতো না কোনো বাহিনীরই। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথমেই তারা তাদের দক্ষ তীরন্দাজদের দিয়ে প্রতিপক্ষের উপর বিরামহীন অবিশ্বাস্য দূরপাল্লার তীর নিক্ষেপ করতো। ফলে একতরফা তীরাঘাতে জর্জরিত হয়ে প্রতিপক্ষও তাদের উপর আক্রমণের জন্য তেতে উঠতো। ক্ষুব্ধ প্রতিপক্ষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে যখনি মোঙ্গলদের উপর হামলে পড়তো, ঠিক তখনি মোঙ্গল তীরন্দাজরা সরে পড়তো এবং আচমকা তাদের বর্ষাধারীরা এগিয়ে এসে শত্রুদেরকে এলোপাথাড়ি বর্ষাবিদ্ধ করে করে তীব্র যুদ্ধের অভিনয় করতো। একসময় হঠাৎ ভয় পাবার ভান করে পিছু হঠতো। শত্রুরা যেই উল্লসিত হয়ে মোঙ্গলদের পিছু ধাওয়া করে বেশ কিছুদূর চলে আসতো, অমনি তারা নিজেদের নির্বাচিত স্থানে এসে হঠাৎ করেই ঘুরে দাঁড়াতো এবং ধাওয়াকারীদের উপর বজ্রের মতো ঝেঁপে পড়তো। সেই সাথে আগে থেকেই সেখানে ওঁৎ পেতে থাকা গুপ্তবাহিনীও ধাওয়াকারী শত্রুদেরকে কর্ডনের মধ্যে নিয়ে এসে চারিদিক থেকে একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়তো। আর তখনই তারা শুরু করতো আসল যুদ্ধ। প্রতিপক্ষ টের পেতো মোঙ্গল তেজ। ফলে চতুর্মুখী হামলার মুখে পড়ে শত্রুবাহিনী নিমিষেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো।

আইনে জালুতেও চিরাচরিত এ মোঙ্গল ট্র্যাডিশনের ব্যত্যয় ঘটেনি। সুলতান কুতুজের নির্দেশে আল আশরাফ মুসা যখন ৭৮ হাজার অনিয়মিত সৈন্যের

বিশাল বাহিনী নিয়ে মিশরের বিখ্যাত আঁড়ধনু দিয়ে মোঙ্গলদের উপর হামলা শুরু করলেন তখন মোঙ্গলরাও তাদের দূরপাল্লার বিশ্বখ্যাত ধনুকের অবিরাম তীর বর্ষণে মিশরীয়দের যথেষ্ট ক্ষতি করতে লাগলো। এতে আল আশরাফ মুসা ক্রুদ্ধ হয়ে ব্যাপক হামলার আদেশ জারি করলেন। মোঙ্গলরা এতক্ষণ এটাই চাইছিল, মুসলিম বাহিনীর তীব্র হামলার মুখে এবারে তারা তাদের বিখ্যাত সেই চাল শুরু করলো। মোঙ্গলদের মেকি পিছু হটা দেখে ফলাফল চিন্তা না করেই মুসার বাহিনী সোৎসাহে মোঙ্গলদের দিকে আগাতে লাগলো। কুতুজের নির্দেশে উত্তর প্রান্তে নিষ্ক্রিয় দাঁড়িয়ে থাকা বাইবার্স মোঙ্গলদের এ চাল ঠিকই ধরে ফেললেন। তাই কুতুজকে পরামর্শ দিলেন এদের নিবৃত্ত রাখতে; কিন্তু কে শোনে কার কথা! কুতুজ বললেন- “এরা অনিয়মিত, তাই ধ্বংস হলেও কোনো ক্ষতি নেই।” একটা উদ্বাস্ত মুসলিম বাহিনীকে এভাবে বলির পাঁঠা বানানো হবে, বাইবার্স তা মেনে নিতে পারলেন না। তাই নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে পড়তে যাওয়া বিশাল বাহিনীকে সতর্ক করতে ক্রুদ্ধ বাইবার্স এবারে দূত পাঠালেন স্বয়ং আল আশরাফ মুসার কাছে; কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। মোঙ্গল চক্রে ভালোই জড়িয়ে পড়েছে অনিয়মিত এ বাহিনীটি। ফলে মোঙ্গল হিংস্রতায় কচুকাটা হতে লাগলো গণহারে। অবশ্য সংখ্যাধিক্যের কারণে অনেকেই পালিয়ে বাঁচলো। এদের মধ্যে আগ থেকেই ছিল প্রচণ্ড মোঙ্গলভীতি। কুতুজের অদূরদর্শিতায় এবার এরা শুধু যুদ্ধক্ষেত্র থেকেই নয়, আইন জালুত থেকেও উদ্ধৃষ্টাশ্রমে পালালো।

মোঙ্গল যাতায় পিষ্ট হয়ে ৭৮ হাজার সৈন্যের মুসলিম স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পলায়ন করায় আইন জালুতে মুসলিম বাহিনী সংখ্যালঘু হয়ে পড়লো। এবার মাঠ খালি পেয়ে মোঙ্গলরা তীব্রবেগে তেড়ে এলো আল মানসুর মুহাম্মাদের নেতৃত্বাধীন ১০ হাজার সৈন্যের খাওয়ারিজমি বাহিনীর দিকে। উন্মত্ত মোঙ্গলদের রণদামামা ‘হুহু’র ঝঙ্কারে তাদেরও পিলে চমকে উঠলো। মোঙ্গলসৈন্যের পুরোনো আতঙ্ক ফের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠায় তারাও বিনা প্রতিরোধে পাঠটান দিল! পরিবর্তিত এ পরিস্থিতিতে আইন জালুত প্রান্তরে মুসলিম বাহিনী নিতান্তই নগণ্য হয়ে পড়লো। কেবল কুতুজের ১০ হাজার মিশরীয় বাইবার্সের ১২ হাজার মামলুক সৈন্যই মাঠে পড়ে রইলো! বিপরীতে মোঙ্গল সৈন্যের সংখ্যা কমবেশি সেই ৬০ হাজার ৫০০-ই থাকলো! মোঙ্গলরা এবার স্বয়ং কুতুজের মিশরীয় বাহিনীর দিকেই ধেয়ে আসছে! সুলতান কুতুজও বীরবিক্রমে রুখে দাঁড়ালেন। বাইবার্স ময়দানে আসতে চাইলে কুতুজ বাইবার্সকে নড়বারও হুকুম দিলেন না। কারণ তিনি বিজয়ের ভাগ কাউকেই যে দিতে চান না। মিশরীয় বাহিনী অত্যন্ত শৌর্যের সাথে মোকাবেলা করেও মোঙ্গল সংখ্যাধিক্যের চাপে নিজেদের কাতার

রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। মোঙ্গলরা এতোই বেপরোয়া আক্রমণ শাণায় যে কুতুজের বাম দিকের বাহিনী প্রায় পুরোটাই ধ্বংস হয়ে যায়। পরাজয় অবশ্যজ্ঞাবী দেখে হতাশ কুতুজ মাথা থেকে শিরস্ত্রাণ ছুঁড়ে দিয়ে পালাবার পথ খুঁজছিলেন; কিন্তু শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলায় সৈন্যরা তাকে চিনে ফেলে, তাই সুলতান কুতুজ চক্ষুলাজ্জায় “হায় আমার ইসলাম!” বলে আতর্নাদ করে ওঠেন এবং সৈন্যদের চিৎকার করে দৃঢ়পদে লড়ে যাবার আহ্বান জানান; কিন্তু সবই বৃথা যায়। দুর্ধর্ষ মোঙ্গলরা কুতুজের নিজস্ব বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে ক্রমেই ময়দান পরিষ্কার করে নিচ্ছিলো। কী আশ্চর্য! এমন সঙ্কটময় মুহূর্তেও কুতুজ বাইবার্সকে মাঠে নামার অনুমতি দিলেন না। এবারে বাইবার্স আর বসে থাকলেন না। তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। চেইন অব কমান্ড ভেঙেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন ময়দানে। নেতৃত্বের বাগডোর তুলে নিলেন নিজ হাতে।

মিদফা। বাইবার্স আবিষ্কৃত পৃথিবীর প্রথম হাতকামান। যার প্রথম ব্যবহার হয়েছিল আইন জালুতে। এটা মূলত ছিল মোঙ্গলদের অবিশ্বাস্য দূরপাল্লার ধনুকের জবাব। যার নিক্ষিপ্ত অগ্নিগোলা অনেক দূরে গিয়ে আঘাত হানতো। ব্যাপক ধ্বংসশীল এ মিদফা (Hand cannon) ছিল তখনকার সময়ের সর্বাধুনিক অস্ত্র। চলন্ত অবস্থাতেই এ থেকে অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করা যেতো। ফলে এর সক্ষমতা তখনকার দিনের বিশ্বত্রাস দূরপাল্লার মোঙ্গল ধনুককেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বাইবার্স বহু গবেষণা চালিয়ে বিজ্ঞানীদের সাথে দিন-রাত মতবিনিময় করে এ মিদফা আবিষ্কার করেন শুধু মোঙ্গল তুফান প্রতিরোধের চিন্তা থেকেই।

সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্র মিদফা নিয়েই বাইবার্স এবার আইন জালুতে আবির্ভূত হন। তিনি যখন ময়দানে আসেন তখন মিশরীয় মুসলিম বাহিনীর অবস্থা ছিল বড়ই সঙ্গীন। সে সময় মোঙ্গল বাহিনীর সাকুল্য সংখ্যা ছিল অন্তত ৫০ হাজার। আর মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা খুব বেশি হলে মামলুকসহ ১৩ হাজার! ময়দানে ধাবমান অবস্থায়ই মামলুকরা মোঙ্গলদের উপর মিদফার প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ অব্যাহত রাখলো। ফলে মোঙ্গলরা অদ্ভুত এই হাত কামানের যন্ত্রণায় তাদের সেরা অস্ত্র ও বিশ্বের ত্রাস দূরপাল্লার তীর-ধনুকের সঠিক ব্যবহার করতে না পেরে বেকায়দায় পড়ে গেলো। সংখ্যায় প্রায় চারগুণ বেশি হয়েও আইন জালুত প্রান্তরে এই প্রথম তারা চরম অসহায়ত্ব বোধ করলো।

দুর্ধর্ষ মামলুকরা ছিল দূরন্ত ঘোড়সওয়ার। এক্ষেত্রে তারা মোঙ্গলদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বাইবার্স তাদের শিখিয়েছিলেন ছোট দুই ঘোড়ার পীঠে দু'পা দিয়ে দাঁড়িয়ে তীর নিক্ষেপ করার মতো অবিশ্বাস্য কসরত। এবারে নিপুণ মামলুক অস্বারোহীরা এগিয়ে গিয়ে মোঙ্গলদের উপর বজ্রের মতো হামলে পড়লো। শুরু হলো হাতাহাতি যুদ্ধ। দুর্ধর্ষ মামলুকরা অতি সহজেই তাদের শিকল বিশিষ্ট

গুর্জের দ্বারা চামড়ার শিরস্ত্রাণ পড়া মোঙ্গলদের মাথা মুহূর্মুহূ চূর্ণ করতে লাগলো। সেইসাথে তাদের বিশ্বখ্যাত তরবারি কিলিজের নিচে মোঙ্গলরা সমানতালে হতাহত হতে থাকলো। সেদিন ভীষণ যুদ্ধ হলো আইন জালুতে। উন্মত্ত দানবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো মামলুকরা। মোঙ্গলরা নিহত হতে লাগলো পাইকারি দরে। এবার আর মুসলিম বাহিনীর পা টললো না; বরং মাত্র ১২ হাজার মামলুক সৈন্যের তাগুবে অর্ধলক্ষ মোঙ্গল সেনার কলজে কেঁপে উঠলো। নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টান, শামানবাদি মোঙ্গল, সিলিসিয়ান নাইটসহ সবাই চোখে সর্ষেফুল দেখতে লাগলো। যুগ-যুগ ধরে মুসলিম জাহানে নিপীড়ন চালানো প্রতিটি মোঙ্গলকে ধরে ধরে তাদের প্রাপ্য প্রতিফল ঠিক ঠিক বুঝিয়ে দিচ্ছিল মামলুকরা। সেদিন মামলুক কেয়ামত কেউ আর রোধ করতে পারলো না।

যুদ্ধ চলছে পুরোদমে। মোঙ্গলরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে মুসলিম শৌর্যের প্রকৃত তেজ। মামলুক জিঘাংসায় গণহারে হচ্ছে হতাহত। সেনাপতি বায়দার হাতাহাতি যুদ্ধের সময়ই নিহত হলেন। সর্বাধিনায়ক কিতবুঘা নোয়ন সেদিন যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করেন। পালানোর চেষ্টা না করে যুদ্ধের গতিধারা বদলানোর প্রাণপণ চেষ্টা তিনি করে যান। একসময় স্বয়ং বাইবার্সের হাতে পড়ে মারাত্মক আহত হন। তখন মৃত্যুপথ যাত্রী কিতবুঘা বাইবার্সের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বললেন: “হালাকু খান আইন জালুতের এই করুণ পরিণতির সংবাদ শোনামাত্রই আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে ছুটে আসবেন। লক্ষ ঘোড়ার পদাঘাতে ফুরাত থেকে নীলনদ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম জাহান কেঁপে উঠবে। ঘোড়ার জিনের মধ্যে করে নিয়ে যাবেন মিশরের মাটি।”

তখন ত্রুদ্ব বাইবার্স নিজ হাতে তার মাথা কেটে নিলেন। মামলুক তোপে পিছু হটতে থাকা ছত্রভঙ্গ মোঙ্গলদের দেখিয়ে সৈন্যদের হুকুম দিলেন- “একটাও যেন জীবন্ত পালাতে না পারে।”

শুধু হুকুমই নয়; নিজেও সমানতালে লেগে পড়লেন মোঙ্গল বর্ষে দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ক্ষোভ, লাঞ্ছনা-কোটি মুসলিমের সম্ভ্রম-খুনের প্রতিশোধ নিশায় মামলুকরা আইন জালুতে সত্যিই হয়ে পড়লো উন্মাদ, বেসামান। প্রথম সাক্ষাতেই বাইবার্স বুঝিয়ে দিলেন মোঙ্গল বর্বরতার দিন শেষ। এবার প্রতিবিধানের পালা। অবশেষে মামলুক নির্মমতায় টিকতে না পেরে মোঙ্গলরা রণেভঙ্গ দিল। পালাতে শুরু করলো দিগ্বিদিক। বাইবার্স ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। সব ভুলে মাইলের পর মাইল দৌড়ের উপর রাখলেন হিংস্র মোঙ্গলদের। শুরু হলো ইতিহাসের দীর্ঘতম পশ্চাদ্ধাবন।

মুসলিমরা যাদেরকে ইয়াজুজ-মাজুজ ভেবে ভুল করেছিল, এক মিশর বাদে কার্যত সারা মুসলিমবিশ্ব যারা গ্রাস করে নিয়েছিল- বোখারা, সমরকন্দ, তিরমিয,

বলখ, নিশাপুর, গজনি, বাগদাদ, হালব, দামেশকসহ ঐতিহ্যবাহী মুসলিম নগরীগুলোকে যারা শ্মশানে পরিণত করেছিল, ট্রান্স অক্সিয়ানা থেকে দাজলা-ফোরাত হয়ে সিন্ধু-নীল পর্যন্ত যারা বছরের পর বছর মুসলিম রক্তের নহর বইয়েছিল, সেই বর্বর মোঙ্গলরা আজ পালাচ্ছে! মামলুক আক্রমণ থেকে বাঁচতে দিখিদিব দৌড়াচ্ছে। কিন্তু সামান্য আশ্রয় কোথাও মিলছে না। কোথাও দাঁড়াবার জো নেই। উদ্ধত কিলিজ হাতে ধেয়ে আসছে মামলুকরা। স্বয়ং বাইবার্সের নেতৃত্বে ফিলিস্তিন ছাড়িয়ে পুরো শামজুড়ে দিনের পর দিন, ক্রোশের পর ক্রোশ চললো এ ধাওয়া অভিযান। শামের মুসলিম নর-নারীরা ঘরের দরজায়, ছাদের কার্ণিশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করলো ভয়ঙ্কর এ তামাশা। দেখলো দুর্ধর্ষ মোঙ্গলদের নিয়ে মামলুকদের রক্তাক্ত ছেলেখেলা।

পলায়নপর মোঙ্গলদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ প্রথমেই পালিয়ে এসে বায়সানের জলাশয়ের সন্নিহিত আশ্রয় নেয়। বাইবার্সের নেতৃত্বে মামলুকরাও সেখানে ছুটে আসে। এসেই মোঙ্গলদের নির্মূল করতে শুরু করে। অনেক মোঙ্গলসেনা প্রাণ বাঁচাতে আশপাশের ঝোঁপ-ঝাড়ের মাঝে লুকিয়ে পড়ে। বাইবার্সের আদেশে মামলুকরা সেসব ঝোঁপ-জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে জীবন্ত দহন করে মারে জানোয়ার মোঙ্গলদের! মোঙ্গলদের মনোজগতে বাইবার্স ভয়ানক ত্রাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। তবু তারা হালাকু খানের রোষের ভয়ে আত্মসমর্পণ না করে অনিঃশেষ গন্তব্যে পালাতেই থাকলো। বাইবার্সও ধনুকভাঙা পণ করেছেন, একটাকেও পালাতে দেবেন না। আরো কিছু মোঙ্গলসেনা জর্দান নদী পেরুতে গিয়ে মামলুকদের রোষের শিকার হয়ে পাইকারিহারে নিহত হলো। তবু ক্ষান্ত দিলেন না বাইবার্স। বায়সান থেকে জর্দান নদী, নদী পেরিয়ে ফিলিস্তিন, সেখান থেকে জর্দান হয়ে দক্ষিণ শাম মাড়িয়ে উত্তর শাম পর্যন্ত পলায়নপর মোঙ্গলদের পিছু ধাওয়া করে সবক'টিকে হত্যা করতে থাকেন তিনি। টানা এই পশ্চাদ্ধাবনে সৈন্যে একনাগাড়ে সাড়ে চারশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করলেন বাইবার্স। যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরলই শুধু নয়; একমাত্র রেকর্ডও।

এ নির্মম আক্রমণ থেকে সেদিন কোন মোঙ্গলই বাঁচতে পারেনি! ৬০ হাজার ৫০০ সৈন্যের মাঝে যে ক'জন প্রথম দিকেই প্রচণ্ড গতিতে পালাতে পেরেছিল, কেবল সে ক'জনই প্রাণে বেঁচে যায়। তারা চামডার প্রান্তে বাতাস ভরে কোনো রকম ফোরাত পেরুতে সক্ষম হয়। আর এভাবেই প্রায় শ'খানেক মোঙ্গল প্রাণে রক্ষা পায়। বাইবার্স ততোক্ষণ পর্যন্ত মোঙ্গলদের পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকেন, যতোক্ষণ না সেই মহানদী ফোরাত তার গতিরোধ করে দাঁড়ায়। অবশিষ্টগুলোকে তিনি সেখানেই চুবিয়ে মারেন। মুসলিম উম্মাহর মন-মগজ থেকে মোঙ্গল জুজু তাড়াতে, মোঙ্গল সাম্রাজ্যে মামলুক ত্রাস ছড়াতে; বাইবার্সের আদেশে নিহত

মোঙ্গলদের কর্তিত মাথা শহরে শহরে ঝুলিয়ে রাখা হয়। ফলে মোঙ্গলরা বুঝে নিল, মুসলিম বিশ্ব নিয়ে ইচ্ছেমতো খেল-তামাশার দিন শেষ। বিশ্ববাসী জানলো, ইসলামি দুনিয়ায় নতুন এক কাগুরির আর্বিভাব ঘটেছে, নাম তার বাইবার্স-দ্য প্যাংহার!

ইতিপূর্বে বাগদাদ, হালব, দামেশকের মোঙ্গল গণহত্যা শুধুমাত্র মুসলিমদের উপরই সংঘটিত হয়েছিল। এ ক্র্যাকডাউন থেকে আঁতাতের মাধ্যমে সযত্নে খ্রিস্টানদের বাদ দেয়া হয়। আর এ কারণেই লেভান্টের অন্যতম ক্রুসেড রাজ্য প্রিন্সিপালিটি অব এন্টিয়ক মোঙ্গল আধিপত্য স্বীকার করে নেয়। মূলত বাগদাদ ধ্বংসের সময় থেকেই মোঙ্গলদের সাথে ক্রুসেডারদের ইসলাম বিদ্বেষী মৈত্রী গড়ে উঠে। তাই পরবর্তী আইন জালুতের যুদ্ধে ৫০০ খ্রিস্টান নাইট ও ১০ হাজার ক্রুসেড সেনা মোঙ্গলদের সাথে সরাসরি যোগ দেয়। এমনকি প্রধান সেনাপতি কিতবুধা, তিনিও ছিলেন খ্রিস্টান। বাগদাদের কসাই নামে যার চরম কুখ্যাতি রয়েছে। তাই আইন জালুত ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে মোঙ্গল ও খ্রিস্টানদের প্রথম সম্মিলিত যুদ্ধ। সে যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পরাজয় ঘটলে, মুসলিম মিল্লাতের আজকের মানচিত্র হয়তো অন্যরকমই হতো। ক্রুসেডের ইতিহাস নিশ্চিতভাবেই ভিন্ন ধারায় লেখা হতো। মোঙ্গল উপাখ্যানও পেতো একটা আলাদা মাত্রা। ইসলাম বিস্তারলাভ পরবর্তী সময়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ছিল এই আইন জালুত। মুসলমানদের সামনে এ যুদ্ধ জয়ের কোনো বিকল্প ছিল না। মহান আল্লাহর ইচ্ছায় অবশেষে মুসলিমরা বিজয়ীও হলো।

আইন জালুত যুদ্ধের তাৎক্ষণিক লাভটা হলো, মোঙ্গলদের অন্তরাত্মায় মুসলিম ভীতি ছড়িয়ে পড়া। এক্ষেত্রে বাইবার্সের কঠিন নীতি খুবই কাজে দিয়েছে। সেইসাথে মুসলিম জাহান ফিরে পেলো তাদের হারানো আত্মবিশ্বাস। খুঁজে পেলো হতগৌরব। আর এ যুদ্ধের মধ্যদিয়েই নতুন করে মুসলিম বিজয়যাত্রা সূচিত হবার সাথে সাথে খোয়া যাওয়া ভূখণ্ডগুলো পুনরুদ্ধারের উদ্বেগও হয়! বাইবার্স ফেরাত পর্যন্ত মোঙ্গলদের তাড়িয়ে দিয়ে বৈদ্যুতিক হওয়া গোটা শাম উদ্ধার করেন এবং ফেরার পথে ‘আল আহস’ অধিকার করে নেন। তাছাড়া এ যুদ্ধের মধ্যদিয়েই বিশাল বিস্তৃত মোঙ্গল সাম্রাজ্যের ক্ষয় শুরু হয়। জার্মান প্রফেসর মেয়ার যথার্থই বলেছেন-

“এ যুদ্ধ ছিল ইতিহাসের অন্যতম এক নিশ্চিন্তমূলক সন্ধিক্ষণ। মোঙ্গলদের অপরাভেদতার উপাখ্যান ভেঙ্গে গেলো বিশ্ববরের জন্য। থেমে গেলো উত্তর আফ্রিকা পানে তাদের পশ্চিমমুখী সম্প্রসারণ প্রয়াস। নিশ্চিত হলো ইসলামের চলমান অস্তিত্ব এবং সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে প্রতিষ্ঠিত হলো মামলুক সার্বভৌমত্ব।



আইন জালুতের অবিস্মরণীয় যুদ্ধজয়েই ক্ষ্যান্ত হননি বাইবার্স। আত্মতৃপ্তির টেকুর তুলতেও তিনি নারাজ। মূল কর্তব্য এখনো যে অধরাই রয়ে গেছে! তাই যুদ্ধ শেষে সুলতান কুতুজ রণক্ষেত্র থেকে সোজা দামেশক চলে গেলেও বাইবার্স পড়ে রইলেন ময়দানেই। অনন্য এ জয়ের অনিবার্য ফল তিনি পুরোমাত্রায়ই বুঝে নিলেন। মোঙ্গলদের তাড়াতে তাড়াতে অধিকার করে নিলেন সদ্য হাতছাড়া হওয়া শামের বিস্তৃত অঞ্চল। ইতিপূর্বে যেখানে সুলতান কুতুজের কার্যকর কোনো কর্তৃত্বই ছিল না। শুধু তাই নয়; বাইবার্স মহানদী ফোরাতে দক্ষিণ-পূর্ব থেকে আরো দক্ষিণে এগিয়ে গিয়ে পর্যায়ক্রমে উদ্ধার করলেন ভূতপূর্ব আক্বাসি খিলাফাহর গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ আল আহসা ও উমান। যেখানে মামলুক কর্তৃত্ব বহুদূর, এমনকি আইয়ুবি সালতানাতের আধিপত্যও কোনোকালেই ছিল না। মোঙ্গলরা এসব অঞ্চল সরাসরি আক্বাসি খিলাফাহর হাত থেকেই কেড়ে নিয়েছিল। বাইবার্সের নিরবচ্ছিন্ন এ অভিযানে বাহরি মামলুক সালতানাত এবারে বিস্তৃতির শীর্ষ বিন্দু স্পর্শ করলো।

এতো এতো অর্জনের পরও বাইবার্স কিন্তু স্বাধিকারের আওয়াজ তুললেন না। নামসর্বস্ব হলেও সুলতান কুতুজের আনুগত্য মেনেই তার সাথে সাক্ষাৎ এবং এসব বিজয়াভিযানের সুসংবাদ শোনাতে তিনি তাই দামেশকমুখী হলেন। অথচ তিনি চাইলে তখনই বিদ্রোহী হয়ে অধিকৃত অঞ্চলসহ গোটা শামে তার একক কর্তৃত্ব সহজেই প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। সে সুযোগ ও সামর্থ্য তার পুরোই ছিল। কুতুজের তখন চেয়ে দেখা ছাড়া করার থাকতো না কিছুই। তবুও চুক্তিমত তিনি শুধুই দামেশকের অধিকার বোঝে নিতে চললেন। বাইবার্স যখন দাঁত সৈন্যে উমান থেকে আল আহসা হয়ে শামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পাড়ি দিচ্ছিলেন, তখন দেখলেন বিচিত্র এক দৃশ্য! দামেশকসহ পুরো শাম শাসনের ফরমান হাতে নিয়ে কুতুজের প্রিয়পাত্র আলামউদ্দিন সানজার সৈন্যে চলছেন হালধের পথে! অথচ ইতিপূর্বে শাম কুতুজের রাজ্যভূক্তই ছিল না। সেটা এইবার মামলুক সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেন বাইবার্স। ইচ্ছে করলে নিজ দেশেই রাখতে পারতেন গোটা শাম; কিন্তু তা না করে তিনি কৃত অঙ্গীকারের উপরই অটল রইলেন। অথচ কুতুজ করে বসলেন জঘন্য প্রবঞ্চনা।

কুতুজের এসব কাণ্ডে মামলুকরা তাই যারপরনাই তেতে উঠলো। পুরোনো অনেক হিসেবও ফের সামনে চলে আসলো। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো



প্রতিশোধের বহিঃশিখা। ফলে মামলুকরা এবার আর শুভেচ্ছা জানাতে নয়, প্রতিকার নিতেই দ্রুত ছুটে চললো দামেশক পানে!

এই সেই কুতুজ, যিনি ১২৫৭ সালে মামলুক সালতানাতের উপ-সুলতান নিযুক্ত হয়েছিলেন। মূল সুলতান ছিলেন ছয় বছরের আল মানসুর আলি। শিশু সুলতানের অকর্মণ্যতায় কুতুজ তখন সব কর্তৃত্ব নিজ হাতে তুলে নেন। বনে যান দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। নাবালক সুলতানের মাতা শাজারাতুদ দুর যাতে কুতুজের অন্যায় হস্তক্ষেপের কোনো প্রতিকার চাইতে না পারেন সেজন্য কুতুজ শাজারাতুদ দুরকে প্রথমেই অত্যন্ত নির্মম পন্থায়, নিতান্তই অসৌজন্যমূলকভাবে হত্যা করেন। সুলতানা শাজারাতুদ দুর এর এই অমানবিক হত্যাকাণ্ডে মিশরজুড়ে তখন তীব্র ধিক্কার উঠে। শাজারাতুদ দুর অঘোষিত মামলুকজননী হওয়ায় মামলুকরাও এতে প্রচণ্ড রকম ক্ষেপে যায়। কুতুজের অপরিণামদর্শীতার শেষ এখানেই নয়; সুলতান হবার আগে কুতুজ যখন শ্রেফ আমির আর বাইবার্স বাহরি মামলুক বিশেষ ইউনিটের সেনানায়ক; কুতুজ তখনই বাইবার্সকে হীনবল করার জন্য বাইবার্সের বন্ধু ও সহকারী মামলুক সেনাপতি ফারিসউদ্দিন আকাইকে হত্যা করেন। এছাড়া বাইবার্সের সমর্থক বিধায় উনিসের আমির বদরুদ্দিন বাকতুত ও বাহাদির আল মুইযির অন্যায় পদচ্যুতিও তার কারসাজিতেই হয়।

এসব কার্যকারণে কুতুজের সাথে তখন থেকেই বাইবার্সের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। শাজারাতুদ দুর হত্যার জেরে সে রেযারেশি শেষ পর্যন্ত শত্রুতারই জন্ম দেয়। এভাবেই চলে তিন বছর। অবশেষে স্নায়ুযুদ্ধের একপর্যায়ে সামনে চলে আসে আইন জালুত পটভূমি। আইন জালুতের ডামাডোল সে শত্রুতায় সাময়িক পানি ঢাললেও, আইন জালুতের মহারণে কুতুজের হঠকারী যুদ্ধনীতিতে বাইবার্স ফের ফুঁসে উঠেন। সেইসাথে কুতুজের যুদ্ধ পরবর্তী অঙ্গীকার ভঙ্গের মতো জঘন্য অপরাধে বাইবার্স এবারে চরম অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন। কুতুজের সাথে সব দেনা পরিশোধে তিনি সসৈন্যে চললেন সালিহিয়া পানে। কারণ কুতুজ যে তখন দামেশক ছেড়ে কায়রোর পথে সালিহিয়াতেই আছেন; কিন্তু কুদরতের ফয়সালা ছিল ভিন্ন। মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক! বাইবার্সের হাতে নয়; কুতুজ নিহত হলেন বেসামরিক দুই মামলুকের হাতে! কুতুজ শুধু যে বাইবার্সের সাথেই উঠেপড়ে লেগেছিলেন; তা নয়। তিনি ছিলেন বড় ধরনের একজন আত্মসত্তীও! স্পর্শকৃত্তির আইন জালুত ময়দানে এসেও তিনি এমন দুটি অপরিণামদর্শী কাণ্ড করে বসলেন, যা মানুষের স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধিকেও লোপ করে দিতে বাধ্য!

প্রথমত যুদ্ধের শুরুতেই তিনি ৭৮ হাজার অনিয়মিত উদ্ধাস্ত সৈন্যকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেন। বাইবার্সের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও এদেরকে মোঙ্গল বেষ্টিনিত ফেঁসে যাওয়া থেকে তিনি নিবৃত্ত করেননি; বরং “এরা অনিয়মিত, ধ্বংস হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই।” বলে চরম ঔদাসিন্য প্রদর্শন করেন। ফলে যা হবার, তাই হলো। অনেকেই হলো কচুকাটা, বাকিরা মূল যুদ্ধের আগেই হলো পলায়নপর। মোঙ্গলত্রাস ছড়ালো মুসলিম শিবিরে। যুদ্ধ না করেই ১০ হাজার খাওয়ারিজমি সৈন্যও তাই উর্ধ্বশ্বাসে পালালো। এতে অটুট মুসলিম শক্তিও হয়ে গেলো ক্ষয়িষ্ণু। মাঠে পড়ে রইলো শুধু মামলুক ও মিশরীয় বাহিনী।

দ্বিতীয়ত সর্বাঙ্গিক মোঙ্গল হামলার মুখে ১০ হাজার সৈন্যের মিশরীয় বাহিনী যখন প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে নিশ্চিত পরাজয়ের ক্ষণ গুণছিল এমনকি স্বয়ং কুতুজও পালাবার পথ খুঁজছিলেন। তখনো তিনি তাজাদম ১২ হাজার দুর্ধর্ষ মামলুক সৈন্যকে ময়দানে আসার অনুমতি দেননি! পাছে তাকে টেকা দিয়ে বাইবার্স না বিজয়ী হয়ে যান! অবশেষে চেইন অব কমান্ড ভেঙ্গে বাইবার্স ময়দানে আসামাত্রই রণক্ষেত্রের কায়া পাল্টে যায়। বিজয়ী হতে চলা মোঙ্গলদেরকে কয়েক যুগ পর পরাজয়ের তেতো স্বাদ তিনিই অস্বাদন করান।

উম্মাহর ভাগ্য নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলা হয়তো স্বয়ং আল্লাহরও বরদাশত হয়নি। তাই যুদ্ধশেষে কুতুজ যখন দামেশকে অবকাশ যাপনের পর কায়রোর পথে সিরিয়ার সালিহিয়া শহরে এসে অবস্থান করলেন, তখন বিজয়ী সুলতানকে শুভেচ্ছা জানাতে দিগ্বিদিক থেকে মানুষের ঢল নামলো। সেই জনশ্রোতে মিশে গেলেন বহুদিন আগে কুতুজের ষড়যন্ত্রে পদচ্যুত হওয়া দুই মামলুক আমির বদরুদ্দিন বাকতুত ও বাহাদির আল মুইযি। একসময় দুজনই সুলতানকে অভিনন্দন জানাতে তার সাথে দেখা করতে গেলেন। বদরুদ্দিন কুতুজের হস্তচুম্বন করে স্তুতিবাক্যের বন্যা বইয়ে নিয়মমাফিক একপাশে দাঁড়ালেন। এবারে বাহাদির এলেন এবং সুলতানের হস্তচুম্বনের জন্য স্বাভাবিক ধরামাত্রই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বদরুদ্দিন চোখের পলকে তরবারি কোষমুক্ত করে এক আঘাতেই কুতুজের গলা কেটে ফেললেন!

এদিকে কুতুজ হত্যার মিশনে বাইবার্সের নেতৃত্বে মামলুকরা ঝড়ের বেগে ধেয়ে আসছিল সালিহিয়া অভিমুখে; কিন্তু বাইবার্স এসে পৌঁছার ক্ষণকাল আগেই কুতুজ ইতিহাসের অংশ হয়ে গেলেন! মামলুকরা এসে কুতুজের লাশ ছাড়া আর কিছুই পেলো না।<sup>১</sup>

১. আস সিলুক লি মারিফাতি দিওয়াল মুলক-১ম খণ্ড।

২৪ অক্টোবর ১২৬০ সাল। কুতুজ হত্যার মুহূর্তকালের মধ্যেই আইয়ুবীয় সুলতান আস সালিহ প্রতিষ্ঠিত সেই সালিহিয়া শহরেই নেতৃত্বহীন বাহরি মামলুক সালতানাতে সুলতান হিসেবে বাইবার্স নিজেকে ঘোষণা করলেন। নামধারণ করলেন: ‘রুকনুদ্দিন’ উপাধি নিলেন ‘আল মালিকুয যাহির’। এবার বাইবার্স ছুটলেন রাজধানী কায়রো অভিমুখে। সেখানকার মানুষ তখন ব্যস্ত ছিল কুতুজের সংবর্ধনায়ত্রে। কিন্তু বাইবার্স কায়রো পৌঁছার আগেই কুতুজ হত্যা ও বাইবার্সের ক্ষমতা গ্রহণের খবর সেখানে পৌঁছে যায়! তবুও মানুষের উদ্দীপনায় সামান্যতম ভাটা পড়েনি; বরং দ্বিগুণ উৎসাহে জনগণ লেগে পড়লো আইন জালুত বিজয় উৎসব, বিজয়ী সেনাপতির সংবর্ধনা ও নয়া সুলতান বরণের বর্ণাঢ্য কর্মকাণ্ডে। অবশেষে বাইবার্স কায়রো এসে পৌঁছলেন। নগরবাসী তাকে বরণ করে নিল খুব জাঁকজমকের সাথে। কারণ তারা জানতো আইন জালুতের জয় প্রকারান্তরে সাপের লেজে পা দেয়া। এবার কায়রো পানে মোঙ্গল ছোবল ফণা তুলে আসবেই! আর বিষাক্ত এ ছোবল থেকে কায়রোবাসীকে কার্যকর নিরাপত্তা দিতে মুসলিম বিশ্বে তখন একমাত্র বাইবার্সই আছেন। তাই মহাআয়োজনের মধ্যদিয়েই বাইবার্সের রাজ্যাভিষেক ঘটলো।

বাইবার্স এখন কেবল সামান্য বাহরি রেজিমেণ্টের সেনাপতিই নন, তিনি মিশর-সিরিয়ার একচ্ছত্র সুলতান! এবারে শুরু হলো ‘সুলতান বাইবার্স’ পরিক্রমা। বাইবার্স মসনদে বসেই জনগণের উপর কুতুজের আরোপ করা অতিরিক্ত কর বাতিল করে দেন। ফলে শুধু সেনাপতি হিসেবেই নয়; সুলতান হিসেবেও তিনি রাতারাতি জনগণের অগাধ ভরসাস্থলে পরিণত হন। বহুকাল পর মানুষ খুঁজে পেলো আস্থার ঠিকানা। নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। সেইসাথে বাইবার্স তার নামের সাথে সাযুজ্য রেখেই সিংহকে কুলচিহ্ন বা রাষ্ট্রীয় প্রতীক নির্ধারণ করেন। যেমন হালাকু খানের ছিল খরগোশ। মূলত সিংহ হলেও এটিকে পতাকাসহ রাষ্ট্রীয় অন্যান্য দলিলে এমনভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়, যা দেখতে অনেকটাই ছিল চিতাসদৃশ। ইসলামি দুনিয়ায় কুলচিহ্নের এই ব্যবহার সর্বপ্রথম সালাহউদ্দিন আইয়ুবি চালু করেন। তার প্রতীক ছিল ঈগল। যা আধুনিক মিশরসহ অন্য অনেক আরব দেশের রাষ্ট্রীয় প্রতীক হিসেবে আজও ব্যবহৃত হয়ে আসছে!

সুলতান বাইবার্স মসনদে তিষ্ঠেই বসতে না বসতেই মামলুক সালতানাতে দেখা দিল গৃহযুদ্ধের ঘনঘটা। চারিদিকে শুরু হলো চরম অন্তর্দাহ। উচ্চকিত হতে থাকলো স্বাধিকারের আওয়াজ। স্বার্থক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো বেসামাল, বেরহম। ফলে বাইবার্স প্রথমেই তিনটি বড় ধরনের বিশৃঙ্খলার মুখোমুখি হলেন। সিরিয়ার হালব, জর্দানের আল কারাক, ফিলিস্তিনের গাজায় একসাথে জ্বলে উঠলো বিদ্রোহের দাবানল।

আলামউদ্দিন সানজারকে সুলতান কুতুজ হালবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। তাই কুতুজ নিহত হওয়ায় সানজার বিদ্রোহ করে নিমকহালালীর একটা প্রয়াস চালান। আইয়ুবীয় যুবরাজ মুগিস কর্তৃক কারাকের স্বাধীনতা ঘোষণা ঠিক বিদ্রোহ নয়; একে বরং বিলুপ্ত আইয়ুবীয় সালতানাত পুনরুজ্জীবিত করণের একটা অলীক প্রচেষ্টাই বলা যায়। আর গাজার ব্যাপারটা ছিল একটু অন্যরকম। ইতিপূর্বে গাজা মামলুক এমনকি আইয়ুবি সালতানাতেরও অধীনস্থ ছিল না। মোঙ্গলরা গাজাকে মাত্রই আইন জালুতের আগ মুহূর্তে ক্রুসেডারদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল। যা মূলত ছিল ক্রুসেডরাজ্য কিংডম অব জেরুসালেমের অঙ্গরাজ্য। আইন জালুতের যুদ্ধের মাধ্যমে অন্যান্য ভূখণ্ডের মতো গাজাও বাইবার্সের হাতে বিজিত হয়। কিন্তু বাইবার্স মিশর ফিরতেই সুযোগ বুঝে শামসুদ্দিন গাজা দখল করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসেন।

বাইবার্স একসাথে তিনটি বিদ্রোহের সংবাদে নিদারুণ ক্ষুব্ধ-বিরক্ত হলেন। তাই কাল বিলম্ব না করে তিনি তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহ দমনে বেরিয়ে পড়লেন! সেইসাথে প্রত্যেক প্রদেশে দূত পাঠিয়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের হুঁশিয়ার করে দিলেন- “সাবধান! বিদ্রোহের চিন্তাও কেউ মাথায় আনবেন না। যেহেতু আমার নিশানা ভিন্ন, তাই নিজেদের মাঝে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে যে আমার সময় নষ্ট করবে, তাকে কখনোই ক্ষমা করা হবে না।”

বিদ্রোহ দমন অভিযানে বাইবার্সের প্রথম শিকারে পরিণত হলেন গাজার স্বঘোষিত সুলতান শামসুদ্দিন। বাইবার্সের প্রচণ্ড তোপে পড়ে মুহূর্তেই পরাজিত ও নিহত হন তিনি। অপরদিকে শামসুদ্দিনের এই চরম পরিণতিতে চুপসে যান মুগিস। ভয়ানক ভীত হয়ে এবার তিনি সুলতান বাইবার্সের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। ফলে বিনায়ুদ্ধেই কারাক বাইবার্সের পদানত হয়। সুলতান বাইবার্স মুগিসকে ক্ষমা করে একটা ঐতিহাসিক ভুলই করে বসলেন। পরবর্তীতে যার চড়া মাশুল তাকে দিতে হয়েছিল।

কিন্তু হালবের আলামউদ্দিন সানজার আরো বেপরোয়া হয়ে যুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। তার উপর চরমপন্থী শিখা নুসাইরি গোষ্ঠী ও অপদার্থ আইয়ুবীয়রা সানজারের সাথে হাত মিলিয়ে হালবের পরিস্থিতি একেবারেই বিক্ষোভোন্মুখ করে তুললো। এদিকে বাইবার্সও এসে পৌঁছলেন হালবের দোরগোড়ায়। একসময় চড়াও হলেন হালবের দুর্ভেদ্য দুর্গে। দুর্ধর্ষ মামলুকদের প্রবল আক্রমণে অবশেষে দুর্গে হালব দুর্গে ফাটল ধরলো। ১২৬১ সালের শুরুতে এসে বাইবার্সের হাতে হালবের পতন ঘটে। আলামউদ্দিন সানজারের শিরোচ্ছেদের মধ্য দিয়ে আপাতত অবসান হলো রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের। শান্তি ফিরে এলো দুর্যোগময় মামলুক সালতানাতে।

বিজয়ী বাইবার্স এবার কায়রো পানে ফিরতি পথ ধরলেন; কিন্তু অনুকূল পরিস্থিতিতে দেশ শাসন তার কপালে আদৌ ছিল না। তাই প্রায় সারাটি জীবনই তাকে চম্বে ফিরতে হয় ময়দান থেকে ময়দানে। কায়রোর পথে থাকতেই এবার সংবাদ এলো আইন জালুতের প্রতিশোধ নিতে ঝড়ের বেগে ধেয়ে আসছেন হালাকু খান! রাজধানী মারাগা থেকে তিনি সসৈন্যে মামলুক সীমান্তের ফোরাৎ নদী পর্যন্ত চলে এসেছেন! বাইবার্সের আর কায়রো ফেরা হলো না। পশ্চিমদ্ব্যেই লেগে গেলেন আরো একটি মহাকাব্যিক মোঙ্গলবধের পরিকল্পনায়।



১২৬০ সাল। সেনাপতি বাইবার্স এখন ‘সুলতান’ রুকনুদ্দিন বাইবার্স। খ্রিস্টীয় বর্ষপঞ্জিকার এই একটিমাত্র বছরেই বিশ্ব পরিক্রমায় ঘটে গেছে কত পট পরিবর্তন! সংঘটিত হয়েছে অজস্র বীরত্বগাঁথা। রচিত হয়েছে বহু অসাধ্য রূপকথা। বিশেষত বাইবার্সের জীবনে এ বছরের প্রতিটি ক্ষণই ছিল সোনায়ে মোড়ানো সাফল্যের এক-একটি বর্ণিল স্মারক। আইন জালুত প্রান্তরে এ বছরই তিনি ভেঙে দেন স্মরণকালের শতভাগ জয়ের মোঙ্গলীয় রেকর্ড। তার হাতেই চূর্ণ হয় অজেয় সেনাপতি কিতবুঘার উদ্ধত মন্তক। ভুলুপ্তিত হয় মোঙ্গল শৌর্য, সম্ভ্রম। তৎপরবর্তী একটামাত্র অভিযানেই মুক্ত হয় আল আহসা, উমানসহ গোটা শাম। আর সে একই বছর তিনি বনে যান পুরোদস্তুর মামলুক সুলতান। পয়মন্ত এ বছরই অত্যন্ত ক্ষিপ্ততায় দমন করেন কারাক, গাজা ও হালবের (আলেক্সো) বিদ্রোহ। অবশেষে বছরান্তে ফের মুখোমুখি হন দুর্দমনীয় মোঙ্গল বাহিনীর। প্রমাণ করেন তার নামের যথার্থতা। বাইবার্স-দ্য প্যাঙ্কার।

চেস্টিস খান পুত্র তুলুইর ঔরসজাত হালাকু খানও কোনো সাধারণ স্বাভাবিক ছিলেন না। তিনি শুধু রক্তপিপাসুই নন ছিলেন একজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধাও। তার হাতেই অবসান ঘটে টানা পাঁচশ বছরের ঐতিহ্যবাহী আব্বাসীয় খিলাফাহর। ধ্বংস হয় বাগদাদ। একটিমাত্র গণহত্যায় নিহত হয় ষোল লাখ মুসলিম। দ্বিখণ্ডিত হয় সালজুক রুম সালতানাত। নিশ্চিহ্ন হয় পারস্যের বেসামাল ফেদাইনচক্র। সালজুক, বাইজান্টাইন এমনকি ক্রুসেডাররাও একাধিক প্রচেষ্টায় যে দুর্জয় দুর্গ পদানত করতে পারেনি, সে দুর্ভেদ্য আশ্রিতও তার হাতে বিধ্বস্ত হয়। তিনি এমনই জেদি, এতোটাই একরোখা ছিলেন যে, আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতিকারী পারস্যের সর্বশেষ ফেদাইন দুর্গ ‘গিরদকোহ’কে পদানত না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমৃত্যু অবরুদ্ধ করে রাখেন।

আইন জালুতের মহারণে দুর্ধর্ষ এই হালাকু খান অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি তখন কারাকোরামে। থাকান খান মঙ্গু খানের শেষকৃত্যে। তার অনুপস্থিতিতে তাই আইন জালুতে মোঙ্গল নেতৃত্বের ভার পড়ে অভিজ্ঞ সেনাপতি কিতবুঘার উপর। কিন্তু বীরত্বের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েও তিনি বাইবার্সের সামনে মেরুদণ্ড খাড়া করে দাঁড়াতে পারেননি। যুদ্ধক্ষেত্রেই স্বয়ং বাইবার্সের হাতে কিতবুঘা নিহত হন। মাত্র ১২ হাজার মামলুক সৈন্যের উন্মত্ত কৃপাণে অর্ধ লক্ষাধিক মোঙ্গল সৈন্য অঘোরে কাটা পড়ে। অসহায়ভাবে পুরো মোঙ্গল বাহিনী ধ্বংস হয়ে যায় ‘অখ্যাত’ এক বাইবার্সের তাণ্ডবে!

ইলখানাত শাসক চেঙ্গিস খান পৌত্র হালাকু খানের জন্য এ ছিল মহালজ্জার ব্যাপার। তাই কারাকোরাম থাকাবস্থায়ই আইন জালুতের এ করুণ পরিণতি শুনে ফুঁসে উঠলেন তিনি। মোঙ্গল সাম্রাজ্যের নয়া থাকান খান কুবলাই খানও রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে এর প্রতিকার চাইলেন। হালাকু খান কৈফিয়তের সুরে বললেন: “আমি ছিলাম না, তাই এমন হয়েছে।” হালাকু খান প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্তপ্রায় হয়ে সহসাই মারাগা প্রত্যাবর্তন করলেন। কারাকোরাম থেকেই নিয়ে আসলেন নতুন অথচ কার্যকর এক অস্ত্র ‘কিমিকাজি’। এটা ছিল মোঙ্গল আবিষ্কৃত হাতবোমা। যা অনেকটাই আধুনিক গ্রেনেড সদৃশ। মূলত এটা ছিল মামলুক মিদফা’র জবাবি অস্ত্র। মারাগা পৌঁছেই হালাকু খান তার বিশাল বাহিনী নিয়ে মিশর অভিমুখে রওয়ানা হন। মহানদী ফোরাতে অতিক্রম করে অজেয় মোঙ্গল বাহিনী একসময় আছড়ে পড়লো মামলুক সীমান্তের অভ্যন্তরে। চোখের পলকে হিমস (Homs) পর্যন্ত শামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল হালাকু খান ফের কজা করে নিলেন। শামের বুক চিরে আবার বয়ে চললো রক্ত নহর!

সুলতান বাইবার্স যখন বিদ্রোহ দমিয়ে সিরিয়া সীমান্ত অতিক্রম করে মিশর ঢুকতে যাবেন, ঠিক তখনই খবর এলো হালাকু খান ফোরাতে পাড়ি দিয়ে শাম সীমান্তে হামলে পড়েছেন! সাথে সাথেই বাইবার্স চিতার ক্ষিপ্ততায় আবার শামের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। সোজা হিমসের প্রান্তরে গিয়ে দাঁড়াইলেন স্বয়ং হালাকু খানের মুখোমুখি। এবারে লড়াই হবে খরগোশ-সিংহে। স্তম্ভক বিস্ময়ে দুনিয়া দেখবে দুই না দেখা চিরশত্রুর সম্মুখ সমর! দুই পাহাড়ের টক্করে কেঁপে উঠবে আকাশ-জমীন!

সারকোসিয়া। ককেশাস পর্বতমালার কোন্ অর্ধস্থিত আধুনিক কাজাখস্তানের তুষারাবৃত ছোট্ট এক ভূখণ্ড। সেখানে উদ্ভাস ছিল চেচেন, তাতার, কিপচাক, দাগেস্তানি, কুমানসহ অন্য অনেক জাতিগোষ্ঠীর বাস। যাদের অধিকাংশই ছিল ইসলাম ধর্মাবলম্বী। তীর-তলোয়ার, গুর্জ-বর্শা, অশ্বচালনা ও শারীরিক কসরতে সারকোসিয়ানরা ছিল অবিশ্বাস্য রকম পারঙ্গম। শারীরিক কসরতের অনুষ্ঠান

বুঝাতে আজকাল যে ইংরেজি শব্দের বহুল ব্যবহার, সেই ‘সার্কাস’ এর উৎপত্তি কিন্তু এই সারকোসিয়া থেকেই।

সারকোসিয়ানরা ছিল চরম দুঃসাহসী। প্রাকৃতিকভাবেই এরা ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধাজাত। সেখানে একটা বালককে সে পর্যন্ত পুরুষই ভাবা হতো না, যতোক্ষণ না সে নেকড়ের সাথে লড়ে বিজয়ী হতো। আবার যৌবনকালে এদের পৌরুষের মানদণ্ড হতো একক প্রচেষ্টায় চিতা হত্যা। জার শাসিত রুশ সাম্রাজ্যের দীর্ঘকালীন আতঙ্ক, আধুনিক গেরিলা যুদ্ধের প্রবর্তক, কিংবদন্তির মহানায়ক ইমাম শামিল রাহ. (১৭৯৭-১৮৭১) একলাফে ২৭ ফিট পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারতেন। জানেন! সেই ইমাম শামিলও ছিলেন একজন সারকোসিয়ান।

দুর্ধর্ষ সব যোদ্ধাদের আঁতুড়ঘর এই সারকোসিয়া একটা সময়ে এসে পুরোই চলে যায় মোঙ্গল গ্রাসে। মোঙ্গলরা নারী-পুরুষদের নির্বিচার হত্যা করে শিশু-বালকদের বেচে দিতে থাকে দাস বাজারে। স্বয়ং বাইবার্সও ছিলেন মোঙ্গল কর্তৃক বিক্রি হওয়া কুমান বংশোদ্ভূত একজন সারকোসিয়ান। সহজাত বীরত্বের কারণে মিশরীয় আইয়ুবি সুলতানরা এই সারকোসিয়ানদের কিনে কিনে গঠন করতে থাকেন আলাদা সেনা ইউনিট-মামলুক। ইতিহাসে এরাই বাহরি মামলুক নামে পরিচিত। যাদের মধ্যমণি এখন দ্য প্যাহ্‌রখ্যাৎ বাইবার্স। দুরন্ত এই মামলুকদের নিয়েই বাইবার্স এ পর্যন্ত রচনা করে এসেছেন বিজয়ের অসংখ্য মহাকাব্য। বাইতুল মাকদিস উদ্ধার থেকে আইন জালুতের মহারণ, মাঝে ফরাসি সম্রাট নবম লুইর গ্রেগোরসহ সপ্তম ক্রুসেডের মেরুদণ্ড ভাঙা-সবই মূলত একক মামলুক কৃতিত্ব! এবারে তাদের সামনে আরো একটি যুগ-সন্ধিক্ষণের লড়াইয়ে মামলুক দুটি বিচ্ছুরণের হাতছানি! বড় মঞ্চের চিরন্তন পরীক্ষিত পারফর্মার বাইবার্স এবারও কি পারবেন(?) তার সক্ষমতাকে অমরত্বের দিকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে!

১২৬১ সাল। হিমসের রণাঙ্গন। অবাক বিশ্ব আবার দেখলো মামলুক চমক! মোঙ্গলরা ফের টের পেলো এতোদিন কচুকাটা করে আসা কোটি কোটি আয়েশী মুসলিম আর এই মামলুক মুসলিমরা এক নয়। অথচ হিমসের প্রান্তরে হালাকু খানের মোঙ্গল ফৌজের তুলনায় বাইবার্সের মামলুক বাহিনী ছিল নিতান্তই গণ্য। তার উপর মামলুকরা ছিল টানা যুদ্ধের ধাক্কা ও দীর্ঘ ভ্রমণে নিদারুণ ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। কারণ আইন জালুতের পর দু’দিকই বিশ্রাম না নিয়েই তাদেরকে ১০ দিনে ছুটতে হয়েছে বিদ্রোহ দমনে জর্জান, ফিলিস্তিন ও শামে একাধারে তিনটি বিদ্রোহ দমিয়ে তারা তখন কায়রো ফিরছিল। এমতাবস্থায় মামলুকরা যদিও যুদ্ধের উপযোগী ছিল না, তবুও বীরবল বাইবার্স তার ক্লান্ত-

শ্রান্ত মুষ্টিমেয় সেনা নিয়েই হিমসে অবস্থানরত হালাকু খানের বিপুল প্রস্তুতির বিশাল বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়ালেন। বছর না ঘোরতেই ফের মুখোমুখি দাঁড়ালো মোঙ্গল-মামলুক বাহিনী।

ময়দানে এসেই বাইবার্স তার নিজস্ব পদ্ধতিতে সৈন্য বিন্যাসে লেগে পড়লেন। ডান ও বা প্রান্তে অতি সঙ্গোপনে ভয়ঙ্কর মিদফা (হাতকামান) সজ্জিত দুটি বাহিনী মোতায়ন করলেন। মাঝে দৃশ্যমান হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো স্বয়ং তারই নেতৃত্বাধীন মূল বাহিনী। ময়দানে অল্পসংখ্যক মামলুক সেনা দেখেই মোঙ্গলদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। আইন জালুতের প্রতিশোধ স্পৃহায় হঠাৎ করেই তারা তাদের বিশ্বখ্যাত দূরপাল্লার তীর ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ব্যাপক হামলা শুরু করে। প্রবল এ হামলার তোড়ে পরিকল্পনা মতো মামলুকরা ভেসে যাবার ভান করে। পলায়নপর ভাব দেখিয়ে তারা পিছু হটতে থাকে। ক্রোধাক্ত মোঙ্গলরা আগ-পিছ না ভেবেই মামলুক সেনাদের ধাওয়া করে বসে। একসময় নিজেদের অজান্তেই তারা ফেঁসে যায় বাইবার্সের পাতা ফাঁদে। ধাবমান মোঙ্গল বাহিনীকে দূরদিক থেকে বেষ্টনিতে নিয়ে এসে ভূতের মতোই আচমকা আত্মপ্রকাশ করে বাইবার্সের উভয় গুপ্তবাহিনী। একই সময়ে প্রচণ্ড পরাক্রমে রুখে দাঁড়ালো পলায়নের ভনিতা করা মূল বাহিনীও। এবার তিন দিক থেকে মোঙ্গলদের উপর বৃষ্টির মতো মিদফার অগ্নিগোলো নিষ্ক্ষিপ্ত হতে থাকে। মিদফার ক্রমাগত অগ্নিবৃষ্টির সামনে আবারো বিশ্বত্রাস মোঙ্গল তীর অকেজো প্রমাণিত হলো। মোঙ্গলরা না পারছে আগাতে না পেছাতে, আর না পারছে দূরত্ব ঘুচিয়ে মামলুকদের উপর পাল্টা হামলা করতে। ফলে দূর থেকে নিষ্ক্ষিপ্ত মিদফার গোলায় মোঙ্গলরা অসহায়ভাবে কেবল মারই খেয়ে চললো।

বাইবার্স চালে ফেঁসে গিয়ে ধূর্ত হালাকু খান এবার অনন্যোপায় হয়ে মরণকামড়ই বসালেন। অগ্নিবৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে তিনি আগুনের মধ্য দিয়েই মামলুকদের কাছাকাছি এসে কিমিকাজির (হাতবোমা) ব্যবহার চালিয়ে মিদফার একটা জবাব দিতে চাইলেন এবং একতরফা এ যুদ্ধকে হাতাধতি যুদ্ধের পর্যায়ে নিয়ে আসতে সচেষ্ট হলেন। তার নির্দেশে মোঙ্গলরা একবার বেপরোয়া হয়ে আগুনের উপর দিয়েই আগাতে লাগলো! বাইবার্সও ছেঁড়ে কথা বললেন না। দ্রুত পরিকল্পনা পালটিয়ে এবার মিদফা ছেড়ে আঁড়ধনু দিয়ে তীরবৃষ্টির হুকুম জারি করলেন। কারণ আঁড়ধনুর তীর কখনো একে-বেকে যায় না। ফলে অগ্রসরমান মোঙ্গলরা গণহারে তীরবিদ্ধ হয়ে মাটিতে তড়পাতে লাগলো; কিন্তু এতো ক্ষয়-ক্ষতির পরেও মোঙ্গলরা দমলো না। মামলুকদের কাছাকাছি হতে পাগলের মতো তারা এগিয়েই চললো। অবশেষে বিরাট মূল্য চুকিয়ে তারা মামলুকদের সামনা-সামনি চলেও আসলো। কিন্তু লাভ হলো না কিছুই। এবার



শুরু হলো পেশীশক্তির মহড়া। হাতাহাতি যুদ্ধের এ পর্যায়ে এসে স্বয়ং বাইবার্সের নেতৃত্বে উজ্জীবিত মামলুকরা একসাথে তিনদিক থেকে হতোদ্যম মোঙ্গল সেনাদের উপর বীরবিক্রমে টুটে পড়লো। মামলুক চিতাদের সামনে পড়ে আইন জালুতের পর মোঙ্গলরা এখানেও প্রচণ্ড অসহায়বোধ করলো। চোখে তারা দিব্যি সর্ষেফুল দেখতে লাগলো। কিলিজের নিচে হতাহত হতে-হতে একসময় তাদের জমাট পা-ও টলে উঠলো। শোচনীয় পরাজয় বরণ করে দ্বিধাদিক পালাতে লাগলো শামানবাদী মোঙ্গলরা। হালাকু খান স্বয়ং নেতৃত্ব দিয়েও বাইবার্স ঝড় থামাতে পারলেন না। উল্টো কাপুরুমের মতো তিনিই সর্বাঙ্গে পালিয়ে বাঁচলেন। হালাকুর সব দম্ভোক্তি, সকল অহমিকা মাঠে মার খেলো। উদ্ধত দর্প চূর্ণ হলো তার। এবারো মোঙ্গলদের তাড়িয়ে-তাড়িয়ে বাইবার্স মহানদী ফোরাতে পর্যন্ত গেলেন। যথারীতি মুক্ত করলেন হাতছাড়া হওয়া হিমসসহ শামের বিস্তীর্ণ ভূভাগ। আইন জালুতে পরাজয়ের পর মোঙ্গলদের দাঁড় করানো সব অজুহাত এবার ভেসে গেল। প্রমাণিত হলো আইন জালুতের ফালাফল “ঝড়ে বক মরা”র মতো ছিল না; বরং এটাই নিয়তি। এখন হামেশাই এরকম ঘটবে! দ্বিধাশ্রুত দুনিয়া তাই মেনে নিল বাইবার্সের শ্রেষ্ঠত্ব। হালাকু খান টের পেলেন মামলুক শৌর্যের প্রকৃত উত্তাপ! সাধারণ মোঙ্গলরা হলো বাইবার্স ভয়ে বাতিকশ্রুত। আর মুসলিম মিল্লাতে ফিরে এলো স্বস্তি। মানুষের মন থেকে এবার সম্পূর্ণরূপে উবে গেলো মোঙ্গলভীতি। ছুটে গেলো হালাকুভ্রম! টুটে গেলো ইলখানাত আতঙ্ক!

একদিকে হিমসের প্রান্তরে যখন চলছে মামলুক-মোঙ্গল মহাযুদ্ধ, অপরদিকে মামলুক সালতানাতের গোলযোগপূর্ণ পশ্চিম সীমান্তে তখন চলছে হাস্যকর এক তামাশা। জাবাল আন নাসিরিয়ার পাদদেশে হঠাৎ করেই আবির্ভূত হলো ভুয়া এক ইমাম মাহদি। উগ্র নুসাইরি শিয়াগোষ্ঠী সেখানে শুরু করলো ভয়ঙ্কর অপতৎপরতা। ক্রমেই গোটা শামজুড়ে বিস্তৃত হলো তাদের হুম্মাকির ফিতনার বিষক্রিয়া। যথাসময়ে সুলতান বাইবার্সকে সবকিছু আদ্যোপান্ত অবহিত করা হলো। তাই হিমসের যুদ্ধশেষে এবার তিনি সেদিকেই মনোনিবেশ করলেন। কাহিনীর মূলে যাবার আগে নুসাইরি গোষ্ঠীর অবস্থান ও প্রকৃত স্বরূপ নির্ণিত হওয়া দরকার।

১২৬১ সালে প্রায় গোটা শাম মামলুক সালতানাতের অধীন থাকলেও পশ্চিম শামের প্রায় পুরো ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় অঞ্চল ছিল ক্রুসেডারদের নিয়ন্ত্রণে। তৎসংলগ্ন আল আসি নদী থেকে জাবাল আন নাসিরিয়া পর্যন্ত পূর্বদিকের বিস্তৃত ভূখণ্ড ছিল ফেদাইন গুপ্তঘাতক নিয়ন্ত্রিত রাজ্য। তারও পূর্বে অর্থাৎ জাবাল আন নাসিরিয়ার ঢালু এলাকা ছিল এই ভণ্ড নুসাইরিদের আবাস। এদের উদ্ভাবক

মুহাম্মাদ ইবন নুসাইর হওয়ায় তার নামানুসারেই এদেরকে তখন নুসাইরি বলা হতো। পরবর্তীতে এদের ভ্রান্ত মতবাদ অন্যত্র বিস্তৃত হলেও ইতিহাসে এরা সেই নুসাইরি নামেই পরিচিতি লাভ করে। আধুনিক সিরিয়ায় এখনো এদের ব্যাপক উপস্থিতি বিদ্যমান। কোনো কোনো সূত্রমতে আজকের সিরিয়ায় এদের মোট সংখ্যা প্রায় বিশ লাখ! অবাক করা তথ্য হলো, সুন্নি সংখ্যাগরিষ্ঠ বর্তমান সিরিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতা আঁকড়ে থাকা প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ স্বয়ং এ ভ্রান্ত মতাদর্শী।

নুসাইরিয়া সম্প্রদায় মূলত পথভ্রষ্ট শিয়াদের অসংখ্য ভ্রান্ত ফিরকার নিকৃষ্টতম একটি। নামাজ-রোজার ধার এরা কস্মিনকালেও ধারে না। এরা হযরত আলি রা.কে সরাসরি উপাস্য মানে! একমাত্র আলি রা. বাদে দুনিয়ায় বেহেশতের সু-সংবাদপ্রাপ্ত দশজন পরম সৌভাগ্যবান আসহাবে রাসূল সা.কে এরা প্রচণ্ড ঘৃণা করে! আশারয়ে মুবাশশারার প্রতি এদের ঘৃণার মাত্রা এতই প্রকট যে, এরা দশ সংখ্যাকে উচ্চারণ পর্যন্ত করতো না। প্রয়োজন হলে দশের স্থলে তারা নয় এবং এক বলতো! বিশেষত এরা দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর রা.কে খুবই ঘৃণা করতো। এদের অবাস্তিত এ ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ এভাবে ঘটাতো যে, তাদের কারো নাম উমর তো রাখতো-ই না; এমনকি বরকতময় এ নামটাকে এরা সহ্যও করতে পারতো না। তাই উমর নামের কারো সাথে লেনদেন তো নয়ই, তারা কথা পর্যন্ত বলতো না! নাউযুবিল্লাহ!

আন নাসিরিয়া পাহাড়ের পাদদেশে এই নুসাইরি ভগুরাই ফেদাইন ও ক্রুসেডারদের যৌথ প্রয়োজনায় মঞ্চস্থ করলো রসাত্মক একপ্রস্থ নাটক। নিজেকে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদি দাবি করে হঠাৎ করেই সেখানে জাবালা নামক একব্যক্তির আগমন ঘটলো। সে এসেই নুসাইরি সম্প্রদায়ের নেতৃত্বস্থানীয় লোকদের জড়ো করে তাদের মধ্যে শামের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনভার বণ্টন করে দিলো। বেকুব নুসাইরিরা জাবালার এসব বায়বীয় কথা বিশ্বাসও করে বসে! আরো মজার ব্যাপার হলো, জাবালা সেসব নেতাদের প্রাশাসনিক এই নিযুক্তির সনদ হিসেবে প্রত্যেককে একটি করে জলপাই পাঠের পাতা দিয়ে সকলকেই নির্দিষ্ট শহরের দিকে প্রেরণ করলো। এবং বলে দিলো: “সাফল্যের প্রতীক হিসেবে এই পাতাগুলোকে তোমরা সাথে নিয়ে যাও, এগুলো হচ্ছে তোমাদের নিযুক্তির সনদ।”

মূর্খ নুসাইরিরা সেই পাতা নিয়ে প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট শহরে হাজির হলো এবং নিজেদেরকে নতুন শাসনকর্তা দাবি করে রীতিমত সবক’টি শহরের মালিকানাই চেয়ে বসলো! সুলতান বাইবার্স কর্তৃক নিয়োজিত গভর্নররা নুসাইরিদের কাছে নিযুক্তির সনদ দেখতে চাইলে সেই উন্মাদরা জাবালা কর্তৃক প্রদত্ত জলপাইয়ের

পাতা বের করে দেখায়! প্রত্যেক গভর্নরই পাগলাটে এই কাণ্ডকারখানা দেখে খুবই বিরক্ত হন এবং সেসব পাগলদেরকে কারান্তরীণ করে দেন।

ভণ্ড জাবালা নিজ নায়েবদের এমন করুণ পরিণতি ও অপমানের ঘটনা শুনে মারাত্মক ক্রুদ্ধ হয়। সাথে সাথে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে সকল নুসাইরিদের প্রতি যুদ্ধযাত্রার ফরমান জারি করে। এবার সেই মহাউন্বাদ আরো একটি রসালো তামাশার অবতারণা করে! যুদ্ধের জন্য তরবারির পরিবর্তে প্রত্যেক নুসাইরিকে সে এক প্রকার সুগন্ধি লতা দেয় এবং বলে: “যুদ্ধ আরম্ভ হলে এই লতাই তরবারিতে পরিণত হবে!” চরম উন্বাদের দল নুসাইরি গোষ্ঠী সেই লতা নিয়েই রওয়ানা হয় মুসলিম জনপদের দিকে। এদিকে সুলতান বাইবার্সকে তার গভর্নররা কথিত মাহদির প্রাদুর্ভাব ও নুসাইরি গোষ্ঠীর উপদ্রব সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করলে তিনি তৎক্ষণাৎ অগ্রবর্তী একটা বাহিনী পাঠিয়ে দেন।

নুসাইরি শিয়াগোষ্ঠী প্রতিশোধ গ্রহণে এবারে নিকৃষ্ট একটা পস্থা অবলম্বন করে। জুমআর দিন সকল মুসলিম পুরুষ যখন নামাজরত অবস্থায়; তখন তারা মুসলিমদের ঘর-বাড়িতে হামলা করে বসে। পুরুষশূন্য বাড়িগুলোতে তারা ব্যাপক লুটতরাজ চালায়। সেইসাথে সম্ভ্রান্ত মুসলিম নারীদের শ্রীলতাহানী করে গণহারে। মুসলিমরা নামাজ থেকে ফিরেই নুসাইরিদের তাণ্ডবের জবাবে তাদের উপর মারাত্মক আক্রমণ চালায়। উন্বাদ নুসাইরিরা সেই লতা হাতেই মুসলিমদের মুখোমুখি হয়। পরিণামে কচুকাটা হয় একতরফাভাবে। ইতোমধ্যে সুলতান বাইবার্সের অগ্রবর্তী বাহিনীও ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছে যায়। দামেশক থেকেই বাইবার্স হুকুম জারি করলেন- “নুসাইরি অধ্যুষিত এলাকার সকল যুদ্ধক্ষম পুরুষকে হত্যা করা হবে এবং নারী-শিশু ও বৃদ্ধদেরকে পার্শ্ববর্তী ফেদাইন রাজ্যে তাড়িয়ে দিয়ে মামলুক সালতানাতের পশ্চিম সীমান্ত জঞ্জালমুক্ত করা হোক।”

অবশেষে তাই করা হলো। মামলুকরা প্রায় বিশ হাজার নুসাইরিকে জাহান্নামমুখী হলো। অক্ষমরা যথারীতি চলে গেলো পশ্চিমের ফেদাইন রাজ্যে। এই ফিতনার নাটেরগুরু কথিত ইমাম মাহদি সেই উন্বাদ জাবালাকে সুলতান বাইবার্সের আদেশে কেটে টুকরো টুকরো করে দেয়া হলো। সে কঠোরতার প্রভাবেই কিনা(!) আন নাসিরিয়া পাহাড়ের অভিশপ্ত উপত্যকা আজও নুসাইরি শিয়ামুক্ত!² সুলতান বাইবার্স যখন গোলযোগপূর্ণ শাশ্বতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে চিতাবেগে সসৈন্যে দাপড়ে বেড়াচ্ছেন, তখন দামেশক থাকাবস্থায়ই তার কাছে

২. আস সিলুক লি-মারিফতি দিওয়াল মুলক।

কায়রো থেকে সংবাদ এলো, অধুনালুপ্ত আব্বাসীয় খিলাফাহর সত্যিকারের উত্তরাধিকার খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। খবর পেয়েই তৎক্ষণাৎ তিনি কায়রো পানে ঘোড়া হাঁকালেন। তার জীবনের আরাধ্য একটা স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে চললো বলে! আব্বাসীয় খিলাফাহর পুনঃপ্রতিষ্ঠা!



১২৫৮ সালের কথা। হালাকু খানের হাতে বিধ্বস্ত হয় বাগদাদ। বিলুপ্ত হয় টানা ৫০৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী আব্বাসীয় খিলাফাহ। স্বয়ং খলিফা হন নিহত। নিগৃহীত হয় প্রায় পুরো রাজবংশ। দুজন যুবরাজসহ রাজপরিবারের মাত্রই ক'জন সদস্য রক্ষা পান নির্বিচার এ গণহত্যা থেকে। ছদ্মবেশ নিয়ে এরাই আজ শহর থেকে শহরে নিরন্তর ঘুরে বেড়াচ্ছেন মরু যাযাবরের মতো। তখন পাদপ্রদীপের আড়ালে শামে থাকা বাইবার্সকে এ বর্বরোচিত ধ্বংসযজ্ঞ চেয়ে চেয়েই শুধু দেখতে হয়েছে। নির্বিকার দর্শকের মতোই হজম করতে হয়েছে মোঙ্গল তাণ্ডব। তার যে তখন করার ছিল না কিছুই! সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না; কিন্তু বাগদাদের এমন পরিণতি, খিলাফাহর সঙ্করণ এই পতন বাইবার্স কখনো মেনে নিতে পারেননি। অন্যান্য মুসলিম শাসকেরা তখন নির্বিকার বসে থাকলেও খিলাফাহর পুনঃপ্রবর্তনে তিনি ছিলেন সদা বেকারার, বেচাইন। এ ব্যাপারে কাছের লোকেরা তার হায়-হতাশই কেবল দেখেছে, অন্তরঙ্গ চেষ্টা কখনোই অনুধাবন করেনি।

১২৬০ সালে এসে মহান আল্লাহ তাকে সে সুযোগ এনে দেন। মামলুক সালতানাতের মসনদে সমাসীন হয়েই তিনি দিকে দিকে গোয়েন্দা প্রেরণ করেন। খুঁজতে থাকেন মোঙ্গল তাণ্ডব থেকে বেঁচে গিয়ে ছদ্মাবরণে ঘুরতে থাকা সেই যুবরাজদ্বয়কে। দূরদর্শী বাইবার্স দিব্য অনুধাবন করতে সক্ষম হন, মহান খিলাফাহর ছাতা ব্যতিরেকে ক্ষয়িষ্ণু উম্মাহর অখণ্ড অস্তিত্ব ধরে রাখা অসম্ভব। খিলাফাহর অনুপস্থিতিতে জরাজীর্ণ মিল্লাত হয়ে পড়ছে আরো ঠুনকো। বিশৃঙ্খল, শতধা বিচ্ছিন্ন। অথচ বিধ্বস্ত উম্মাহর এই দুর্দশায় পরিস্থিতিতে তিনি চাইলে স্বয়ং নিজেকেই খলিফা ঘোষণা করতে পারতেন। সে সুযোগ-সামর্থ্য সবই তখন ছিল। এমনকি তার যথাযোগ্য প্রতিপক্ষ হবার মতো কার্যত কেউই সেসময় ছিল না। বাইবার্স সে সুযোগ নিলে মামলুক সালতানাত নয়, নিঃসন্দেহে ইতিহাসে এটা আজ পরিচিত হতে পারতো মামলুক খিলাফাহ বলে। কিন্তু মহৎপ্রাণ

বাইবার্স সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এসবের ধারে-কাছেও গেলেন না। নিজেকে নিয়ে না ভেবে বরং উম্মাহর বৃহৎ চিন্তাই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিল। আর ঠিক এখানেই ফুটে উঠলো তার ব্যতিক্রমী মাহাত্ম্য। জাতিগতপ্রাণ অসামান্য এই মানসিকতার কারণেই ইসলামি ইতিহাসে তিনি আজও বরণ্য এক ব্যক্তিত্ব। জালের মতো স্পাই ছড়িয়ে সুলতান বাইবার্স একসময় আবিষ্কার করে ফেললেন রাজপরিবারের পালিয়ে বেড়ানো সদস্যদের। হিমসের যুদ্ধ শেষে শামে থাকতেই তিনি সংবাদ পেলেন দুজন প্রত্যক্ষ আব্বাসীয় যুবরাজের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তারা হচ্ছেন ৩৫ তম আব্বাসি খলিফা আযযাহির তনয় আবুল কাসিম আহমাদ ও আবুল আব্বাস আহমাদ। সংবাদ পেয়েই সুলতান বাইবার্স দ্রুত মিশরে ফিরে গেলেন। কায়রো এসেই তিনি তাদেরকে মিশরে চলে আসার আমন্ত্রণ জানানলেন। অবশেষে ১২৬২ সালে আবুল কাসিম আহমাদকে আল মুসতানসির বিল্লাহ উপাধি দিয়ে মুসলিম জাহানের খলিফা হিসেবে ঘোষণা করলেন। পূরণ হলো বাইবার্সের ঐকান্তিক এক আকাঙ্ক্ষা। বাইবার্সের তত্ত্বাবধানে নতুন খলিফার অভিষেকও হলো অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে। বাগদাদবাসীর মতো কায়রোবাসীও আব্বাসীয় রীতিতে অভিষিক্ত খলিফাকে বরণ করে নেয়। খলিফা সমাসীন হবার জন্য কায়রোর উন্মুক্ত স্থানে উচ্চাসন স্থাপন করা হয়। আবুল কাসিম আহমাদ তার আসনের দিকে যাওয়ার সময় সুদীর্ঘ এক শোভাযাত্রা তাকে অনুসরণ করলো। মুসলিম ইমামরা কুরআন, খ্রিস্টান পাদ্রীরা বাইবেল, ইয়াহুদি রাব্বিরা ওল্ড টেস্টামেন্ট মাথার উপর দু'হাতে তুলে ধরে নতুন খলিফাকে ঘিরে রেখে অভিষাদন জানালো। বর্ণিল এ শোভাযাত্রার অর্থ ছিল, খলিফা শুধুমাত্র মুসলিমদের নন; বরং সকল প্রজাদেরই ধর্মগুরু। বাস্তবেও তখন এমনই ছিল খলিফার মর্যাদা!

প্রথম দফায় আব্বাসীয় খিলাফাহ চালু ছিল খ্রিস্টীয় ৭৫১ সাল থেকে ১২৫৮ সাল পর্যন্ত। বর্ষপঞ্জির হিসেবে টানা ৫০৭ বছর! বাইবার্স কর্তৃক ১২৬২ সালে মিশরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত এবারের দ্বিতীয় আব্বাসীয় খিলাফাহ টিকে ছিল ২৫৫ বছর। শেষ পর্যন্ত ১৫১৭ সালে এসে উসমানীয় তুর্কি সুলতান সেলিমের হাতে চূড়ান্তভাবে পতন ঘটে মামলুক আশ্রিত আব্বাসীয় খিলাফাহর। দু'পর্ব মিলে আব্বাসীয় খিলাফাহর মোট ব্যাপ্তিকাল ছিল ৭৬২ বছর!

ইসলামি ঐতিহ্যের আবহমান রীতি ছিল খলিফা কর্তৃক সুলতান নিয়োগ। কিন্তু সুলতান বাইবার্স চিরন্তন সে রীতি ভেঙে উল্টো স্বয়ং খলিফাকেই নিয়োগ দেন। বিস্ময়করভাবে পরবর্তীতে আব্বাসীয় খিলাফাহর রক্ষাকবচও হয়ে উঠলো মামলুক সালতানাত।

খলিফাও বাইবার্সের অনন্য এ সততা-ঔদার্যের প্রতিদান দিতে ভুলেননি। তিনি বাইবার্সকে মিশর, শাম, হিজাজ, নাজদ, উত্তর আফ্রিকা ও ইরাকের একাংশের ‘সুলতান’রূপে স্বীকার করে নিলেন। এতে করে বাহুবলে সুলতান হওয়া বাইবার্স এবার বিধিসম্মত সুলতান হিসেবে মামলুক সালতানাতে অধিষ্ঠিত হলেন। কেননা শরিয়াহ মতে, খলিফার অনুমোদনহীন কোনো শাসকই বৈধ নয়।

১২৬২ সাল। কায়রো। বাইবার্সের তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয় দফায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো আক্রাসীয় খিলাফাহ। সাড়ম্বর আয়োজনের মধ্য দিয়ে নতুন খলিফা হিসেবে শপথ নিলেন আবুল কাসিম আহমাদ। অভিষিক্ত হয়েই তিনি ইলখানি মোঙ্গলদের কবল থেকে বাগদাদ পুনরুদ্ধারে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি চাইলেন বাগদাদই ফের হয়ে উঠুক বিশ্বরাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু, খিলাফাহর রাজধানী। সেমতে তিনি বাগদাদে অভিযান চালানোর আবেগপ্রবণ একটা ঘোষণাও দিয়ে বসলেন। বাইবার্সকে দিলেন প্রয়োজনীয় সেনা প্রস্তুতির নির্দেশ। কিন্তু বিচক্ষণ বাইবার্স চাইছিলেন না এফুনি বাগদাদ অভিযান পরিচালিত হোক। বাগদাদ আবার খিলাফাহর রাজধানী হবে, এটাও তিনি মানতে পারছেন না। তার বাসনা ছিল কায়রোই থাকুক ইসলামি দুনিয়ার মারকায। সামরিক শক্তির প্রাণকেন্দ্র। অবশ্য বাইবার্সের এ চাওয়ার পিছনে অনেকগুলো বাস্তবসম্মত কারণও রয়েছে।

প্রথমত বাগদাদ বর্তমানে সরাসরি ইলখানাত শাসনাধীন। মোঙ্গল বাহিনী পরপর দুবার বাইবার্সের হাতে শোচনীয় পরাজিত হলেও হালাকু খান কিন্তু দমে যাননি। দমবার পাত্রও নন তিনি; বরং বাগদাদ রক্ষার পরিকল্পনা নিয়েই তিনি তার বাহিনীকে টেলে সাজাচ্ছেন। বাইবার্সকে মোক্ষম একটা জবাব দিতে দিন-রাত এক করে তিনি কেবল যুদ্ধের ছকই কষছেন। এমতাবস্থায় বাগদাদ হামলা করা মানে সর্বাঙ্গিক ও দীর্ঘমেয়াদি একটা যুদ্ধের সূত্রপাত করা। অথচ এর জন্য চাই উপযুক্ত সময় ও যথাযথ পূর্বপ্রস্তুতি। বর্তমানে যার কোনোটিই নেই মুসলিম বাহিনীর।

দ্বিতীয়ত মোঙ্গল থাবায় বর্তমানে বাগদাদের সেই তিলোত্তম রূপ তো নেই-ই; বরং বলা যায় সেটি আজ শ্রীহীন অনাথ এক বিধ্বস্ত নগরী। বৃহৎ ও শক্তিশালী একটা সাম্রাজ্যের জন্য পূর্বশর্ত হচ্ছে, এর রাজধানী দুর্লভ-অজেয় হওয়া। না হলে নগরবাসীর মনে একটা হীনমন্যতা সবসময়ই বিরাজ করে। যার অনিবার্য কুপ্রভাব সাম্রাজ্যের উপরও পড়ে থাকে। বিধ্বস্ত বাগদাদের সে যোগ্যতা না থাকলেও, কায়রোর পুরোই ছিল! তাছাড়া বর্বর মোঙ্গলরা নগরকন্যা বাগদাদের যেরকম উলঙ্গ সম্ভ্রমহানী করেছিল, সেরকম দুর্ভাগ্যের কলঙ্ক পৃথিবীর খুব কম শহরেরই আছে!

তৃতীয়ত বাগদাদের ভৌগলিক অবস্থান কায়রো থেকে তো বটেই দামেশক থেকেও বহুদূর। বলা যায় ইলখানাতের পেটের ভেতরেই এর স্থিতি। উদ্ধার না হয় করাই গেল; কিন্তু কায়রোর এতোটা দূরত্বে এসে, মোঙ্গল গ্রাসের মুখে বসে খলিফার পক্ষে নির্বিঘ্নে বাগদাদ শাসন চাট্টিখানি কথা নয়। হঠাৎ খলিফা কোনো বিপদে পড়লে বাইবার্স চাইলেই তৎক্ষণাৎ এগিয়ে আসতে পারবেন না। কারণ দূরত্বের বিশালতা। আবার মোঙ্গল জুজু তাড়াতে বাইবার্স সরাসরি নিজেও বাগদাদ শাসন করতে পারবেন না। কারণ খলিফার উপস্থিতি।

এসব নানাবিধ কারণে বাইবার্স দ্বিধা করছিলেন; কিন্তু নিষ্ঠাবান বাইবার্স মন না মানলেও খলিফার আদেশ পালনার্থে ঠিকই সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে ফেললেন। অবশেষে খলিফার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী বাগদাদ অভিমুখে কায়রো ত্যাগ করলো। খলিফাকে বিদায় জানাতে বাইবার্স কিছুদূর পর্যন্ত সাথে চললেন। অতঃপর কায়রো ফিরে আসলেন।

খলিফাকে একা ছেড়ে বাইবার্সের কায়রো ফিরে আসায় অবশ্য যুক্তিও ছিল। যুবরাজ থাকাবস্থায় খলিফা ছিলেন আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। আকর্ষণ ভোগ-বিলাসিতায়ই তিনি প্রতিপালিত হন। বেড়ে উঠেন রাজকীয় জৌলুসে। যুদ্ধ কী জিনিস, কীভাবে করতে হয় তা তিনি আদৌ জানতেন না। নিতান্তই আবেগের বশে তিনি এবারের যুদ্ধযাত্রায় ব্রতী হন। আগ-পিছ না ভেবেই সেনা প্রস্তুতির হুকুম জারি করেন। বাইবার্সও তাই খলিফার সামরিক যোগ্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে তিনি স্বয়ং না গিয়ে খলিফাকে একা ছেড়ে দেন। এর পেছনে বাইবার্সের মূলত দুটি উদ্দেশ্য ছিল-

প্রথমত তিনি ভেবেছিলেন খলিফা মোঙ্গলদের তাড়িয়ে ইলখানাতের কবল থেকে বাগদাদ পুনরুদ্ধার করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে হালাকু খানের পাল্টা হামলার মুখে বাগদাদ রক্ষায় নতুন বাহিনী নিয়ে তিনি তখন খলিফার পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন।

দ্বিতীয়ত বাগদাদ উদ্ধারে খলিফা যদি অগত্যা ব্যর্থ হন, তবে এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে-বাগদাদ শাসনের সক্ষমতা খলিফার আদৌ নেই। তাই তাড়া পরাজিত হলে সে পরাজয়ের শোধ নিতে স্বয়ং তিনি তখন ময়দানে গিয়ে আসবেন।<sup>৩</sup>

তবে এটা সত্য, প্রচলিত ঝুঁকি থাকার পরেও বাইবার্সের অবিবেচনাপ্রসূত এ পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে তার গৌরবোজ্জ্বল জীবনের কলঙ্কজনক একটা কালো অধ্যায় হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে আছে। মুসলিম বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় এবং খলিফার দুঃখজনক নিহত হবার মধ্য দিয়ে পরবর্তীতে যা পরিস্ফুট হয়েছিল!

৩. নুযুম আজজাহির ফি মুলকি মিশর ওয়াল কাহিরাহ।

বাইবার্স থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে খলিফা কিন্তু দমে যাননি। সসৈন্যে তিনি এগিয়ে চললেন বাগদাদ অভিমুখে। অবশেষে মামলুক সীমান্ত অতিক্রম করে তিনি ইলখানাত শাসিত ইরাকে এসে পৌঁছলেন। কিন্তু বিধি বাম! ইরাকে এসেই তার বাহিনী পথ হারিয়ে বসলো। দিগ্বিদিক মাড়িয়ে খলিফার বাহিনী একসময় কারবালা মরুপ্রান্তরে নিজেদের আবিষ্কার করলো!

খলিফার নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনীর বাগদাদমুখী অগ্রযাত্রা-গতিবিধির উপর হালাকু খান আগ থেকেই সজাগ দৃষ্টি রাখছিলেন। যখন তিনি দেখলেন খলিফাকে একা ছেড়ে বাইবার্স কায়রো ফিরে যাচ্ছেন এবং খলিফাও পথ হারিয়ে আঁকুপাঁকু খাচ্ছেন, তখন একে তিনি সুবর্ণ সুযোগ মনে করে সাওয়াদের ইলখানি গভর্নর কারাবুঘাকে কারবালা অভিমুখে সসৈন্যে মার্চ করে বাগদাদমুখী এ বাহিনীকে ধ্বংস করার নির্দেশ দিলেন। আদিষ্ট হয়ে কারাবুঘাও খলিফার ঘাড়ের উপর এসে আচমকা আপতিত হলেন। খলিফা নির্বোধ হলেও কাপুরুষ ছিলেন না মোটেই। তাই সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মামলুক সালতানাতের সীমার ভেতরে তিনি না ঢুকে উল্টো বেপরোয়াভাবে ছুটে চললেন বাগদাদ অভিমুখেই। অথচ মামলুক সীমান্তের অভ্যন্তরে তখন মোঙ্গলদের ঢোকা তো বহুদূর; চোখ তুলে তাকানোর সাহস পর্যন্ত ছিল না।

একপর্যায়ে তিনি কারাবুঘার মুখোমুখি হয়ে গেলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। তখন তিনি নিজেই আগ বেড়ে মোঙ্গলদের উপর আক্রমণ করে বসেন; কিন্তু পঙ্গপাল সদৃশ বিশাল মোঙ্গল বাহিনী এবং কারাবুঘার সামরিক নৈপুণ্যের কাছে অনভিজ্ঞ নেতৃত্বের মুসলিম বাহিনী পেরে উঠবে কেন? বাইবার্সহীন মুসলিম ফৌজ সহসাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো। শোচনীয় পরাজয় বরণ করে খলিফা স্বয়ং ময়দানেই নিহত হলেন। এ সংবাদ বাইবার্সের কানে পৌঁছলে তিনি খুবই ক্রুদ্ধ-ব্যথিত হলেন। আর যা-ই হোক, তিনি খলিফার এমন মর্মান্তিক পরিণতি কখনোই আশা করেননি। তাই তৎক্ষণাৎ তিনি কারাবুঘাকে হত্যা করে খলিফা হত্যার চরম প্রতিশোধ নেবার দৃঢ়সংকল্প করলেন। সেইসাথে নিহত খলিফা মুস্তানসির বিল্লাহর ভাই এবং বর্তমানে একমাত্র জীবন্ত আব্বাসি যুবরাজ আবুল আব্বাস আহমাদকে আল হাকিম উপাধি দিয়ে মুসলিম জাহানের পরবর্তী খলিফা হিসেবে ঘোষণা করলেন। বাইবার্সের তত্ত্বাবধানে মুস্তানসির বিল্লাহর মতো নতুন খলিফাকেও কায়রোবাসী মহাসমাবেশে অভিষিক্ত করে নিল।





সুলতান বাইবার্স। রণাঙ্গনের অমিত তেজি এক যোদ্ধা। তিনি ছিলেন ক্রুসেডের আতঙ্ক। মোঙ্গলদের ভ্রাস। ফেদাইনদের অভিলাপ। তিনি দুশমনের মোকাবেলায় আক্ষরিক অর্থেই ছিলেন দুর্ধর্ষ চিতা। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি অত্যধিক কঠিন প্রকৃতির মানুষ হলেও ব্যক্তিজীবনে ছিলেন খুবই হামদর্দ মনোভাবাপন্ন ও নির্মোহ টাইপের। খলিফার মতো বিরাট সম্মানের একটা পদ সুযোগ থাকতেও না বাগানো; নিশ্চয়ই তার মহত্বের বড় বিজ্ঞাপন। তাই নিজে সুলতান হয়েও স্বয়ং খলিফা নিয়োগের মতো বিরল কর্মকাণ্ডের কারণে ইতিহাসে তিনি আজও আলোচিত, সমাদৃত। মহান আল্লাহ তাকে সম্ভবত রাষ্ট্রের সকল সেক্টরে ইসলামকে বিজয়ী করার জন্যই নির্বাচিত করছিলেন। হয়তো সেজন্যেই তার বর্ণাঢ্য জীবনের বড় একটা অংশ রণাঙ্গনে কাটলেও বাকি অংশ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার কাজেই ওয়াকফ হয়ে যায়।

শুধু রণক্ষেত্রেই নয়; প্রাশাসনিক কর্মকাণ্ডেও তিনি ছিলেন বিশ্বয়জাগানিয়া এক প্রতিভা। তাই সমসাময়িককালে তার মতো রাষ্ট্রচিন্তক ছিল না বললেই চলে। তথ্য, যোগাযোগ, আইন, বিচার, গোয়েন্দাবৃত্তি, সামরিক উদ্ভাবন ও নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে বেশকিছু পদক্ষেপ তাকে মামলুক সালতানাতের আক্ষরিক স্থপতি, মিশরের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান হিসেবে আজও ভাস্বর করে রেখেছে।

সেসময় মামলুক সালতানাতের চারদিকে বিধর্মী রাজ্য হওয়ায় এটি সবসময়ই যুদ্ধঝুঁকির মধ্যে থাকতো। এক সীমান্তের পর আরেক সীমান্তে পালাক্রমে চলতো মোঙ্গল, ক্রুসেডার ও হাশাশিনদের ক্রমাগত উপদ্রব, যুদ্ধের মুহূর্ত। বিচক্ষণ বাইবার্স সহসাই বুঝে নিলেন, সারা রাজ্যের খবর যতো কম সময়ে অবগত হওয়া যাবে ততোই মঙ্গল। এতে আচমকা বিপদের সম্ভাবনাও কম থাকবে। তাই তিনি ক্ষিপ্ৰগতির গোয়েন্দাজাল তৈরি করার সাথে সাথে দ্রুতগতির যোগাযোগ ব্যবস্থারও প্রবর্তন করলেন। যাতে সালতানাতের যে কোনো সীমান্তে অপ্রীতিকর কিছু ঘটলে তৎক্ষণাৎ তিনি অবহিত হতে পারেন। বাস্তবে হয়েছিলও তাই। এটা ছিল সুলতান বাইবার্সের এক অনন্য কীর্তি; যার কল্যাণেই মূলত বাইবার্সের অপ্রতিরোধ্য বিজয়রথ ঝড়োগতিতে পূর্ব-পশ্চিমে ক্রমাগত ছুটেই চলছিল।

সুলতান বাইবার্সের যোগাযোগ ব্যবস্থা এতেই দ্রুত গতিসম্পন্ন ছিল যে, মামলুক সালতানাতেঁর মূল রাজধানী আফ্রিকার কায়রো থেকে এশীয় অংশের রাজধানী দামেশকে পৌঁছতে তার বার্তাবাহকদের সময় লাগতো মাত্র ৬০ ঘণ্টা। এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে এতো দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদান আসলে বাইবার্সের চমৎকার ও অভিনব পন্থায়ই কেবল সম্ভবপর হয়েছিল। তিনি সালতানাতেঁর জায়গায়-জায়গায় টৌকি বসিয়ে নিয়ম করে রেখেছিলেন-বার্তা নিয়ে ছুটতে-ছুটতে গোয়েন্দাদের ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়লে পরবর্তী ফাঁড়িতে ক্লান্ত ঘোড়া ছেড়ে জিনসহ সদা অপেক্ষমাণ তাজাদম ঘোড়ায় চড়ে পুনরায় রওয়ানা হতে হবে। এভাবেই ফাঁড়ির পর ফাঁড়ি থেকে ক্লান্ত ঘোড়া বদলে সবল ঘোড়ায় চড়ে দূর-দূরান্ত থেকে সুলতান বাইবার্সের কাছে দ্রুততার সাথে খবর নিয়ে আসতো তার দূত ও গোয়েন্দারা।

এছাড়া সুলতান বাইবার্সের প্রজাবান্ধব এমন একটি সুকীর্তির সন্ধান ইতিহাসে পাওয়া যায়, যার উদাহরণ তখনকার সময়ে তো বটেই; তথ্য-প্রযুক্তির এই ডিজিটাল যামানায়ও বিরল। সিংহাসনে বসেই তিনি আদেশ জারি করেন- “প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিজ-নিজ প্রদেশের যাবতীয় খবরা-খবর এবং প্রজাদের সকল অভিযোগ-আবেদন প্রতি দুদিন পরপর সুলতানের কাছে অবশ্যই পাঠাবেন।”

বলাবাহুল্য, সুলতানের এই আদেশ সর্বদাই অক্ষরে-অক্ষরে প্রতিপালিত হতো। সুলতানও সেমতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। ফলে তার শাসনামলে কোথাও কোনো উল্লেখযোগ্য গণঅসন্তুষ্ট দানা বাঁধেনি। কুচক্রি ছাড়া বিদ্রোহের চিন্তাও কেউ মাথায় আনতো না। বস্তুত মামলুক সালতানাতবাসীরা সেই মধ্যযুগেও যে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো, আমাদেরকে আজও তা স্বপ্নেই শুধু ভাবতে হচ্ছে!

মিশরের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান হিসেবে আমরা সালাহউদ্দিন আইয়ুবিকেই একবাক্যে মানি। তেমনি সুলতান বাইবার্সও ‘গ্রেট সালাদিন’ খ্যাত সালাহউদ্দিন আইয়ুবি রাহ. থেকেও পিছিয়ে ছিলেন না। সামরিক প্রতিভা-নৈপুণ্যে উভয়ে প্রায় সমানে-সমান। অর্জন-কৃতিত্বেও বাইবার্স কম নন। এখানে সালাহউদ্দিন আইয়ুবিকে খাটো করার মতো কোন দূরভিসন্ধি আমরা নেই; বরং বাইবার্সের চেপে রাখা কৃতিত্বপূর্ণ অর্জনের অধ্যায়কে সামনে নিয়ে আসাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাছাড়া সালাহউদ্দিন আইয়ুবি রাহ. তুলনীয় এক মহান ব্যক্তি এবং মিশরের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন বলেই তার সাথে বাইবার্সের তুলনা আসছে!

সালাহউদ্দিন আইয়ুবি নিঃসন্দেহে ক্রুসেডের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরযোদ্ধা ছিলেন; তেমনি বাইবার্স রাহ.ও অন্যতম বীরশ্রেষ্ঠ ছিলেন। আইয়ুবি নরম-গরমের মিশেল ছিলেন

বলে ক্রুসেডাররা তার হাতে মার খেলেও অনেক ক্ষেত্রেই সীমাহীন মহানুভবতার আনুকূল্যে পার পেয়ে যেতো। ধূর্ত খ্রিস্টানদেরকে পদে-পদে তার ক্ষমাভিক্ষা দেয়াতেই আরব ভূখণ্ড থেকে এদেরকে আমৃত্যু চেষ্টা করেও তিনি সমূলে উৎখাত করতে পারেননি; বরং ইসলামের মহান ক্ষমাকে এরা ঢাল বানিয়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে কেবল জেঁকেই বসেছে। কিন্তু বাইবার্স এদের এ মহামারী রোগ চিহ্নিত করেই নিরবচ্ছিন্ন কড়া প্রেসক্রিপশন লিখে যান। ‘দয়া’ শব্দটাকে অভিধান থেকে ঝেড়ে ফেলে কঠোরতার ওষুধই কেবল চালিয়ে যান। তিনি ক্রুসেডারদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েই ক্রমাগত কঠোর কঠিন প্রক্রিয়ায় এগিয়ে চলতেন। দুর্গের পর দুর্গ শুধু জয় করেই নয়; ক্রুসেডারদের নাপাক এ আখড়াগুলোকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েই তিনি ক্ষ্যাত্ত দেন। সর্বত্র আতঙ্ক ছড়িয়ে তিনি বজ্রাঘাতে উদ্ধার করতে থাকেন একের পর এক হাতছাড়া হওয়া মুসলিম ভূখণ্ড। অবশেষে বাইবার্স ঝড়ে টিকতে না পেরে তারা সম্ভ্রান্ত হয়ে ফিরে যায় নিজেদের সীমানায়, ইউরোপে। মুহূর্মুহ ক্রুসেড ঘোষণা দিয়ে ভুলেও তারা আর পূর্বমুখী হয়নি। বাইবার্স ঝড়েই মূলত সমাপ্ত হয় টানা দুশত বছরের রক্তস্নাত ক্রুসেড। বাইবার্স খ্রিস্টীয় মানসে ভীতিকর ত্রাস না ছড়ালে হয়তো অনন্তকাল চলতো অভিশপ্ত এ ক্রুসেড!

তৎকালীন দুই বিশ্বশক্তি মোঙ্গল ও ক্রুসেডারদেরকে বাইবার্স যুগপৎ সফল মোকাবেলা করেন। উভয় পরাশক্তির যুদ্ধসাধ তিনি জনমের তরে মিটিয়ে দেন। মোঙ্গল ধুমকেতু ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ থেকে হঠাৎ হারিয়ে গেলেও খ্রিস্টানরা সে দুঃসহ স্মৃতি আজও বয়ে বেড়াচ্ছে। বাইবার্স ত্রাস তাই পুরো খ্রিস্টজগতের মন-মগজে স্থায়ীভাবে জায়গা করে নেয়। ফলে বাইবার্সকে খ্রিস্টীয় ইউরোপ আজও মারাত্মক ঘণার চোখে দেখে থাকে। সযত্নে এড়িয়ে চলে। একারণেই ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা বরাবরই নিজেদের বর্বরতার নিকৃষ্টতম ইতিহাস চেপে গিয়ে বাইবার্সের কঠোরতাকে হাইলাইট করার প্রাণান্ত কসরত করে গিয়েছেন। বোধহয় সেজন্যেই বাইবার্সের কালজয়ী সব উপাখ্যান মহাকাব্যের আন্তরণে অনেকটাই চাপা পড়ে গিয়েছে!

শুধু সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়; প্রাশাসনিক ক্ষেত্রেও বাইবার্স এমন কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যা তাকে দিয়েছিল শ্রেষ্ঠ সালাহউদ্দিন আইয়ুবির পরই মিশরের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সুলতানের অসুখ্য মর্যাদা। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ব্যক্তিজীবনে ছিলেন পূত-পবিত্র, উন্নত চরিত্রের একজন মানুষ। মদ, জুয়া, ব্যভিচার, বিলাসিতাকে তিনি প্রচণ্ড ঘণা করতেন; কিন্তু কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, আইয়ুবীয় বিশাল সালতানাতে এমনকি তার শাসনামলেও মদ্যপান, বেশ্যাবৃত্তি ও জুয়া নিষিদ্ধ ছিল না। তবে তাঁর সময়ে শুধুমাত্র সামরিক

বাহিনী ও প্রশাসনে এগুলো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। এক্ষেত্রে সুলতান বাইবার্স'র নীতি ছিল খুবই কঠিন। মসনদে আরোহণের প্রথম বছরেই বাইবার্স শুধু জনপ্রশাসন ও সেনাবাহিনীতেই নয়; গোটা মামলুক সালতানাতের সর্বত্র সবার জন্য মদ-জুয়া, পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। জনসাধারণ যেহেতু বাইবার্সের কড়াকড়ি সম্পর্কে আগ থেকেই জানতো তাই এ বিষয়ে কোনোরকম জোর-জবরদস্তি ছাড়াই তারা মারাত্মক এ তিনটি পাপ থেকে নিজেরাই নিবৃত্ত হয়ে যায়। ফলে মামলুক সালতানাতও এসব নষ্টামি থেকে সহসাই মুক্ত হয়ে যায়।<sup>৪</sup>

সুলতান বাইবার্সের আরেকটি অমর কীর্তি নিঃসন্দেহে তাকে আলাদা মাহাত্ম্য দিয়েছে। সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবি ছিলেন শাফিয়ি মাযহাবপন্থী। তাই সালতানাতের আদালতগুলোতে বিচারকার্যের জন্য তিনি শাফিয়ি কাজিদের সাথে শুধু মালিকি কাজি নিযুক্ত করেন। অর্থাৎ মাযহাব চতুষ্টয়ের মধ্যে পরিষ্কার মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও হানাফি ও হাম্বলি মাযহাবের অনুসারীদের বিচার-মুকাদ্দামা শাফিয়ি ও মালিকি মাযহাবের আইন অনুসারেই চলতো। এমনকি সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবি অন্যতম প্রধান দুটি মাযহাবকে পাশ কাটিয়ে কেবল শাফিয়ি ও মালিকি মাযহাবকেই রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করেন। প্রকারান্তরে যা ছিল অপর দুটি মাযহাবের প্রত্যক্ষ অবহেলার নামান্তর।<sup>৫</sup>

পক্ষান্তরে সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স ছিলেন আপাদমস্তক হানাফি মাযহাবভুক্ত। তথাপি তিনি শুধু তার নিজস্ব মাযহাবকেই স্বীকৃতি দিলেন না; বরং মামলুক সালতানাতের প্রত্যেক আদালতে একসাথে চার মাযহাব থেকেই কাজি নিয়োগের বিধান চালু করেন। এতে সকল মাযহাবের অনুসারীরাই স্ব-স্ব ফিকহ অনুযায়ী বিচার পেতে শুরু করলো। ফলে মিশরের ইতিহাসে এই প্রথম একই সাথে চার মাযহাব স্বীকৃতি পেলো।<sup>৬</sup>

কারণ সুলতান বাইবার্স জানতেন, আহলুসস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের বিশুদ্ধ আকিদা মতে হানাফি, শাফিয়ি, মালিকি ও হাম্বলি এ চার মাযহাবই সহিহ। একটিকেও বাতিল বলা, এড়িয়ে যাওয়া বা নিষিদ্ধ করার কোনোই সুযোগ নেই। মহামহিম রবের আ'লা মহান সুলতান বাইবার্সের মাকবারাহকে রহমতের অনিঃশেষ বারিধারায়, স্বর্গীয় প্রশান্তির ফল্লুধারায় চিরন্তন সিক্ত-সজীব রাখুন! আমিন।

৪. আস সিলুক লি-মারিফাতি দিওয়াল মুলক, ১ম খণ্ড।

৫. হসনা আল মুহাদারা আখবারুল মিসরি ওয়াল কাহিরাহ, ২য় খণ্ড।

৬. তারিখুল মালিক আজ জাহির।



১২৬২ সাল। আবুল আক্বাস আহমাদকে খলিফা মনোনীত করেই সুলতান বাইবার্স এবারে মনোনিবেশ করলেন সিরওর্দার দূতের দিকে। যে কিনা মোঙ্গল বংশোদ্ভূত ইউরোপের মুসলিম শাহানশাহ বার্কের খানের তরফ থেকে বেশ কিছুদিন আগেই মৈত্রীর প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। ব্যস্ততার কারণে বাইবার্স এতোদিন এ নিয়ে ভাবতেও পারেননি। এবার মওকা মিলতেই বার্কের খানের দূতকে তিনি ডেকে পাঠালেন। মামলুক-সিরওর্দা মৈত্রীচুক্তির আলোচনায় আসার আগে এর পটভূমি একটু পিছন ফিরে দেখা যাক-

তখন ১২৬০ সাল। সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স মামলুক সিংহাসনে বসেই সিরওর্দার মুসলিম শাহানশাহ বার্কের খানকে বাইবার্সের মাতৃভূমি বৃহত্তর সারকোসিয়ায় ইসলামের আলো প্রজ্জ্বলনের জন্য অভিনন্দন বার্তা ও শুভেচ্ছা বাণী পাঠান। বৃহত্তর এই সারকোসিয়ারই একটি জনপদ কিপচাক। যেখানে বাইবার্সের জন্ম। যা সিরওর্দা খানাভের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। বার্কের খানও বাইবার্সের সৌজন্যের জবাব দিতে ভুলেননি। ১২৬২ সালে বাইবার্স যখন আব্বাসীয় খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন, তখন বার্কের খানও বাইবার্সকে শুভেচ্ছা জানিয়ে উদীয়মান দুই মুসলিম বিশ্বশক্তি সিরওর্দা-মামলুক এর মধ্যে চিরস্থায়ী মৈত্রীর প্রস্তাবসহ দূত পাঠালেন। বার্কের খান বুঝতে পেরেছিলেন, বর্বর মোঙ্গল তুফান যদি কেউ রুখতে পারে; তবে সে মামলুক অথবা সিরওর্দাই হবে। সুলতান বাইবার্স বার্কের খানের মৈত্রীর এ প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করে নিলেন। ফলে মামলুক-সিরওর্দার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হলো কাজিফত মৈত্রীচুক্তি। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বার্কের খান বেশি করে সারকোসিয়ান দাস মিশরের রফতানি করতে লাগলেন। বাইবার্সও দলে দলে সেসব দুর্ধর্ষ দাস কিন্তে নিয়ে তার মামলুক সেনাদল ভারী করতে লাগলেন।

এই সেই বার্কের খান, যিনি প্রচণ্ড মুসলিম বিদ্বেষী চেন্সিস খানের সরাসরি পৌত্র হয়েও ১২৪৮ সালে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ১২৫৭ সালে মোঙ্গল রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যে সবচেয়ে প্রতাপশালী ইউরোপ-এশিয়া বিস্তৃত সিরওর্দা খানাভের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

হালাকু খান কর্তৃক খিলাফাহ ব্যবস্থার বিলুপ্তি এবং বাগদাদ ধ্বংসের কারণে একজন মুসলিম হিসেবে বার্কের খান ছিলেন তার উপর বেজায় রুষ্ট। অবশ্য হালাকু খান এরও আগে থাকান খান মঙ্গুখানের ছত্রছায়ায় বার্কের খানের পৈতৃক

রাজ্য আজারবাইজান জবরদখল করে নেন। যা স্বয়ং চেঙ্গিস খান উত্তরাধিকারসূত্রে জ্যেষ্ঠ পুত্র যোচি খানকে দিয়েছিলেন। এই যোচি খানই হচ্ছেন মহাবীর বাতু খান ও বার্কো খানের পিতা। তাই বার্কো-হালাকুর দ্বন্দ্ব এতোদিন মোঙ্গল সাম্রাজ্যের একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য, তেতো বাস্তবতাই ছিল। হালাকু খানকে শায়েস্তা করতে বার্কো খান এতোদিন ধরে উপযুক্ত সময়-সুযোগের প্রতীক্ষায়ই ছিলেন। বার্কো খান সিরওর্দার সিংহাসনে আরোহণের পর মঙ্গুখানের মৃত্যুর পরপরই ১২৫৯ সালে বাগদাদ ধ্বংসের জন্য তিরস্কার করে আপন চাচাতো ভাই হালাকু খানকে প্রথমে একখানা চরমপত্র পাঠান। কৌশলে হালাকু খানকে চাপে রাখতে সে চরমপত্রে আজারবাইজান ফেরৎ চান। হালাকু খান আজারবাইজান ফেরৎ দিতে অস্বীকার করে মঙ্গুখান পরবর্তী কেন্দ্রীয় খাকান খান কুবলাই খানের কাছে নালিশ করেন। কুবলাই খান হালাকুর পক্ষাবলম্বন করে বার্কোর দাবি অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু বার্কো খান কুবলাই খানকেও পরোয়া করতেন না। এমনতেই কি তিনি মোঙ্গল খানদের মাঝে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন! এমনকি সিরওর্দার সিংহাসনে বসেই তিনি মুসলিম রীতিতে শাহানশাহ উপাধি ধারণ করে কার্যত স্বাধীন খান হিসেবে খাকান খানের কর্তৃত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করে বসেছেন! তাই তিনি কুবলাই খানের বিরোধিতাকে পাত্তাই দিলেন না। উল্টো হালাকু খানের উপর ক্রমাগত চাপ বাড়িয়েই চললেন। সে ধারাবাহিকতায় হালাকু খানকে তিনি ফের চিঠি লিখলেন: “স্বেচ্ছায় আজারবাইজান প্রদান করে আমার কাছে ক্ষমা না চাইলে আমি স্বয়ং তোমাকেই সিংহাসনচ্যুত করব।”

এভাবেই দুই খানের মধ্যে চলতে লাগলো টানা চাপান-উতোর। দুটি মোঙ্গল রাজ্য-মুসলিম সিরওর্দা খানাত ও শামানবাদি ইলখানাভের মাঝে বিরাজ করে চললো একটা শীতল যুদ্ধের আবহ।

এর পরের বছর। ১২৬০ সাল। বাইবার্সের হাতে আইন জালুতে যুদ্ধে পরাজিত হয় হালাকু বাহিনী। কিছুদিন পর বাইবার্সের কাছে হিম্মতের যুদ্ধে আবার পরাজিত হলে হালাকু খানের শক্তি ও সাহস উভয়টাই হ্রাস পায়। ফলে বার্কো খানের মতো প্রবল প্রতাপশালী খানের ক্রমাগত চাপে হালাকু খান একেবারেই মুষড়ে পড়েন। তাই বাধ্য হয়ে ১২৬২ সালে স্বেচ্ছায় তিনি বার্কো খানের হাতে আজারবাইজান তুলে দেন। আর ঠিক এ সময়েই মামলুক-সিরওর্দা মুসলিম মৈত্রী সম্পাদিত হয়। হালাকু খানের জন্য যা ছিল “কাটা গায়ে লবণ ছিটা”র নামান্তর!

বিরূপ পরিস্থিতিতে বার্কো খানের চাপে পড়ে হালাকু খান স্বেচ্ছায় আজারবাইজান হস্তান্তর করলেও এ অপমান তিনি সহজে হজম করতে

পারেননি। তার উপর জানি দুশমন বাইবার্সের সাথে বার্কের দহরম-মহরম, দেদার দাস রফতানি; হালাকু খানকে উন্মাদপ্রায় করে তুললো। হালাকু খান বারবার দাস রফতানি বন্ধের অনুরোধ করলেও বার্ক খান সেসব কানেই তুললেন না; বরং রফতানির মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলেন। এমনকি হালাকু খানকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বললেন: “মোঙ্গলরা নিজেদের তরবারিতেই মরবে! যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকতাম, তাহলে গোটা বিশ্ব আমাদের পদানত হতো।” উল্লেখ্য, বার্কের দৃষ্টিতে ঐক্যবদ্ধ হবার অর্থই হচ্ছে—সকল মোঙ্গলের ইসলাম গ্রহণ। বার্ক খানের এ আহ্বানে হালাকু খান প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ, বিরক্ত ও অপমানিত হলেন। তাই তিনি ফের পুরো মোঙ্গল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় খাকান খান কুবলাই খানের দ্বারস্থ হলেন। কুবলাই খানও এবার একটা দফারফার মনস্থ করলেন। কারণ বার্ক খানের ইসলাম গ্রহণ এবং কেন্দ্রীয় কমান্ড থেকে বেরিয়ে সিরওদার অঘোষিত স্বাধীনতাকে তিনি ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তাছাড়া কেন্দ্রের বাইরে সুবিশাল চারটি মোঙ্গল রাজ্যের মধ্যে একমাত্র হালাকু খান শাসিত ইলখানাতেই কুবলাই খানের পূর্ণ অনুগত। আবার সবচে’ বেশি অবাধ্য হচ্ছে বার্ক খান অধীনস্থ এই সিরওদা খানাতেই। তাই বার্ক খানকে শাস্ত দেওয়া করতে কুবলাই খান আর কালবিলম্ব করলেন না। বিশাল এক রাজকীয় বাহিনী দিয়ে হালাকু খানকে সরাসরি সাহায্য করলেন।

কেন্দ্রের সাহায্য ও সমর্থন পেয়ে হালাকু খান এবার স্বরূপে আবির্ভূত হলেন। একলক্ষ চীনা মোঙ্গল ও ইলখানি পারস্য সৈন্যের বিশাল যৌথবাহিনী নিয়ে তিনি ককেশাস পর্বতমালার বরফাচ্ছাদিত বুক চিড়ে ধেয়ে চললেন। এদিকে বার্ক খান হালাকু খানের এ বিপুল রণসাজকে মোটেই পাত্তা দিলেন না। কারণ তিনি নিজের সক্ষমতা এবং কসাই হালাকুর সামর্থের সর্বোচ্চ দৌড় ভালোই জানতেন। তাছাড়া তার কাছে এ যুদ্ধের গুরুত্ব পোশাকি বৈ নয়। কেননা বার্ক খান মূলত বাগদাদ গণহত্যার প্রতিশোধ নিতেই হালাকু খানের উপর একটা যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন। আর এজন্যেই আজারবাইজান ইস্যু সামনে নিয়ে এসেছিলেন। যাতে অন্যান্য মোঙ্গল রাজ্য একে অপ্রত্যাশিত ভাবেই নীরব দর্শক সেজে বসে থাকে! প্রথম দফায় হালাকু খান আজারবাইজান ফেরৎ দিয়ে অনিবার্য যুদ্ধটা এড়াতে পারলেও এবার আর পারলেন না। বার্ক খানের পরিকল্পিত যুদ্ধে তাকে নামতেই হলো।

হালাকু খান যখন ককেশাস পেরিয়ে সিরওদার দোরগোড়ায় তেরেখ নদীর তীরে এসে উপনীত হলেন, বার্ক খান তখন ইউরোপীয় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযানে ব্যস্ত। তাই তিনি নিজে না এসে হালাকুর বিরুদ্ধে তার

ভাতিজা নোগাই খানকেই যথেষ্ট মনে করলেন। সেমতে ১২৬৩ সালে তেরেখ নদীর তীরে নোগাই খান ও হালাকু খানের নেতৃত্বাধীন দুটি মোঙ্গল বাহিনী পরস্পরের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। অবশেষে নোগাই খানের হাতে হালাকু খান শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়ে পালিয়ে গেলেন। নোগাই খান হালাকু খানকে ধাওয়া করে সাকারতেলোস অধিকার করে ইলখানি মোঙ্গলদেরকে ইউরোপ থেকে বিতাড়িত করলেন। ঘরে-বাইরে ক্রমাগত প্রচণ্ড মার খেয়ে হালাকু খানের যুদ্ধসাধ এবারে অনেকটাই দমে গেলো। একদিকে বাইবার্স অপরদিকে বার্ক-এ দুয়ের যাঁতায় পিষ্ট হয়ে মুসলিম সীমান্তে যখন খুশি হামলে পড়ার অবাধ শখও হালাকু খানের উবে গেলো। সুলতান বাইবার্সও মোঙ্গল হানা থেকে আপাতত নিষ্কৃতি পেয়ে এবারে মনোনিবেশ করলেন ক্রুসেডারদের দিকে। লেভান্ট (আধুনিক ইসরাইল, ফিলিস্তিন, লেবানন, সিরিয়া ও তুরস্কের ভূমধ্যসাগর উপকূলীয় এন্টীয়ক) থেকে তাদেরকে উৎখাতে তিনি দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হলেন। এবার ক্রুসেডারদের দুর্দিন এলো বলে!



১২৬৩ সাল। ঘরে-বাইরে হালাকু খানের মুহূর্মুহ পরাজয়ে ইলখানি মোঙ্গলদের প্রতিপত্তি অনেকটাই কমে আসে। ইলখানাতে শক্তিশ্রাস এবং সিরওদার সাথে সুলতান বাইবার্সের মৈত্রীচুক্তির ফলে মামলুক সালতানাতে এবার ফিরে এলো কাজক্ষিত শান্তি, বাঞ্ছিত নিরাপত্তা। চিরন্তন যুদ্ধসাজের পরিবর্তে মিশর-সিরিয়াজুড়ে আপাতত শান্তিপূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করলো। বহুদিন পর বাইবার্স তাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কিন্তু কোথায় তিনি একটু নির্ভর হয়ে রাজ্য শাসন করবেন! তা না; বরং নেমে পড়লেন ভয়ঙ্কর আরো একটি সর্বাঙ্গিক যুদ্ধের ছক কষায়! এবারের টার্গেট ক্রুসেডার। লেভান্টেই মুসলিম ভূখণ্ডের জায়গায়-জায়গায় অষ্টোপাশের মতো দীর্ঘদিন থেকে জেঁকে বসা নাপাক খ্রিস্টানদের সমূলে উৎখাতই তার অভিষ্ট লক্ষ্য। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, লেভান্ট অঞ্চলে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা মুসলিম রাজ্যগুলোর বিনাশ সাধন না করলে মুসলিম দুনিয়ার প্রকৃত শান্তি সুদূরপর্যন্ত। কারণ তখন ক্রুসেডারদের আক্ষারায় মোঙ্গলরা, আবার মোঙ্গলদের ছত্রছায়ায় ক্রুসেডাররা এ অঞ্চলে সততই অশান্তির বিষবাস্প ছড়িয়ে আসছিল।



সেসময় ক্রুসেডাররা বর্বর মোঙ্গলদের সাথে নির্লজ্জ আঁতাতে মাধ্যমে নিজেদের অসৎ প্রতিহিংসা চরিতার্থের প্রয়াসও চালায়। আর ঘৃণ্য এ আঁতাতে কারণেই বর্বর হালাকু খানের হাতে পুরো ইরাক-সিরিয়া বিধ্বস্ত হলেও খ্রিস্টানরা সর্বত্রই বহাল তবীয়তে থেকে যায়। এমনকি ইরাক-সিরিয়া অভিযানে হালাকু খানকে সরাসরি সেনা দিয়ে সাহায্য করে সিলিসিয়া, জর্জিয়া, আর্মেনিয়াসহ ইউরোপের খ্রিস্টানরা। কী আশ্চর্য! বাগদাদের কসাইখ্যাত মোঙ্গল সেনাপতি স্বয়ং কিতবুখা নোয়নও ছিলেন একজন খ্রিস্টান।

ক্রুসেডারদের প্রতি সুলতান বাইবার্সের সীমাহীন কঠোরতার অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে, এতোদিন ক্রুসেডের গতি-প্রকৃতি ছিল একরকম; কিন্তু বাইবার্সের সময়ে এসে ক্রুসেডের চিরচেনা সেই রূপটাই পাণ্টে যায়। ইমাদউদ্দিন জঙ্গি থেকে নুরউদ্দিন জঙ্গি হয়ে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী পর্যন্ত ক্রুসেডের ধরণ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তখন প্রায় একই ধাঁচে পরিচালিত হতো একের পর এক সিরিজ ক্রুসেড। অর্থাৎ খ্রিস্টানরা হেরে গেলে দমে না গিয়ে নিজেদের শক্তিতেই সাথে সাথে তারা আবার ক্রুসেড ঘোষণা করতো। ইউরোপজুড়ে শুরু হতো তোলপাড়। সাজ সাজ রব উঠতো পুরো খ্রিস্টজগতে। অথচ খ্রিস্টানদের বাইরে সেই ক্রুসেডে অন্য কোনো শক্তির অংশীদারিত্ব থাকতো না। খ্রিস্টানরা বরং নিজেদের মতো করে বারবার একাই ক্রুসেডের চ্যালেঞ্জ নিতো। তাই মুসলিম শক্তিকেও শ্রেফ খ্রিস্টানদেরই মোকাবেলা করতে হতো। কিন্তু সুলতান বাইবার্সের সময়ে এসে সে চিত্রনাট্য পুরোই পাণ্টে যায়। একমুখী এ ক্রুসেডই এবার ত্রিমুখী ক্রুসেডে পরিবর্তিত হয়। এসময়ে খ্রিস্টানরা বর্বর মোঙ্গলদের গোলামি মেনে নিয়ে নিকৃষ্ট আঁতাতে মাধ্যমে তাদেরকেও টেনে আনে রক্তস্নাত এ ক্রুসেডে। এমনকি রক্তপায়ী ভাড়াটে হাশাশিনদেরকেও ব্যবহার করতে তারা কসুর করেনি। ফলে মুসলিম বাহিনী একইসাথে ভয়ঙ্কর তিনটি বিশ্বশক্তির রোষের শিকার হয়। বেকায়দায় পড়ে যায় সমগ্র মুসলিম জাহান।

সুলতান বাইবার্স ইলখানি মোঙ্গলদের কোমর ভেঙ্গে দিয়ে এবার তাই ক্রুসেডারদের প্রতি সরোষে পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তিনি লেভান্টের মানচিত্রে নজর বুলিয়ে দেখলেন, ভূমধ্যসাগরের প্রায় পুরো উপকূল খ্রিস্টানদের জবরদখলে রয়েছে। ফলে মুসলিম নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোর ভূমধ্যসাগরে নামার পথ চিররুদ্ধই হয়ে আছে। ভাবলেন, মুসলিম ভূখণ্ডগুলোর এ বন্দিদশার অবসানে লেভান্ট থেকে ক্রুসেডের বিধ্বংস উপড়ে ফেলা বর্তমান সময়ের অপরিহার্য দাবি। এ দাবি উপেক্ষা করে বসে থাকার মতো মানুষ বাইবার্স ছিলেন না। তাই শহরের পর শহর থেকে ভেড়া-বকরির মতো নির্মমভাবে তাড়াতে শুরু

করলেন দখলদার ক্রুসেডারদেরকে। প্রথমেই তিনি পাখির চোখ করলেন যিশুখ্রিস্টের তীর্থভূমি নাজারেথকে।

সুলতান বাইবার্স যখন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গিক অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে দেখা দিলেন আইয়ুবীয় শাহজাদা মুগিস। যিনি ছিলেন মামলুক সালতানাতেরই করদরাজ্য আল কারাকের গভর্নর। ঝোপ বুঝে কোপ মারার মতোই তিনি তখন বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুলে ধরলেন। এই সেই মুগিস, যিনি সুলতান বাইবার্স সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথেই অন্যান্য আমিরদের সাথে ইতিপূর্বে আরো একবার বিদ্রোহী হয়েছিলেন। সুলতান বাইবার্স তখন ঘোষণা করেছিলেন: “যে আত্মসমর্পণ করবে তাকে ক্ষমা করা হবে, অন্যথায় কঠিন পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।” বাইবার্সের চরম এই ঘোষণায় গাজার শামসুদ্দিন ও হালবের আলাম উদ্দিন সানজার কোনোই কর্ণপাত করেননি। ফলে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এরা উভয়েই নিহত হন। এ অবস্থাদৃষ্টে মুগিস ভীত হয়ে বাইবার্সের আনুগত্য কবুল করে নেন। সহনশীল বাইবার্স তাকে শুধু ক্ষমাই করেননি; কারাকের আমির হিসেবেও পুনর্বহাল করেন।

অথচ নিম্ন মানসিকতার মুগিস আদৌ এ করুণার যোগ্য ছিলেন না। যার প্রমাণ মুগিস নিজেই দিলেন সুলতান বাইবার্স ও উম্মাহর কঠিন এ সঙ্কটকালে এসে। বাইবার্স যখন ক্রুসেড বিরোধী অভিযানে নামতে যাবেন, তখন মুগিস তাকে বিভ্রান্ত করতে খ্রিস্টানদের সাথে গোপন আঁতাত শুরু করেন। তিনি অত্যন্ত নীচু প্রক্রিয়ায় সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ আল কারাকের শাসনভার ক্রুসেডারদের হাতে তুলে দেন এবং নির্লজ্জভাবে তিনি আশ্রিত অবস্থায় খোদ আল কারাকেই থেকে যান। বাইবার্সের কানে এ সংবাদ আসতে দেরি হয়নি মুহূর্তকাল। বিশ্বাসঘাতক মুগিসকে তার প্রাপ্য প্রতিফল বুঝিয়ে দিতে তিনি তাই নাজারেথ অভিযান বিলম্বিত করে তৎক্ষণাত্ কারাক অভিমুখে সেনাবাহিনী মার্চ করলেন।

ক্রুসেডার ও আইয়ুবীয় গাদ্দাররা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল সুলতান বাইবার্স এই সংবাদ পাওয়ামাত্রই ক্রুদ্ধ হয়ে কারাক অভিমুখে ছুটে আসবেন। বাইবার্সকে স্বাগত জানাতে তারা তাই জর্দান নদীর তীরে কায়রো দূর্গের পশ্চিমের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেক স্থানে প্রয়োজনীয় সেনাবাহিনী মোতায়েন করে রাখলো। কারণ কায়রো থেকে কারাক আসতে স্বাভাবিক অবস্থায় এ পথই ব্যবহার করতে হয়। বিকল্প পথের ব্যবহার দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্যই শুধু নয়, প্রায় অসম্ভবও। কিন্তু বাইবার্স ছিলেন চালাকের একশেষ। রণাঙ্গনের নিপুণ ওস্তাদ! তিনি দুষমনদের হতবাক করে দিয়ে ওয়াদি আল জায়েব অতিক্রম করে মা'ন হয়ে কারাকের দিকে রওয়ানা

হলেন। ক্রুসেডাররা বুঝে নিল বাইবার্স নিশ্চয়ই দুর্গম পূর্ব দিক দিয়ে ঘুরপথে কারাক আক্রমণ করবেন। এবার তারাও তাদের গুঁৎ পেতে রাখা পুরো বাহিনীকে পূর্ব দিকে নিয়ে আসলো; কিন্তু বাইবার্সের দূরদর্শিতা ও সেনা পরিচালনার বিচক্ষণতা সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। বাইবার্স তার রুখ এবারে উত্তরে ঘুরিয়ে নিলেন এবং সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে পশ্চিম দিক থেকেই কারাকের উপর অকস্মাৎ টুটে পড়লেন।

১২৬৩ সালে সুলতান বাইবার্স ক্রুসেডার ও আইয়ুবীয়দের যৌথ বাহিনীকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করে কারাক পুনরুদ্ধার করে নিলেন। নিমকহারাম মুগিসকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। কারাকের সমস্ত বিদ্রোহী সৈন্যকে বিদ্রোহের শাস্তিস্বরূপ হত্যা করা হলো। সহসাই নির্বাপিত হলো বিদ্রোহের বহিঃশিখা।

খ্রিস্টান খবরদারি এবং মুগিসের অপশাসনে অতিষ্ঠ কারাকবাসী এবার হাফ ছেড়ে বাঁচলো। সুলতান বাইবার্সকে তারা তাই সাদরে বরণ করে নিল। বাইবার্স এবার কারাকের ভৌগলিক গুরুত্ব বিবেচনায় এর সংস্কার প্রক্রিয়ায় মনোযোগ দিলেন। একে গড়ে তুললেন দুর্ভেদ্য ও আধুনিক এক নগরী হিসেবে।

সুলতান বাইবার্স যুদ্ধশেষেই কারাকের স্থানে স্থানে গোলাকার বুর্জ নির্মাণ করে কারাকের প্রতিরক্ষাকে আরও শক্তভাবে গড়ে তুললেন। দুর্গ সংস্কার ও সম্প্রসারণ করে এর নতুন সিংহদ্বারও নির্মাণ করলেন। সেই সাথে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ফিলিস্তিনের সাথে তিনি জর্দানের সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করলেন। সে উদ্দেশ্যেই জর্দান নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণ করলেন। ফলে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা ও রসদ সরবরাহে প্রভূত সুবিধা অর্জিত হলো। এতে করে মামলুক সালতানাতের গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিচ্ছিন্ন অংশও সংযুক্ত হলো।

অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমিয়ে এবং কারাকের পুনর্গঠন প্রক্রিয়া সেরেই সুলতান বাইবার্স এবার তার পূর্ব সংকল্পে মনোনিবেশ করলেন। এবারে তিনি চাইলেন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান পরিচালনা করতে! তিনি ঘোষণা দিলেন: “এখন থেকে প্রতি বছরই ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করবো—ইনশাআল্লাহ!” অবশ্য বাইবার্স তার কতটা শুয়াদায় অটল থাকতে পারেননি। এর মানে এই নয় যে, তিনি কোনো অভিযানই পরিচালনা করেননি বা মাঝে-মধ্যেই যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়েছিলেন! কিন্তু এরপর থেকে তিনি মাস-বছর ভুলে ক্রমাগত শুধু ক্রুসেড বিরোধী অভিযানই পরিচালনা করে গিয়েছেন! তাই প্রতি বছর নয়; ক্রুসেডারদেরকে বিধ্বস্ত না করা পর্যন্ত প্রকারান্তরে তিনি প্রতি মাসেই নতুন নতুন যুদ্ধে জড়িয়েছেন। এবার দেখা যাক, ‘দ্য প্যাছার’ এর প্রথম শিকার কে!



নাজারেথ। আধুনিক ইসরাইলের প্রাচীনতম একটি শহর। খ্রিস্টানদের কাছে শহরটির গুরুত্ব অপরিমেয়। তামাম খ্রিস্টজগতের কাছেই এটি ছিল ‘মক্কা’ সমতুল্য। কারণ এটি হচ্ছে ঈসা রুহুল্লাহ আ.’র কুমারী মাতা হযরত মারইয়াম আ.’র নিজ শহর। এ শহরের আলো-বাতাসেই তিনি বেড়ে ওঠেছেন। মারইয়াম আ.’র পূণ্য স্মৃতিবিজড়িত কুরআন বর্ণিত সেই ঝর্ণা আজও দেখা যায় এই নাজারেথে। স্বয়ং ঈসা রুহুল্লাহ আ. এ শহরেই তার মায়ের বাড়িতে প্রতিপালিত হয়েছেন। তাই শহরের নামকরণও হয়েছে ঈসা আ.’রই নামে। নামকরণের ব্যাপারটা একটু জটিল, তাই খোলাসা করেই বলছি।

ঈসা আ.কে ল্যাটিন ভাষায় অনেকেই জেসাস (Jesus) নামে ডাকতো। যার অর্থ ত্রাণকর্তা। এই জেসাস শব্দের আরবি প্রতিশব্দই হচ্ছে আন নাসির। কেননা আরবিতে নাসির অর্থও ত্রাণকর্তা, সহায়ক। তাই ঈসা আ.’র প্রচলিত আরেক আরবি নাম ছিল আন নাসির। সে হিসেবেই ঈসা আ.’র অনুসারীদেরকে আরবিতে নাসারা বলা হয়। আর ‘খ্রিস্টান’ শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ ক্রাইস্ট (Christ) থেকে। যার অর্থও ত্রাণকর্তা, নাসারার সমার্থক। তাই ল্যাটিন ভাষায় ত্রাণকর্তার অনুসারীদেরকে ক্রাইস্টিয়ান বলা হয়। এর বিকৃত রূপই হচ্ছে আজকের খ্রিস্টিয়ান/খ্রিস্টান।

যেহেতু ঈসা আ.’র অপর নাম আন নাসির ছিল, সেহেতু দীর্ঘকাল ধরেই আরবিতে এ শহরের নাম ছিল আন নাসিরাহ। বর্তমানে যা হিব্রু শব্দ নাজারেথ দ্বারা পরিবর্তিত। আজকের দুনিয়ায় এ নামেই এটি সমধিক পরিচিত।

যাক সে কথা। ১২৪৪ সালে সুলতান আস সালিহর সময়ে খ্রিস্টানদের কবল থেকে মুসলমানরা জেরুসালেম কেড়ে নিলে কিংডম অব জেরুসালেমের প্রাশাসনিক রাজধানী তখন থেকেই আক্কায়ে স্থাপিত হয়। কিন্তু এর ধর্মীয় রাজধানী হয় এই নাজারেথ। সে হিসেবে পুরো খ্রিস্টজগতের কাছে এ শহরের গুরুত্ব ছিল বর্ণনাভীত। সুলতান বাইবার্স তাই প্রথমেই এ শহর কজা করে ক্রুসেডারদের মনোবল ভেঙে দেবার দৃঢ়সংকল্প করেন।

১২৬৩ সাল। কারাকের বিদ্রোহ দমন করেই সুলতান বাইবার্স সোজা নাজারেথের পথ ধরলেন। আচমকা একদিন তিনি শহরের সদর দরজায় সসৈন্যে গিয়ে হাজির হন। দেখতে দেখতেই পরাক্রম মামলুক বাহিনীর হাতে শহরের পতন ঘটে। নাজারেথ খ্রিস্টানদের তীর্থভূমি হওয়ায় এবং দীর্ঘদিন তাদের দখলে

থাকায় শহরের অলিগলিতে এ পরিমাণ গির্জা নির্মিত হয় যে, পুরো শহরটাই গির্জার নগরীতে পরিণত হয়ে যায়। হযরত মারইয়াম ও ঈসা আ.'র পবিত্র স্মৃতিবিজড়িত নাজারেথ শহরে গির্জার বহর দেখে মুসলিম বাহিনী হতবাক হয়ে যায়। গির্জার এ বাহুল্যে সুলতান বাইবার্স খুবই ক্রুদ্ধ হন। তাই তার আদেশে এখানকার প্রধান ও প্রাচীনতম গির্জাকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। আজও এই গির্জার ভিত বাদে কিছুই বাকি নেই। মুসলিম বাহিনীর হাতে নাজারেথের পতনের পর সুলতান বাইবার্স ঘোষণা দেন: “এখন থেকে আর কোনো খ্রিস্টান এই শহরে থাকতে পারবে না। কেবলমাত্র মুসলিম হলেই তাদের নিজ নিজ সম্পত্তিতে বহাল রাখা হবে, না হলে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। যারা যাবে না তাদেরকে বিনা হিসেবে হত্যা করা হতে পারে।”

বাইবার্সের এই ঘোষণায় ভীত-সন্ত্রস্ত খ্রিস্টানরা দলে দলে নাজারেথ ত্যাগ করে। শহরে মুসলিমদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। নাজারেথ উদ্ধারের মধ্যদিয়ে শুরু হলো লেভান্ট থেকে অবৈধ খ্রিস্টান দখলদারিত্বের উচ্ছেদ পর্ব। ক্রুসেডারদের দুর্গতির শুরুও তখন থেকেই।

১২৬৩ সাল। নাজারেথ বিজয় বর্ষ। খ্রিস্টজগত এখনো নাজারেথ হারানোর শোক পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। অথচ সুলতান বাইবার্স এই একই বছর ফের অভিযানে বেরুলেন। এবার চড়াও হলেন খোদ আক্কা। ক্রুসেডারাজ্য কিংডম অব জেরুসালেমের রাজধানী হচ্ছে এই আক্কা। ১২৪৪ সালে দ্বিতীয়বার জেরুসালেম হাতছাড়া হবার পর এই আক্কাতেই (আক্কা) ক্রুসেডাররা পাকাপাকিভাবে রাজধানী ও শক্তির প্রাণকেন্দ্র বানিয়ে নেয়। এটা সেই আক্কা যার পাদদেশে হাজারো মুজাহিদের কবরের চিহ্ন আজও বিদ্যমান। ১১৮৭ সালে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবির নেতৃত্বে প্রথমবার জেরুসালেম মুক্ত হলে পুরো ইউরোপজুড়ে শুরু হয় তোলপাড়, মাতম। তৃতীয় ক্রুসেডের ঘোষণা দিয়ে মাঠে নেমে আসেন স্বয়ং ইংরেজ সম্রাট রিচার্ড দ্য লায়নহার্ট। প্রচণ্ড ধর্মীয় যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ক্রুসেডাররা দখল করে নেয় আক্কা। আইয়ুবীয় সেনারা শেষ রক্তবিন্দু জমিনে ঢেলে মাসের পর মাস তুমুল প্রতিরোধ গড়েও আক্কার পতন ঠেকাতে পারেনি। সেনা স্বল্পতা এবং জেরুসালেম রক্ষার চ্যালেঞ্জ থাকায় সুলতান আইয়ুবিকে আক্কার হৃদয়ভাঙা এ হার চেয়ে চেয়েই শুধু দেখতে হয়েছে! অবশেষে উন্মত্ত ক্রুসেডারদের থামাতে ১১৮৯ সালে বাধ্য হয়ে তাকে রমলা চুক্তিতে আসতে হয়। একমাত্র জেরুসালেম রক্ষার খাতিরে সে চুক্তিনামায় তাকে আক্কা সহ পুরো লেভান্টের দাবি ছেড়ে দিতে হয়েছে।

হাতিনের মহারণসহ পূর্বাপর টানা যুদ্ধের ধকল, ভয়াবহ সেনা স্বল্পতা, মুসলিম জাহানের অবিম্ব্যকারিতা এবং লাখ-লাখ তাজাদম ক্রুসেডারদের আফালনে

১১৯২ সালে সলাহউদ্দিন আইয়ুবী চোখের জলে যে আক্কা'র দাবি বিসর্জন দিয়েছিলেন, সে আক্কার পাদদেশে দীর্ঘ ৭১ বছর ধরে কোনো মুসলিম বাহিনীর আসার সাহসটুকুও হয়নি! আজ ১২৬৩ সালে 'দ্য প্যাট্রার' সাক্ষাৎ বজ্র হয়েই হাজির হয়েছেন। সুলতান সলাহউদ্দিনের স্বার্থক উত্তরসূরী হিসেবে তারই চোখের পানির দায় শোধাতে সুলতান বাইবার্স আক্কার উপর সরোষে আছড়ে পড়লেন! এবার পুরো খ্রিস্টজগতের নাকের পানি চোখের পানি একাকার হবার পালা।

সুলতান বাইবার্স নাজারেথ বিজয়ের পরপরই যখন আক্কার দুর্গ প্রাচীরে ভূতের মতো আচমকা উদয় হন, তখন পুরো খ্রিস্টজগত হতভম্ব হয়ে যায়! তারা এতোটা দ্রুত আক্কা আক্রমণ আশা করেনি। বাস্তবে রণনিপুণ বাইবার্সেরও আক্কা অভিযান মুখ্য নয়; বরং এটা একটা ক্যামোফ্লেজ। তার আসল টার্গেট আরসুফ। পূর্ব ভূমধ্যসাগরের কোলঘেঁষা কৌশলগত আরসুফ অধিকার করে শাম সাগরে অবাধ প্রবেশের একটা বাতায়ন খোলাই তার মূল উদ্দেশ্য। সে লক্ষ্যেই তিনি আক্কা আক্রমণের ভান করেন। আসলে এটি ছিল তার ভীতি প্রদর্শনমূলক আক্রমণ। উদ্দেশ্য, জেরুসালেম রাজা তৃতীয় কনরাডকে আক্কায়ে ব্যস্ত রাখা। কেননা ক্রুসেডারদের বর্তমান অভিভাবক হালাকু খান তেরেখ তীরে শাহানশাহ বার্কো খানের ভাতিজা সেনাপতি নোগাইয়ের কাছে মাত্রই শোচনীয় পরাজিত হয়ে বিস্তৃত ভূখণ্ড হারিয়েছেন। অপরদিকে বার্কো খানের অপর সেনাপতি বুরানদাই ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের একের পর এক রাজ্য কেড়ে নিয়ে আড্রিয়াটিক সাগর পর্যন্ত দখল করে নিয়েছেন। তাই তৃতীয় কনরাডের এখন আর বাইরের কোনো সাহায্যের আশা নেই। সাহায্য করতে পারতো কেবল ফ্রান্স; কিন্তু ফরাসি সম্রাট নবম লুই আজও মানসুরাহর দুঃস্বপ্ন ভুলতে পারেননি। বাইবার্সের কাছে লজ্জাস্কর পরাজয়ের ক্ষত ফ্রান্সের এখনো সেরে ওঠেনি। ফলে কনরাডকে আক্কায়ে ব্যস্ত রেখে ফাঁকা মাঠে আরসুফ অধিকার রুদ্ধে নিলে মন্দ কী? সে ভাবনাতেই আক্কার উপর পতিত হলো বাইবার্স ঝড়। বাইবার্সের নিখুঁত এ পরিকল্পনা কাজেও দিল বেশ!

সুলতান বাইবার্স আক্কার উপকণ্ঠে পৌঁছতেই রাজা তৃতীয় কনরাড অনুমিতভাবে সসৈন্যে নেমে আসলেন ময়দানে। সেখানে ঝড়ও হলো প্রচণ্ডরকম। কিন্তু বাইবার্স ঝড়ে কনরাড টিকবেন কেন? নবম লুই-হালাকু খানরা যেখানে সততই নাস্তানাবুদ, তামাম রথি-মহারথিরা যেখানে নসি, সেখানে কনরাড কোন ছাড়! সহসাই তিনি রণেভঙ্গ দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালালেন। আশ্রয় নিলেন সুরক্ষিত আক্কা দুর্গে। যথারীতি ধাওয়া করলেন বাইবার্স। মামলুক বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হলো আক্কা দুর্গ। এবার বাইবার্স তার আসল চাল চাললেন। কিছু সৈন্য আক্কার

অবরোধে রেখে বাকিদের নিয়ে সঙ্গোপনে চললেন সাগরপাড়ের আরসুফ অভিযুক্ত। হঠাৎ করেই তিনি উদয় হলেন আরসুফ কেল্লার পাদদেশে। বাইবার্সের অকস্মাৎ উপস্থিতিতে আরসুফের ক্রুসেডাররা বিস্ময়ে থ হয়ে গেলো। কারণ বাইবার্সের যে এখন আক্লা থাকার কথা! খ্রিস্টানদের ঘোর না কাটতেই চিতাগতির বাইবার্স দ্রুতই আরসুফ অবরোধ করে বসলেন।

এই সেই আরসুফ, ১১৯২ সালে যেখানে গাজি সালাহউদ্দিন আইয়ুবী সম্রাট রিচার্ডের হাতে তার জীবনের সর্বশেষ ও সবচে' বড় পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েছিলেন। যেখানে বহু আইয়ুবীয় সৈন্য বীরত্বের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে অকাতরে শহিদ হয়েছিল। যে পরাজয়ের ফলেই রমলা সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে গোটা লেভান্ট তিনি ক্রুসেডারদের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। সুলতান বাইবার্স দীর্ঘ ৭১ বছর পর এসে সুলতান আইয়ুবির সেই করুণ পরাজয়ের শোধ নিলেন সুদে আসলে। আরসুফ কেল্লার দেয়ালগুলো গুঁড়িয়ে দিয়ে ক্রুসেডারদের বানালেন পথের ভিখারী।

১২৬৩ সাল। ২১ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল। টানা এই চল্লিশ দিন বাইবার্স আরসুফ দুর্গ অবরোধ করে রাখলেন। কিন্তু পর্যাপ্ত ক্রুসেড সৈন্য এবং ২৭০ জন নামকরা খ্রিস্টান নাইট দুর্গের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করায় আরসুফের শাসনকর্তা ছিলেন বেজায় আত্মবিশ্বাসী। তাই তিনি আত্মসমর্পণে রাজি হলেন না। এটা দেখে বাইবার্স এবার ক্রুসেডমানসে ভীতি ছড়াতে একখানা চরমপত্র পাঠালেন: “বিনা প্রতিরোধে আত্মসমর্পণ করলে প্রাণে মারা হবে না; কিন্তু আমাকে জোর করতে বাধ্য করলে কাউকেই জীবিত রাখা হবে না।”

ক্রুসেডাররা বাইবার্সকে ভালোই চিনতো, জানতো। তাই তারা অনাগত পরিণতির চিন্তায় ভীত হয়ে অগত্যা আত্মসমর্পণে সম্মত হলো। ফলে অনেকটা বিনা যুদ্ধেই বিজিত হলো আরসুফ। শাম সাগরে (পূর্ব ভূমধ্যসাগর) প্রবেশের একটি দরজা এবার সত্যি খুলতে পারলেন বাইবার্স! আরসুফ বিজয়ের পরই তিনি আক্লা থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের হুকুম দিলেন। কারণ এখনই আক্লা তার টার্গেট নয়। লক্ষ্য বরং শাম সাগরের বিস্তীর্ণ উপকূল। প্রবাসীর নিশানা তাই আতলিত। অঙ্গীকার অনুযায়ী বাইবার্স সাধারণ ক্রুসেডারদেরকে ছেড়ে দিলেও অভিজাত নাইটদের ছাড়লেন না। এদেরকে প্রাণে ধরলেন না ঠিক; কিন্তু এমন এক হুকুম জারি করলেন, যা ছিল পুরো খ্রিস্ট জগতের জন্যই মহালজ্জার ব্যাপার। তিনি ধৃত ২৭০ জন নাইটকেই ধর্ম ঘোষণা করে তাদেরকে হাটে বেচে দিলেন! অথচ সে সময় বীরত্বের জন্য সেরা সৈন্যদেরই নাইট উপাধি দেওয়া হতো। তাদের দেওয়া হতো সব রকমের সুযোগ-সুবিধা, সামরিক সরঞ্জাম। তাদের প্রত্যেকের মর্যাদা, ধনসম্পদ ছিল একেকজন জমিদারের সমতুল্য।

খ্রিস্টানদের বীরত্বের প্রতীক, তাদের শত্রুর পাত্র এই নাইটরাই কিনা দাস হিসেবে প্রকাশ্য হাটে বিক্রি হলো! ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! যারা ছিল জমিদার, তারা প্রত্যেকেই এখন মুসলিমদের চাকরে পরিণত! অবিশ্বাস্য এ কাণ্ডের পর মানুষের মন থেকে খ্রিস্টানদের প্রতি ভয়-সম্মান সবই উবে গেলো। নাইট উপাধিটাই পরিণত হলো হাসির খোরাকে। খ্রিস্টজগতে ছড়িয়ে পড়লো বাইবার্স ত্রাস! পুরো ইউরোপ হয়ে উঠলো আতঙ্কিত, সন্ত্রস্ত।

১২৬৩ সাল। সুলতান বাইবার্স কর্তৃক এই এক বছরেই একাধারে নাজারেথ, আক্কা ও আরসুফ আক্রান্ত হয়। পরের বছর ১২৬৪ সালের শেষ দিকে এসে কিংডম অব জেরুসালেমের আরেকটি ক্রুসেড দুর্গও বাইবার্স হ্যারিকেনের সম্মুখীন হলো। যেটি পবিত্র ভূমিতে আল কারাকের পরই দ্বিতীয় বৃহত্তম ও দুর্ভেদ্য দুর্গ হিসেবে বিবেচিত। নাম তার আতলিত দুর্গ। ক্রুসেডারদের কাছে যা ছেতিউ পেলেরিন (Chateau Pelerin) নামে পরিচিত। ল্যাটিন ভাষায় যার অর্থ তীর্থযাত্রীদের প্রাসাদ-দুর্গ। কেননা জবরদখলকারী হলেও ক্রুসেডাররা নিজেদেরকে পবিত্র জেরুসালেমের তীর্থযাত্রী দাবি করতো! সে থেকেই আতলিত দুর্গের এই নামকরণ। ১২১৮ সালে শাম সাগরের উপকূলীয় বিশাল ভূভাগ নিয়ে এ দুর্গের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়। বছরের পর বছর বিভিন্ন স্থাপনা গড়ে তুলে একে অজেয় ও দুর্ভেদ্য একটা সামরিক ঘাঁটির রূপ দেয়া হয়। দুর্গ ছাড়াও আতলিতের উপকূলীয় খাড়িটিকে পর্যন্ত মজবুত পাঁচিল, বাতিঘর ও বুরুজ নির্মাণ করে দুর্লভ এলাকায় পরিণত করা হয়েছে। তিনদিকে সাগর ও একদিকে স্থলবেষ্টিত এই স্থানটিকে প্রকারান্তরে একটি উপদ্বীপও বলা চলে। বিভিন্ন সামরিক স্থাপনা ছাড়াও অবস্থানগত কারণে এতোদিন এ দুর্গ ছিল অজেয়। নির্মাণের পর থেকে ১২৬৪ সাল পর্যন্ত এ দুর্গ আক্রমণ তো বহুদূর, সে চিন্তাও কেউ কোনোদিন মাথায় আনেনি। এই প্রথম আতলিত আক্রান্ত হলো। তা-ও স্বয়ং বাইবার্স কর্তৃক! স্বাভাবিকভাবেই বাইবার্স ঝড়ের প্রলয়ঙ্করী ভাণ্ডার সইতে পারলো না আতলিতের শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা। আসলোই তো উন্মত্ত চিতা রুখে, সে সাধ্য কার?

১২৬৪ সাল। সুলতান বাইবার্স আতলিত অবরোধ করলেন। দুর্গের মতো প্রাচীরবেষ্টিত খাড়ি, অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ এবং সুউচ্চ বুরুজ আতলিতের পতন ঠেকাতে পারলো না। ক্রুসেডাররা প্রাণপণ সাধা দিল, তবু তারা ব্যর্থ হলো। তারা একটা ব্যাপার দেখে খুবই বিস্মিত হলো, মামলুকদের দুর্গ অধিকারের অনীহা! সুরম্য এ দুর্গ দখলের চেয়ে তারা বরং এর ধ্বংসই চাইছে! বাইবার্সের কঠোর নির্দেশে নাফতুন থেকে ভারী-ভারী নাফতা (জ্বলন্ত অগ্নিগোলা) এবং প্রকাণ্ড সব পাথর আতলিতের পাষাণ প্রাচীরে ক্রমাগত নিক্ষিপ্ত হতেই থাকলো।



আসলেই দুর্গ দখলের চেয়ে ক্রুসেডম্যানসে ভীতি সঞ্চার করাই ছিল বাইবার্সের মূল উদ্দেশ্য। বাইবার্সের ক্রুসেড বিরোধী অভিযানের পরতে পরতে এর সুস্পষ্ট ছাপ প্রতিনিয়তই পরিলক্ষিত হয়েছে। বাস্তবেও সালাহউদ্দিন আইয়ুবির কোমলতা যেখানে অকার্যকর, বাইবার্সের কঠোরতাই সেখানে অব্যর্থ পথ্য হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। বাইবার্সের সীমাহীন এই কঠোরতার কারণেই মূলত ক্রুসেডাররা অবশেষে লেভান্ট থেকে নিজেদের তল্লিতল্লা গোটাতে বাধ্য হয়!

নাফতুন থেকে নিরন্তর পাথর বর্ষণের ফলে একসময় আতলিতের মজবুত দেয়ালগাত্রে ফাটল দেখা দেয়। দেখতে দেখতে আতলিতের দেওয়ালগুলো ভূমিস্খাৎ হয়ে যায়। দুর্ধর্ষ মামলুক সেনারা বাঁধভাঙা বানের মতো ছেতিও পেলেরিন খ্যাত আতলিত দুর্গে ঢুকে পড়লো। যেহেতু যুদ্ধের মাধ্যমে আতলিত বিজিত হয়, তাই বাইবার্সের আদেশে আতলিতে অবস্থানরত চারহাজার সৈন্যকে শাস্তিস্বরূপ হত্যা করা হলো! বাইবার্সের এ অগ্নিমূর্তিতে পুরো খ্রিস্টজগত ভড়কে গেল। ক্রুসেডারদের মাঝে ছড়িয়ে পড়লো প্রচণ্ড ভীতি। তারা বুঝলো, নিশ্চিতভাবেই এবার বাইবার্সের তোপের মুখে পড়তে যাচ্ছে হাইফা। কারণ আতলিত থেকে হাইফার দূরত্ব মাত্র সতেরো কিলোমিটার। তাছাড়া হাইফার অবস্থানও শাম সাগরের উপকূল ঘেঁষে। তাই তারা মরিয়া হয়ে হাইফার প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করে তুললো!

হাইফা। আধুনিক ইসরাইলের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী। সর্ববৃহৎ সমুদ্রবন্দর। আতলিত বিজয়ের পর সুলতান বাইবার্স এবার হাইফা অভিমুখে সসৈন্যে রুখ করলেন। ১২৬৫ সালের শুরুর দিকে অনুমিতভাবেই তিনি অবরোধ করে বসলেন হাইফা। ক্রুসেডাররাও কেল্লাবন্দি হয়ে গড়ে তুললো তুমুল প্রতিরোধ! সুলতান বাইবার্স যথারীতি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন: “নগরপ্রাচীর পুরোপুরি বিধ্বস্ত না হওয়া পর্যন্ত নাফতুন চালিয়ে যাও।”

তাই করা হলো। বিরামহীন ভারী পাথর বর্ষণে একসময় টলে উঠলো শহর রক্ষা প্রাচীর। তবু থামলো না বেপরোয়া মামলুক বাহিনী। নগরপ্রাচীর মাটির সাথে মিশে না যাওয়া পর্যন্ত লাগাতার চললো ভূগপৎ পাথর-সম্মিলিত বর্ষণ। একটা সময়ে এসে মুসলিম বাহিনীর সামনে দেয়াল বলতে আর কিছুই থাকলো না। উন্মুক্ত শহরে এবার মিদফা ও ধনুক হাতে প্রবেশ করলো দুর্ধর্ষ মামলুক ফৌজ। ব্যাপক গণহত্যার মধ্য দিয়ে সাফ করা হলো ক্রুসেডের অবাস্তব জঞ্জাল। ফলে নাজারেথ, আরসুফ, আতলিতের পর এবার হাইফাও বাইবার্সের করতলগত হলো। মহাকালের সাক্ষী হয়ে হাইফার বিধ্বস্ত নগরদুর্গ আজও সে অবস্থাতেই উজাড় পড়ে রয়েছে।

সুলতান বাইবার্‌সের ক্রমাগত আক্রোশে ক্রুসেডাররা এবার চোখে সর্ষেফুল দেখতে লাগলো। তারা ধরেই নিল, এখন আন্ধার আর রেহাই নেই। শাম সাগরের উপকূল মাড়িয়ে বাইবার্‌স যে গতিতে এগিয়ে আসছেন, তাতেই বোঝা যাচ্ছে আন্ধাই হচ্ছে পরবর্তী টার্গেট। বাইবার্‌স তাগুব ঠেকাতে অনন্যোপায় হয়ে তারা তাই বর্বর মোঙ্গলদের শরণাপন্ন হলো। ধর্ণা দিল হালাকুর খ্রিস্টান সহধর্মিনী ডোকুজ খাতুন সকাশে! কী হবে এবার? আরো একটি বাইবার্‌স-হালাকু দ্বৈরত তাহলে অত্যাশঙ্কর? রোমাঞ্চকর মুসলিম-মোঙ্গল মহারণ ফের বোধহয় অনিবার্যই হয়ে উঠলো!



১২৬৫ সাল। সুলতান বাইবার্‌স ক্রুসেডারদের হাত থেকে একে একে কেড়ে নিয়েছেন নাজারেথ, আরসুফ, আতলিত, হাইফা। বাইবার্‌সের এ রণমূর্তিতে ক্রুসেডবিশ্ব তাই আতঙ্কিত হয়ে পড়লো। হাহাকার উঠলো সর্বত্র। তারা দিব্যি বুঝে নিল, এ অবস্থা চলতে থাকলে পুরো লেভান্ট থেকে অচিরেই তাদের লেজ গোটাতে হবে। তখন পবিত্রভূমিতে পা রাখার মতো এক চিলতে জমিও আর তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। অতএব যে কোনো মূল্যে বাইবার্‌সকে থামাতেই হবে। কিন্তু মুশকিল হলো, লেভান্টের স্থানীয় ক্রুসেডাররা কোনোক্রমেই বাইবার্‌সের সাথে এঁটে উঠতে পারছে না। আবার ইউরোপ থেকেও কোনো সাড়া মিলছে না। কারণ প্রায় পুরো ইউরোপ তখন শাহানশাহ বার্কের খানের দাপটে তটস্থ। পূর্ব ও মধ্য ইউরোপ তাই নিজেদের অস্তিত্ব নিয়েই শঙ্কিত। লেভান্টে নজর দেবার মতো ফুরসত তাদের কোথায়! ফলে বাধ্য হয়ে তারা তাদের অঘোষিত ‘পোপ’ হালাকু খানের শরণাপন্ন হলো। ধর্ণা দিল ডোকুজ খাতুন সমীপে। হালাকুর খ্রিস্টান স্ত্রী ডোকুজ খাতুনের মাধ্যমে তারা ইলখানি মোঙ্গলদের সাহায্য চাইলো।

এদিকে হালাকু খানও তেরেখ নদী তীরের যুদ্ধের ঝিপঝড় কাটিয়ে উঠেছেন। চীন থেকে তার সাহায্যে নতুন ফৌজও এসে গেছে। এতোদিন তিনিও তাই বাইবার্‌সের সাথে সব হিসেব চুকানোর অপেক্ষায় ছিলেন। প্রমাদ গুণছিলেন উপযুক্ত সময়ের। তাই ক্রুসেডারদের বারবার অনুরোধের মুখে তাদের কাঁধে চড়েই এবার তিনি আইন জালুত-হিমসের প্রতিশোধ নিতে উন্মুখ হয়ে উঠলেন। তিনি ভেবে দেখলেন, এটাই সুবর্ণ সুযোগ। প্রতিশোধের যথার্থ সময়। কেননা

হালাকুর চিরশত্রু বার্ক খান কনস্টান্টিনোপল দখলের অভিপ্রায়ে ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যস্ত, ফলে তার তরফে কোনো হুমকি নেই। আবার টানা যুদ্ধে বাইবার্সও ক্লান্ত। এতগুলো বিজয়ের ফলে তার মধ্যে একটা আয়েশীভাব চলে আসাই স্বাভাবিক। অপ্রস্তুত অবস্থায় বাইবার্সকে কুপোকাত করা যতোটা সহজ, স্বাভাবিক অবস্থায় ঠিক ততোটাই কঠিন। তাছাড়া হালাকু খান বাইবার্সের সাথে লেভান্টে যুদ্ধে নামলে ইলখানাতে সার্বভৌমত্বও তখন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে না। কারণ বাইবার্সের অনুপস্থিতিতে মামলুকরা ইলখানাত সীমান্তে চাইলেও চড়াও হতে পারবে না। এসব নানা দিক চিন্তা করে এবং পরিস্থিতি তার অনুকূলে ভেবেই হালাকু খান যুদ্ধে নামার সিদ্ধান্ত নেন। অবশেষে ক্রুসেডারদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১২৬৫ সালের শুরুর দিকে তিনি বিশাল বাহিনী নিয়ে হাইফা অভিমুখে রওয়ানা হন। নিজের অজান্তেই জড়িয়ে পড়েন চলমান রক্তক্ষয়ী ক্রুসেডে।

বাইবার্স সবেমাত্র হাইফার অধিকার বুঝে নিয়েছেন, তখনি সংবাদ এলো হালাকু খান ধেয়ে আসছেন খোদ হাইফা অভিমুখে। ধূর্ত হালাকু খান চাচ্ছিলেন নীরবে হাইফা পৌছে বাইবার্সকে ধরে ফেলতে! তাই তিনি হালব, হামাহ ও হিমসের মতো শক্তিশালী দুর্গবেষ্টিত গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো এড়িয়ে সোজা চলে এলেন টাইবেরিয়াস সাগরের (গ্যালিলি হ্রদ) দক্ষিণে প্রবাহিত জর্দান নদীর তীরবর্তী 'বির' শহরে। অবশ্য বর্বর মোঙ্গল বাহিনী একেবারেই যে চুপচাপ বিরায় চলে এসেছে তা নয়। পশ্চিমধ্যে তারা মামলুক নিয়ন্ত্রিত আধুনিক তুরস্কের মারদিন ও কাইফার মতো ছোট ছোট শহরগুলোকে রীতিমত বিধ্বস্ত করেই এসেছে। হালাকু খান যখন বিরায় এসে হাজির, বাইবার্স তখন হাইফায়। দুজনের অবস্থান তখন বেশ কাছাকাছিই বলা যায়। হালাকু খানের ইচ্ছা ছিল ক্ষিপ্ৰগতিতে হাইফায় গিয়ে বাইবার্সকে আচমকা আক্রমণ করা। কিন্তু বাইবার্স অর্থই যে প্রধান চিতা-হালাকু খান হয়তো তা ভুলেই গিয়েছিলেন, মারদিন ও কাইফার পতনে বাইবার্স এমনতেই ছিলেন ক্ষিপ্ত। তাই হালাকু খানকে স্বাগত জানাতে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় নিজেই চলে এলেন বায়সানে। এটা সেই বায়সান, যেখানে মাত্র পাঁচ বছর আগে এই মোঙ্গলদের গিয়েই ছেলেখেলায় মেতে উঠেছিল উন্মত্ত মামলুক বাহিনী। আইন জালুত থেকে পালিয়ে আসা মোঙ্গলদের বড় একটা অংশ এখানকার জঙ্গলেই আশ্রয় নেয়। তখন বাইবার্সের নির্দেশে পুরো জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে এদেরকে জীকিস্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।

হালাকু খান কর্তৃক অনায়াসে কাইফা-মারদিন দখলের ফলে ক্রুসেডারদের দমে যাওয়া সাহস-উদ্দীপনা বেড়ে গেলো। সিলিসিয়ান খ্রিস্টান নাইট এবং এন্টিয়কের ক্রুসেডাররা তাই দলে দলে মোঙ্গলদের সাথে এসে মিলিত হতে

লাগলো। এতে করে বিশাল মোঙ্গল বাহিনী এবারে বহুজাতিক বাহিনীর রূপ ধারণ করলো। পক্ষান্তরে সদ্য বিজিত আতলিত ও হাইফায় সৈন্য রেখে আসায় বাইবার্সের সৈন্য ছিল বিধর্মীদের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। তবুও বিচলিত হলেন না চিরসবুজ বাইবার্স। তার দুর্ধর্ষ মামলুক বাহিনীও ঘাবড়ালো না মোটেই! তারা বরং কিলিজের ডগায় আরো একটি মহাকাব্য লেখার অপেক্ষায় অধীর হয়েই প্রহর গুণলো!

বিরার যুদ্ধ মূলত ছিল হাতাহাতি যুদ্ধ। এই যুদ্ধে দুর্ধর্ষ মুসলিম বাহিনী আলাদা তিনটি বাহিনীর সম্মিলিত বিরাট বাহিনীকে পরাজিতই শুধু নয়; পুরোপুরি বিধ্বস্তও করে দেয়। মামলুক তাণ্ডবের অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে মোঙ্গল ও ক্রুসেডারদের বহুবার হয়েছে এবং তা বেশ ভালোই জানা আছে! তাই দুরন্ত মামলুকদের উন্মত্ত কিলিজের (তরবারি) গজব শুরু হতেই মোঙ্গল-ক্রুসেড যৌথবাহিনী সহসাই পলায়ন শুরু করলো। আর তখনই শুরু হলো মোঙ্গল-ক্রুসেড নিধন। শুরুর দিকে দুই পক্ষের তুমুল যুদ্ধের সময় বাইবার্স বারবার হালাকু খানের নাম ধরে ধরে চিৎকার করে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য ডাকতে থাকেন। কিন্তু সে ডাকে সাড়া দেবার মতো কলিজাই তো হালাকু খানের ছিল না! উন্মত্ত চিতার সামনে যাবার মুরোদ কি আর ধূর্ত খরগোশের থাকে! যথারীতি পুরো বাহিনীকে বাইবার্সের দয়ার উপর ছেড়ে দিয়ে এবারো তিনি পালিয়ে বাঁচলেন! এ যুদ্ধে পরাজয়ের পর হালাকু খান একেবারেই ভেঙে পড়েন। তিনি আসলে মৃগীরোগী ছিলেন। বারবার শোচনীয় পরাজয় ও বাইবার্স আতঙ্কে এবার তা প্রচণ্ডরকম বৃদ্ধি পায়। মারাগায় ফিরেই বহু ট্রাজেডিক গণহত্যার খলনায়ক, বাগদাদের কসাইখ্যাত নরখাদক হালাকু খান মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১২৬৫ সালে পিতার শূন্যস্থানে হালাকুর বড় ছেলে আবাগা খান অভিষিক্ত হন। এবং তখনই বাইবার্সের কাছ থেকে পিতৃহত্যার চরম প্রতিশোধ নেবার চোয়ালবদ্ধ শপথ নেন।

বিরার যুদ্ধে হালাকু খানের নেতৃত্বাধীন ক্রুসেড-মোঙ্গল বিশাল যৌথবাহিনীকে পরাজিত করার পর সুলতান বাইবার্স ফের লেভান্টের সমস্ত অঞ্চলে ঝুঁকে পড়লেন। শাম সাগরে অবাধ প্রবেশের সামান্য বাতায়ন খুলতে যেয়ে এতোদিনে বাইবার্স পুরো একটা বারান্দাই খুলে বসেছেন। তবু ক্ষান্ত দিলেন না অদম্য বাইবার্স। নাকের ডগার উপর ক্রুসেড নিয়ন্ত্রিত সিজারিয়ার অস্তিত্ব এবার তার কাছে বিষাক্ত ঠেকলো। ক্রুসেডরাজ্য কিংডম অব জেরুসালেমের একটি ডাচি হচ্ছে এই সিজারিয়া। সেই সিজারিয়ারই একটি রাজ্য ছিল বাইবার্সের সদ্য বিজিত আরসুফ। বিরার যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের দুঃখ এখনো ভুলতে পারেনি ক্রুসেডাররা। শোকে মূহ্যমান পুরো ক্রুসেডসমাজকে হতাশার সাগরে ডুবিয়ে

সুলতান বাইবার্স আবার অভিযানে বেরুলেন। এবার তিনি সিজারিয়া অভিযুখে সসৈন্যে যাত্রা শুরু করলেন। ১২৬৫ সালের শেষের দিকে স্বয়ং বাইবার্সের নেতৃত্বে দুর্দমনীয় মামলুক বাহিনী সিজারিয়া অবরোধ করলো।

এই সিজারিয়া শহরেরই আরবি নাম হচ্ছে কায়সারিয়া। খ্রিস্টপূর্ব ১৩ অব্দে রোমান সম্রাট আগাস্টাস সিজার এ শহরের গোড়াপত্তন করেন। তখন থেকে তার নামেই এ শহর প্রসিদ্ধি লাভ করে। আমরা সকল রোমান সম্রাটকেই সিজার নামে জানি, অথচ মূলত সিজার ছিলেন মাত্র একজনই—সিজারিয়া শহরের স্থপতি আগাস্টাস সিজার। পরবর্তীতে সকল রোম সম্রাটকেই এ নামে ডাকা হতে থাকে। বিধায় “সিজার” রোমান সম্রাটদের রাষ্ট্রীয় উপাধিতে পরিণত হয়। এই সিজারের আরবি রূপান্তরই হচ্ছে কায়সার। এরই বিকৃত অন্যরূপ কাইজার।

হসপিটালার নাইট। পুরো খ্রিস্টজগতে জানবাজ ও একরোখা যোদ্ধা হিসেবে এরা ছিল বিখ্যাত। এরা সাধারণ নাইটদের চেয়েও ছিল দুর্ধর্ষ। সিজারিয়া রক্ষায় এই অকুতোভয় নাইটরাই বিশেষভাবে নিয়োজিত ছিল। তাদের সাথে ছিল সিলিসিয়া থেকে আসা নাইটরাও। এরা সকলে মিলে সিজারিয়ার পতন সহজে হতে দিল না। নিরবচ্ছিন্ন মামলুক আক্রমণের প্রচণ্ডতার মুখেও এরা চল্লিশ দিন পর্যন্ত সিজারিয়াকে আগলে রাখলো। কিন্তু দিন দিন বাইবার্সের অবরোধ আরও কঠোর ও মারাত্মক আকার ধারণ করলো। হামলার বেগও প্রতিনিয়ত বেড়ে চললো। ফলে একসময় নিরাশ হয়ে খ্রিস্টানরা বাইবার্সের কাছে সন্ধির দূত পাঠালো। বাইবার্স একবাক্যে জানিয়ে দিলেন: “বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করলে হয়তো প্রাণে মারা হবে না।”

বেশ, এটুকুই। আর এতেই ভড়কে গেল পাষণ হসপিটালার নাইটরা পর্যন্ত। কারণ বাইবার্সকে চিনতে তখন কেউ আর বাকি ছিল না। উপায়সূত্র না দেখে অবশেষে আত্মসমর্পণ করলো নিরুপায় সিজারিয়াবাসী। আর তখনই গজব নাথিল হলো নাইটদের উপর! সরাসরি প্রাণে না মেরে সকল খ্রিস্টানদের সামনে সুলতান বাইবার্স অবিশ্বাস্য, অবমাননাকর তিনটি শর্ত ঝুলিয়ে দিলেন, এবং কড়া ভাষায় জানিয়ে দিলেন শর্তগুলোর যে কোনো একটি অবশ্যই মানতে হবে! শর্ত তিনটি ছিল:

১. ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের ভাই হয়ে যাও
২. এক কাপড়ে নিজ নিজ দেশে সবাই চলে যাও। কারণ এটা তোমাদের দেশ না। আর এজন্য আমি কোন ক্ষতিপূরণও দেবো না। কেননা তোমরা মুসলমানদের আরো বেশি ক্ষতি করেছে; কিন্তু কোনো ক্ষতিপূরণই আজ পর্যন্ত দাওনি।

৩. অথবা মৃত্যু।

সাধারণ খ্রিস্টানরা দ্বিতীয় শতটি সানন্দে গ্রহণ করে দেশান্তর হয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচলো। কিন্তু জাত্যাভিমानी হসপিটালার নাইটরা প্রথম দুটো শর্তকেই ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলো। ফলে বাইবার্সের আদেশে সর্বপ্রথম সিজারিয়া দুর্গের সবগুলো দেওয়াল ভেঙে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হলো। অতঃপর সকল হসপিটালার নাইট ও তাদের অনুগামী যারাই হলো, তাদের সবাইকেই বিধ্বস্ত দুর্গের সামনে এনে শিরশ্ছেদে হত্যা করা হলো। এভাবেই বিজিত হয় সিজারিয়া। সেইসাথে পুরো খ্রিস্টীয় মানসে ফের নতুন করে ছড়িয়ে পড়ে বাইবার্স ত্রাস!

১২৬৬ সাল। সুলতান বাইবার্স সবেমাত্র সিজারিয়া পদানত করেছেন। এবার তার সামনে সাফাদ বিজয়ের প্রচ্ছন্ন হাতছানি। এতোদিনে বাইবার্স কিংডম অব জেরুসালেমের দখল থেকে একমাত্র আক্কা, জাফা ও সাফাদ ছাড়া আধুনিক ইসরাইলের প্রায় পুরোটাই কেড়ে নিয়েছেন। তাই গলার কাঁটা হয়ে থাকা এই তিনটি ভূখণ্ডকেই পর্যায়ক্রমে ক্রুসেডার মুক্ত করতে তিনি দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হলেন। প্রথমেই নিশানায় আনলেন সাফাদ। কিন্তু সিজারিয়া যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তার চিন্তার দিগন্তে নতুন আলোড়ন তুললো। পুরোনো অনেক হিসাব-নিকাশও সামনে চলে আসলো। তাই এবার তিনি সাফাদ অভিযানের সাথে সাথে বহুদূরের আরো একটি ভূখণ্ডে যুগপৎ ত্রাস সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিলেন। সেটি এমন এক ভূখণ্ড যা আজন্মই নষ্টামির তীর্থকেন্দ্র। মুসলিম বিদেষ যার অঘোষিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতি। ষড়যন্ত্র-প্রতিহিংসাই এর অলিখিত পররাষ্ট্রনীতি। নাম তার সিলিসিয়া। এর ভৌগলিক অবস্থান, ইতিহাস, ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা পরে আসছি।

আগে জেনে নেই, লেভান্টের টানা যুদ্ধের মধ্যেও বাইবার্স কেন এতোদূরের একটা ভূখণ্ডে নতুন যুদ্ধে জড়াতে চাচ্ছেন? হঠাৎ কেন সিলিসিয়ার উপর তিনি এতোটা খেপে উঠলেন?

কারণ খুবই সোজা! বাইবার্স যখন সিজারিয়া অবরোধ করলেন, তখন সিজারিয়ার পাশে একমাত্র এই সিলিসিয়াই এসে দাঁড়িয়েছিল। অর্থ-অস্ত্র এমনকি নাইট-সেনা দিয়ে সাহায্য পর্যন্ত করেছিল। এখানেই শেষ নয়; এরও আগে আইন জালুতের সঙ্গীন মহারণে বাইবার্সের বিরুদ্ধে এরাই বাছাইকরা ৫০০ নাইট পাঠিয়েছিল। মূলত সেই থেকেই সিলিসিয়ানদের প্রতি বাইবার্সের শত্রুতার শুরু। তাছাড়া বাইবার্স যখনই ক্রুসেডার বা মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছেন, তখনই এই সিলিসিয়া বাঁধার পট্টা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গায়ে পড়ে বাইবার্সের বিরুদ্ধে সর্বত্র সৈন্য পাঠিয়েছে। পায়ে পা লাগিয়ে অনাহত শত্রুতা অবিরত খরিদ করেছে। বিরার যুদ্ধেও হালাকু খানের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই সিলিসিয়ানরা বাইবার্সের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছে। সর্বশেষ সিজারিয়ায় ফের

যখন একই পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলো, বাইবার্স এবার আর বসে থাকলেন না। ভাবলেন, এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। সিদ্ধান্ত নিলেন, সিলিসিয়া অভিযানের। কিন্তু সমস্যা হলো, সিলিসিয়ায় অভিযান চালালে আপাতত লেভান্টের অভিযান মূলতবি করতে হবে। বাইবার্সের সামনে তাই বড় রকমের প্রশ্ন হয়ে দেখা দিল—এবার তিনি কোথায় অভিযান চালাবেন? সাফাদ নাকি সিলিসিয়া! সিলিসিয়া অভিযান যেমন সময়ের অপরিহার্য দাবি, তেমনি কৌশলগত কারণে সাফাদ বিজয়ও পরিস্থিতির অনিবার্য চাহিদা। কেননা সাফাদ অভিযান মূলতবি রেখে বাইবার্স যদি সিলিসিয়া চলে যান, তাহলে এই সুযোগে বিধ্বস্ত ফ্রুসেডাররা নতুন শক্তি সঞ্চয় করে সাফাদ-জাফাকে দুর্ভেদ্য করে তুলবে। ফলে পরবর্তীতে আবার এসে অভিযান চালালে কঠিন প্রতিরোধের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া বাইবার্সের অবর্তমানে সদ্য বিজিত অঞ্চলগুলোও ফের খোয়া যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকবে। অনেক ভেবে-চিন্তে অবশেষে তিনি একটা সিদ্ধান্তে আসলেন—কাউকেই ছাড় দেয়া যাবে না। একসাথে দুদিকেই অভিযান চলবে। সেমতে তিনি তার পুরো সামরিক শক্তিকে দুভাগে বিভক্ত করলেন। একভাগের কমান্ডিং নিজ হাতে রেখে সাফাদসহ অন্য অ-বিজিত নগরগুলো অধিকারের দায়িত্ব স্বয়ং তিনি নিলেন। আর অপরভাগ পাঠালেন সিলিসিয়া অভিযানে। যার নেতৃত্বে থাকলেন আল মানসুর আলী ও কালাউন আল আলফি নামক দুই জাঁদরেল সেনাপতি।



হায়াস্তান। অবিভক্ত বৃহৎ আর্মেনিয়ার অন্য নাম। গোড়ার দিকে ইউরেশিয়া অঞ্চলের এ দেশটি ছিল এশিয়া-ইউরোপব্যাপী অখণ্ড বিস্তৃত। আরাকস নদী একে দুই মহাদেশে বিভক্ত করেছে। ইউরোপীয় অংশে ছিল এর এক চতুর্থাংশ। বাকি তিনভাগ এশিয়ায়। অবশ্য ভাঙা-গড়ার মধ্যে দিয়েই চলছিল এর ভূরাজনীতি। ১০৭১ সালে এসে সালজুক তুর্কিদের আক্রমণে চূড়ান্তভাবে বিভক্ত হয়ে যায় হায়াস্তান। এশিয়ার বৃহদাংশ চলে যায় সালজুক মুসলিম সালতানাতের অধীনে। ইউরোপীয় অংশটুকু যথারীতি হায়াস্তান বা আর্মেনিয়া নামেই টিক যায়। আর এ ভূখণ্ড নিয়েই গড়ে উঠেছে আধুনিক আর্মেনিয়া। কালক্রমে খোয়া যাওয়া এশীয় ভাগের অংশবিশেষ নিয়ে গড়ে ওঠে চরম প্রতিক্রিয়াশীল আরো একটি আর্মেনীয় রাজ্য। ইতিহাসে এটাই সিলিসিয়া নামে

খ্যাত। মুসলিমদের কারণে তিন চতুর্থাংশ ভূভাগ হারানোয় এই সিলিসিয়ান আর্মেনীয়রা হয়ে উঠে মারাত্মক মুসলিম বিদ্বেষী। তাই জনের পর থেকেই সিলিসিয়ার একমাত্র মিশন হয়ে দাঁড়ায় মুসলিমদের সাথে হয় সরাসরি শত্রুতা করা, না হয় ইসলামের শত্রুদের নিঃশর্ত সাহায্য করা। ঐতিহাসিক এসব কার্যকারণেই বাইবার্সের ঈর্ষণীয় সাফল্যে এরা তাই জ্বলে-পুড়ে থাক হয়ে যায়। চিরন্তন ঐতিহ্য মেনে এরা অবশেষে খোদ বাইবার্সেরও পিছু নেয়। বাইবার্সের সময়ে সিলিসিয়ার রাজা ছিলেন হেথুম। তিনি মুসলিমদের ধ্বংস করার জন্য স্বপ্নোদিত হয়েই মোঙ্গলদের সাথে হাত মেলান। শুধুমাত্র মুসলিম বিদ্বেষ থেকেই স্বাধীন রাজ্য হয়েও দুরাচার হালাকু খানের বশ্যতা মেনে নিয়ে ইলখানাতের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয় সিলিসিয়া।

সিজারিয়া জয়ের পর বাইবার্স এবার এটিকে করতলগত করার মনস্থ করলেন। সেমতে তিনি তার দুর্ধর্ষ দুই সেনাপতিকে সিলিসিয়া অভিমুখে সসৈন্যে প্রেরণ করলেন। অভিযানের আগে বাইবার্স যথারীতি ভীতিপ্রদর্শনমূলক একখানা চরমপত্র পাঠালেন রাজা হেথুমের নামে: “আপনি মোঙ্গলদের সাথে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করুন। মোঙ্গল নয়; এখন থেকে আপনি কেবলই আমার আনুগত্য স্বীকার করবেন। আল্লাহর দয়ায় মোঙ্গল হানার মুখে আমিই আপনাকে নিরাপত্তা দেবো। আর আপনার রাজ্যের সীমাটা বড্ড বেখাপ্পা, তাই এর অর্ধাংশ আমার হাতে স্বেচ্ছায় তুলে দিয়ে আপনি ভারমুক্ত হোন।”

দুর্ধর্ষ বাইবার্সের চরম অবমাননাকর এ পত্রে রাজা হেথুম যারপরনাই ভড়কে গেলেন। হেথুম বাইবার্সের নির্মমতার আদ্যোপান্ত সবই জানতেন। তাই এবার আর ইলখানাত নয়; তিনি বরং পড়িমরি গোটা মোঙ্গল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় রাজধানী কারাকোরাম ছুটে গেলেন। সরাসরি থাকান খান কুবলাই খানের সামনে নতজানু হয়ে সাহায্য চাইলেন। কুবলাই খান তাকে বাইবার্সের রোষ থেকে যে কোনো মূল্যে রক্ষা করবেন বলে আশ্বস্তও করলেন। তৎক্ষণাৎ সিলিসিয়া ও মোঙ্গল সাম্রাজ্যের মাঝে চিরস্থায়ী সামরিক মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেলো। কিন্তু দুর্ভাগ্য! হেথুম মৈত্রীচুক্তি করে ফিরে এসে দেখলেন, তার রাজ্যটাই তো নেই! বাইবার্স ঝড়ে ততোদিনে পুরো সিলিসিয়াই যে ধ্বংস হয়ে গেছে!

১২৬৬ সালের মাঝামাঝি কাল। বাইবার্সের পত্র দেখেই রাজা হেথুম যখন সন্তুষ্ট হয়ে কারাকোরাম ছুটছেন, সুলতান বাইবার্স তখন সিজারিয়া থেকে সসৈন্যে ছুটলেন সাফাদ পানে। আর তার দুর্ধর্ষ দুই সেনাপতি কালারউন আল আলফি ও আল মানসুর আলি চললেন শামের উত্তরে তাওরুস পর্বতের ঢাল বেয়ে সিলিসিয়া অভিমুখে। কালারউন ছিলেন বাইবার্সের মতোই কুমান গোত্রীয় কিপচাক-তুর্কি। আল মানসুর আলি আইন জালুতের পরীক্ষিত সেনাপতি; কিন্তু



কালারউন অসম্ভব মেধাবী হলেও বড় মধ্যে তার যোগ্যতার পরীক্ষা এখনো হয়নি। তাই সুলতান বাইবার্স চাইলেন এবারে তার যোগ্যতার একটা পরীক্ষা হোক! কারণ তিনি নিজেই তাকে সেনাপতি করেছেন। দুর্বীর গতির মামলুক বাহিনী একসময় সিলিসিয়ার সীমান্ত শহর মারির সন্নিহিতে এসে পৌঁছলো!

এদিকে হেথুম নেই তো কী হয়েছে? হেথুমের দুই উপযুক্ত ছেলে ভারপ্রাপ্ত রাজা লিও ও যুবরাজ থরোস তো আছেন! দুই ভাই ও তাদের চাচা বাসিল তাতার মামলুক বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়েই সীমান্তে রুখে দাঁড়াবার পরিকল্পনা সাজালেন। মামলুক বাহিনীকে স্বাগত জানাতে তারা তাদের গর্বের নাইট বাহিনীসহ বিশাল ফৌজ নিয়ে সিলিসিয়া-এন্টিয়ক সীমান্তবর্তী শহর মারিতে গিয়ে পৌঁছলেন। স্থানটি বর্তমানে আধুনিক তুরস্কের হাতায় (Hatay) প্রদেশের দারবসাক শহরের উত্তরে অবস্থিত। এখানে সিলিসিয়ার একটি মজবুত সীমান্ত দুর্গও ছিল। তাই এখানেই সিলিসিয়ান আর্মেনীয়রা মুসলিম বাহিনীর গতিরোধ করে দাঁড়ায়।

২৪ আগস্ট ১২৬৬ সাল। আল মানসুর আলির নেতৃত্বাধীন বাহিনীর সাথে প্রিন্স লিওর নেতৃত্বাধীন আর্মেনীয় বাহিনীর প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের এক পর্যায়ে বাইবার্সের উভয় জানবায সেনাপতি আর্মেনীয় বাহিনীকে কৌশলে কঠিন বেষ্টিত করে এনে কঠিন আক্রমণ করে বসেন। শুরু হয় চিরচরিত মামলুক তাণ্ডব। মুহূর্তেই লগুতগু হয়ে যায় পুরো খ্রিস্টান বাহিনী। প্রিন্স থরোস যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হন। হেথুমের চাচাতো ভাই বাসিল তাতার এবং প্রিন্স লিও মামলুকদের হাতে বন্দি হন।

সুলতান বাইবার্স শাম সাগরের পাড়ে বসেই সিলিসিয়ায় যুদ্ধে ব্যস্ত তার অপর বাহিনীর সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখতেন। সাফাদে বসেই তিনি সিলিসিয়া অভিযানের ছক কষতেন। প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনাও এখান থেকে পাঠাতেন। তার সেনাপতিরাও সেভাবেই আগাতেন। এ যোগাযোগের জন্য তখন ছিল নিজস্ব একটা ব্যতিক্রমী ডাক ব্যবস্থা। প্রশিক্ষিত পায়রা ও দ্রুতগতির উন্নত ঘোড়া ছিল তার মাধ্যম।

মারির যুদ্ধের পর বাইবার্সের নির্দেশে মামলুক বাহিনী এসেও এগিয়ে গিয়ে একে একে মামিস্ত্রা, আয়াস, আদানা ও বিখ্যাত নগরী তুরসুস পদানত করে নেয়। দূরন্ত মামলুক বাহিনী একসময় সিলিসিয়ার রাজধানী খোদ সিস অবরোধ করে বসে! টানা বিশ দিন প্রচণ্ড যুদ্ধের পর মুসলিম বাহিনীর হাতে সিসের পতন ঘটে। ৪০ হাজার আর্মেনীয়কে বন্দি করে দাস বানিয়ে অন্যান্য উপটৌকনের সাথে সুলতান বাইবার্সের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এভাবেই গোটা সিলিসিয়ায়

মামলুক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে প্রিন্স লিওকে মুক্তি দেওয়া হলে তিনি এন্টিয়কে পালিয়ে যান।

এদিকে হেথুম মোঙ্গল সাম্রাজ্যের কর্ণধার কুবলাই খানের সাহায্য নিয়ে সিলিসিয়ায় ফিরে এসে দেখলেন, তার সাধের কুচক্রি রাজ্য এখন মামলুক সালতানাতের একটি প্রদেশে পরিণত! বিপুল মোঙ্গল বাহিনী সাথে থাকা সত্ত্বেও হেথুম সিলিসিয়া পুনরুদ্ধারের কোনো চেষ্টাই করলেন না। কারণ সুলতান বাইবার্স তখন কিংডম অব জেরুসালেমকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়ে স্বয়ং সিলিসিয়া উপকণ্ঠে এসে পড়েছেন। মোঙ্গলরাও তাই আক্রমণের ঝুঁকি নিল না। বাইবার্সের কাছে বারবার পরাজিত হয়ে তাদের সেই হিংস্র মনোবলও এখন আর নেই। তাছাড়া এই মোঙ্গল বাহিনী ইলখানাতের নয়; খোদ খাকান খান কুবলাই খানের কাছ থেকে আসা। এরাও পরাজিত হলে মোঙ্গলদের ইজ্জত বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। রাজা হেথুম তাই মনের দুঃখে সব ছেড়ে বৈরাগ্য জীবন গ্রহণ করে নেন। বনে যান পুরোদস্তুর গির্জার যাজক। সিলিসিয়ার পতনে বস্তুত ইলখানি মোঙ্গলদের ডান হাতটাই কেটে দেওয়া হয়েছে! এবার বাম হাত বিচ্ছিন্নের অপেক্ষা! আর সেটি হচ্ছে স্বপ্নের এন্টিয়ক। ১৭০ বছরের অজেয় এন্টিয়ক!

সুলতান বাইবার্স সিজারিয়া থেকে তার দুই সেনাপতিকে সিলিসিয়া অভিযানে পাঠিয়ে তিনি কিন্তু বসে থাকেননি। ঝড়ের বেগে প্রথমেই সাফাদ অবরোধ করলেন।

গ্যালিলি উপসাগরের (টাইবেরিয়াস হ্রদ) উত্তরে অবস্থিত মজবুত এক দুর্গনগরী এই সাফাদ। পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে এর দুর্ভেদ্য দুর্গ। ১১৮৮ সালে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবি সাফাদ অধিকার করেন। কিন্তু ১২৪০ সালে এসে তারই অপদার্থ উত্তরসূরী সুলতান দ্বিতীয় আল আদিল সাফাদকে পুনরায় ক্রুসেডারদের হাতে তুলে দেন। সেই থেকে ১২৬৬ সাল পর্যন্ত টানা ২৬ বছর সাফাদ ক্রুসেডারদের দখলে রয়েছে। এটি তখন কিংডম অব জেরুসালেমের অন্তর্গত ছিল।

সুলতান বাইবার্স কর্তৃক সাফাদ অবরুদ্ধ হলে নূরুদ্দ্বাসীর মনে দেখা দেয় অজানা আতঙ্ক। অথচ সাফাদে সেসময় বিপুল পরিমাণ ক্রুসেড সৈন্য ছাড়াও ছিল দুহাজার দুর্ধর্ষ টেম্পলার নাইট। সাধারণ নাইটদের চেয়ে এরা ছিল আরো বেশি জানবায়, বেপরোয়া, আত্মঘাতী। টেম্পলার নাইটরা সেন্ট জনের টেম্পলে (গির্জা) ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে খ্রিস্টধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গের শপথ নিতো বলেই এদের এই নামকরণ। দুর্ধর্ষ এসব নাইটদের উপস্থিতিও সাফাদবাসীর উৎকণ্ঠা দমাতে পারলো না। বাইবার্সের ক্রমাগত কঠোর অভিযানের কাহিনী

গুনে গুনে তারা ছিল ভীত-সন্ত্রস্ত, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। তাই তারা ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের ঝুঁকি না নিয়ে বরং প্রাণভিক্ষার শর্তে আত্মসমর্পণের আবেদন জানায়। বাইবার্স আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের আর্জি কবুল করে নেন এবং নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে বলেন।

১২৬৬ সাল। ২ হাজার টেম্পলার নাইটসহ সকল ক্রুসেড সৈন্যের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মধ্যদিয়ে সাফাদ মামলুক সালতানাতভুক্ত হয়। অন্যবারের মতো বাইবার্স এবার আর দুর্গ ভূমিস্মাৎ করলেন না। উল্টো ব্যাপক সংস্কার ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে একে আরো দুর্ভেদ্য করে গড়ে তুললেন। কারণ কৌশলগতভাবে সাফাদ ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে। সাফাদের দেয়ালগাত্রে খোদিত হলো মুসলিমদের অবরোধ ও বিজয়ের অনন্য কীর্তিগাঁথা। সেই শিলালিপি আজও সগৌরবে বিদ্যমান।

সাফাদ বিজয়ের পর বাইবার্স ক্রুসেডারদের আর্জি মতো সাধারণ খ্রিস্টানদেরকে প্রাণভিক্ষা দিলেও অভিজাত টেম্পলার নাইটদের তিনি ছাড়লেন না। সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গিয়ে নিচে নিষ্ফেপ করে হত্যা করা হলো দুহাজার নাইটকেই। একজন নাইটকে স্বহস্তে নিষ্ফেপ করে এ গণহত্যার উদ্বোধনটাও স্বয়ং বাইবার্সই করেন। নাইটদের প্রতি সুলতান বাইবার্সের ভয়াবহ এ ক্রোধের সঙ্গত কারণও রয়েছে। কেননা ইসলাম ও মুসলিম বিদেষ প্রশ্নে নাইটরা সাধারণ ক্রুসেডারদের চেয়ে সততই এককাঠি সরস ছিল। এদের জিঘাংসা-হিংস্রতা ছিল আর সবার থেকে যোজন-যোজন এগিয়ে। কপটতা, ধূর্তামি, অঙ্গীকার ভঙ্গে এরা ছিল ওস্তাদ! সর্বোপরি এরা হচ্ছে চরম জাতিগতপ্রাণ। ফলে খোদ বাইবেল ছুঁয়ে শপথ করলেও এদের উপর কখনোই বিশ্বাস করা যেতো না। আবার সকল নাইটদের মধ্যে এই টেম্পলাররাই ছিল মারাত্মক উগ্র, জঘন্য চরমপন্থী! তাই সুলতান বাইবার্স “শত্রুর শেষ রাখতে নেই” আশুবাক্যের উপর পূর্ণমাত্রায়ই আমল করেন। এ ঘটনায় প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় খ্রিস্টজগতে। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে পুরো ইউরোপে। আর বাইবার্স ত্রাস! সে-তো যথার্থই সংক্রমিত হতেই থাকলো!

১২৬৩ সালে সুলতান বাইবার্স যখন ক্রুসেড বিরোধী অভিযান শুরু করেছিলেন তখন লেভান্তের মানচিত্রে মুসলিম নিয়ন্ত্রণে এক ছিলতে জায়গাও এমন ছিল না, যেখান দিয়ে মুসলিমরা শাম সাগরে (পূর্ব ভূমধ্যসাগর) নামতে পারে। মিশর থেকে নিয়ে আধুনিক ইসরাইল হয়ে বর্তমান তুর্কির এন্টিয়ক (ইস্তাকিয়া) পর্যন্ত বিশাল বিস্তৃত পুরো উপকূলটাই ছিল ক্রুসেডার নিয়ন্ত্রিত। তাই বাইবার্স চেয়েছিলেন শাম সাগরে প্রবেশের একটিমাত্র বাতায়ন খুলতে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। তাই দেখা গেলো মাত্র তিন বছরের মাথায় একটিমাত্র

বাতায়নের স্থলে বাইবার্সের জন্য খুলে গেলো আস্ত একটা করিডোর। মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে পড়লো ইসরাইলের প্রায় সমগ্র উপকূল! এই তিন বছরে পার্শ্ববর্তী সবগুলো বন্দর বাইবার্সের করতলগত হওয়ায় এবার কিংডম অব জেরুসালেমের ছিটমহল হয়ে উঠলো জাফা! সাফাদ বিজয়ের পর বাইবার্সের চোখ এবার এই ছিটমহলের উপর পড়লো। তিনি চাইলেন জাফা (جافا) অধিকার করে পুরো উপকূল থেকে খ্রিস্টান উপস্থিতির অবসান ঘটাতে। সেমতে সাফাদ বিজয়ের পরই ১২৬৭ সালে হঠাৎ করেই সেখান থেকে তিনি দুঃস্বপ্নের মতো উদয় হলেন আসকালানে। বাইবার্স ঝড়ে সামনে খড়কুটোর মতো উড়ে গেলো ক্রুসেডের সব প্রতিরোধ। সহসাই অধিকার করে নিলেন শক্তিশালী আসকালান (عسقلان) দুর্গ। আসকালানে না থেমে বাইবার্স ঝড়োগতিতে এগিয়ে চললেন জাফা অভিমুখে। ক্রুসেডাররা প্রস্তুত হয়ে ওঠার আগেই দুর্ধর্ষ মামলুক বাহিনী হামলে পড়লো জাফার উপর। প্রায় বিনা বাঁধায় সুলতান বাইবার্স কিংডম অব জেরুসালেমের আরো একটি ডাচি অধিকার করে নিলেন। জাফার ক্রুসেডাররা বাইবার্সের সাথে পাল্লা দিয়ে শক্তি পরীক্ষায় না নামায় এদেরকে প্রাণে মারা হলো না; বরং দাস হিসেবে বাজারে বিক্রি করে দেওয়া হলো। জাফা বিজয়ের মধ্যদিয়ে এবার আধুনিক ইসরাইলের পুরো উপকূল মুসলিম নিয়ন্ত্রণে চলে এলো। সমূলে উচ্ছেদ হলো ক্রুসেডের বিষবৃক্ষ। ভাবা যায়! মাত্র সাড়ে তিন বছর আগেও পটভূমি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত!

সাকিফ আরনুন। ক্রুসেডরাজ্য কিংডম অব জেরুসালেমের জাফা ডাচির অন্তর্গত সুদূর লেবাননের দুর্ভেদ্য একটি দুর্গ। সাকিফ গোত্রের লোকেরা লেবানন পাহাড়ের পাদদেশে আরনুন (أرنون) নামক স্থানে এই দুর্গ নির্মাণ করেছিল বলেই ইতিহাসে এটি সাকিফ আরনুন নামে পরিচিত। ১১৩৮ সালে জেরুসালেম রাজা ফগ সমুদ্রতট থেকে ১৮শ ফুট উঁচুতে অবস্থিত এই দুর্গ দখল করে এর নাম দেন বিওফোর্ট (Beaufort)। ১১৯০ সালে গাজি সালাহউদ্দিন আইয়ুবি দুর্গম এ দুর্গটি অধিকার করেন। কিন্তু ১২৫০ সালে তারই অপদার্থ উত্তরসূরী সুলতান তুরান শাহর সময়ে এই দুর্ভেদ্য দুর্গ ক্রুসেডাররা পুনরায় দখল করে নেয়। তখন থেকে ১২৬৭ সাল পর্যন্ত দুর্গটি খ্রিস্টানদের অধীনেই রয়েছে।

১২৬৩ সালের শুরুর দিকে ক্রুসেডরাজ্য কিংডম অব জেরুসালেমের বিস্তৃতি ছিল প্রায় পুরো আধুনিক ইসরাইল ও বর্তমান লেবাননের অংশবিশেষ নিয়ে। লেবাননের বাকি অংশ ছিল অপর ক্রুসেডরাজ্য কিংডম অব ত্রিপোলি নিয়ন্ত্রিত। ১২৬৩ সাল থেকে শাম সাগরের উপকূলে বাইবার্সের মুহূর্মুহ আক্রমণ শুরু হলে ১২৬৭ সালে এসে কিংডম অব জেরুসালেমের বর্তমান ইসরাইলের অংশটুকু প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তখনো কিন্তু লেবানন অংশটুকু যথারীতি বহাল থাকে।

এবার বাইবার্স সেদিকেই হাত বাড়ালেন। জাফা বিজয়ের পর ১২৬৭ সালে তিনি লেবাননের দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হন। আর তখনই খবর আসে বাইবার্সের সবচে' বড় সুহদ সিরওর্দার পরাক্রমশালী মুসলিম শাহানশাহ বার্কো খান ইন্তেকাল করেছেন। তদস্থলে মেঙ্গু তিমুর খান সিংহাসনে আসীন হয়েছেন। তিমুর খান বিধর্মী হলেও অন্যান্য মোঙ্গলদের মতো ইসলাম বিদ্বেষী ছিলেন না। বলা যায় মুসলিমবান্ধবই ছিলেন। আর একারণেই বাইবার্সের সাথে বার্কো খানের কৃত মৈত্রীচুক্তি তিনি যথারীতি বহাল রাখেন।

বার্কো খানের মৃত্যুশোকে মুহ্যমান বাইবার্স বাইতুল মাকদিসে যাত্রাবিরতি করেন। পবিত্র নগরীতে তিনি বার্কো খানের জন্য দোআ মাহফিল ও কুরআন খতম করেন। ইয়াতিম-দুঃস্থদের মাঝে অর্থ-খাদ্য বিতরণ শেষেই তিনি ফের উত্তরমুখী যাত্রা শুরু করেন।

লেবানন পানে বাইবার্সের এ অভিযানে প্রথমেই তার সামনে পড়ে সাকিফ আরনুন দুর্গ। বর্তমানে যা কালাত সাকিফ নামে পরিচিত। আরনুনের ক্রুসেডাররা বিধ্বংসী বাইবার্সের সক্ষমতা সম্পর্কে ভালোই জানতো, তাই তারা যুদ্ধের ঝুঁকি নিল না। বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করে তারা বাইবার্সের দয়া ভিক্ষা চাইলো। বাইবার্সও ক্রুসেডারদের প্রতি দয়া করলেন! তার নীতিই ছিল “মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেররা অস্ত্র ধরবে না। সবসময় নত হয়ে থাকবে। অস্ত্র ধারণ করলেই তারা ক্ষমার অযোগ্য বিবেচিত হবে। প্রয়োজনে হত্যা করা হবে। তারা দয়া ভিক্ষা চাইলেই কেবল দয়া করা হবে।”

এই নীতি অনুযায়ী বাইবার্স সাকিফ আরনুনের অধিবাসীদের নিরাপদে সীমান্ত পার হবার সুযোগ দিলেন। সাকিফ আরনুন বিজয়ের মাধ্যমে লেবানন ভূখণ্ডে অবস্থিত জেরুসালেম রাজ্যের শেষ মাটিটুকুও বাইবার্স অধিকার করে নিলেন।

বাইবার্স ঝড়ে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূল যখন লণ্ডভণ্ড, ঠিক তখনই সুলতান বাইবার্সের কাছে খবর আসে তার বীরবিক্রম সেনাপতিদ্বয়ের হাতে গোটা সিলিসিয়া বিজিত হয়ে গেছে। বাইবার্সের এদিকের কাজও প্রায় শেষ। ক্রমাগত বাইবার্স থাবায় জেরুসালেম রাজ্য এখন পুরোই বিধ্বস্ত। এই সুলতান বাইবার্স এবার নববিজিত সিলিসিয়ার দিকে যাত্রা শুরু করলেন। ১২৬৭ সালে সদ্য অধিকৃত সিলিসিয়ার রাজধানী সিস-এ পৌঁছেই তিনি এর অবকাঠামোগত উন্নয়নে মনোযোগী হলেন। ঢেলে সাজালেন সার্বিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা। সীমান্তবর্তী দুর্গসমূহ সংস্কার করে এবং সিলিসিয়ার প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৈন্য মোতায়েন করে একে কঠোর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন।

অবশ্য পরবর্তীতে খ্রিস্ট লিও পালিয়ে না বেড়িয়ে এন্টিয়ক থেকে সিলিসিয়া ফিরে এলে পূর্ণ আনুগত্যের শর্তে তাকেই সিলিসিয়ার মামলুক গভর্নর নিয়োগ

দেয়া হয়। ফলে প্রিন্স লিও বাইবার্সের আজ্ঞাবাহী দাসে পরিণত হন এবং মোঙ্গল ও ক্রুসেডারদের সাথে আগের সব সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেন।  
 বাইবার্সের রাজনৈতিক ও সামরিক চাল বোঝার সাধ্য মোঙ্গল বা ক্রুসেডার কারোরই ছিল না। তারা সাদা চোখে এটাই দেখতে পেলো যে, হেথুম বাইবার্সের আনুগত্য স্বীকার না করায় সিলিসিয়ার পতন ঘটলো। কিন্তু সিলিসিয়া দখলের পেছনে বিচক্ষণ বাইবার্সের এটা ছাড়াও আরো একটা দূরদর্শী চিন্তা কাজ করছিল! আর সেটা হচ্ছে ইলখানাতের ছত্রছায়া থেকে এন্টিয়ককে মুক্ত করা! যা এতোদিন ভায়া সিলিসিয়া হয়ে আসছিল। কারণ তার পরবর্তী টার্গেটই তো এই এন্টিয়ক! স্বপ্নের এন্টিয়ক যে তাকে আশৈশব হাতছানি দিয়ে ডাকছে!



১২৬৭ সাল। পুরো সিলিসিয়া এখন মামলুক সালতানাধীন। বাইবার্সের দখলে আসার আগে এটি নামে খ্রিস্টান শাসিত হলেও কার্যত ছিল মোঙ্গল নিয়ন্ত্রিত। কৌশলগত অবস্থানের কারণে আঞ্চলিক ভূরাজনীতিতে এই সিলিসিয়া ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এর অবস্থান ছিল হালাকু খান নিয়ন্ত্রিত ইলখানাত আর বাইবার্স শাসিত মামলুক সালতানাতে ঠিক মাঝ বরাবর। একই সাথে উত্তর দিক থেকে এটি অপর খ্রিস্টান রাজ্য এন্টিয়ককে দেয়ালের মতো ঢেকেও রেখেছিল। তাই এন্টিয়কের সাথে ইলখানাতের কোনো স্থল সীমানা ছিল না। ফলে এন্টিয়ক-ইলখানাত সার্বিক যোগাযোগ, মোঙ্গল-ক্রুসেড মৈত্রীর রসায়ন সরবরাহের একমাত্র মাধ্যম ছিল এই সিলিসিয়া। তখন এন্টিয়ক ছিল সিলিসিয়ার করদরাজ্য। আবার সিলিসিয়া ছিল খোদ ইলখানাতের করদরাজ্য। সে হিসেবে সিলিসিয়া-এন্টিয়ক উভয়টাই ছিল মোঙ্গল নিয়ন্ত্রিত। যার সরল অর্থ, এন্টিয়ক যদি হয় ইলখানাতের বাম হাত-সিলিসিয়া ডান হাত। এতোদিন ইলখানাত তার উভয় হাত দিয়েই এ অঞ্চলে আধিপত্য খাটাচ্ছে। বাইবার্সের কাছে যা ছিল রীতিমত অসহ্যকর।

আগেই বলা হয়েছে, বাইবার্সের সময়ে এসে ক্রুসেড তার চিরচেনা রূপটাই হারিয়ে বসেছিল। তখন ক্রুসেডাররা অপ্রতিরোধ্য বিশ্বশক্তি মোঙ্গলদের সাথে দাসত্বের আঁতাত গড়ে তুলেছিল। সে সুবাদে সময়ে-সময়ে শামানবাদী মোঙ্গলরাও জড়িয়ে পড়েছিল রক্তাক্ত এ ধর্মযুদ্ধে। মুসলিম ভূখণ্ডের সীমান্ত

লাগোয়া হওয়ায় তৎকালীন পাঁচটি মোঙ্গল রাজ্যের মধ্যে একমাত্র ইলখানাতই ক্রুসেডারদেরকে সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা করতো। সেসময় পুরো লেভান্টে তিনটি ক্রুসেডারাজ্য ছিল—এন্টিয়ক, কিংডম অব ত্রিপোলি ও কিংডম অব জেরুসালেম। সবগুলো রাজ্যই ছিল ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলজুড়ে বিস্তৃত। অবস্থানগতভাবে ছিল উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বী—অনেকটা করিডোর সদৃশ। অবশ্য এ করিডোরে তিনটি খ্রিস্টান রাজ্যের মধ্যে একটি কুচক্রি হাশাশিন রাজ্যও ছিল। সবগুলো রাজ্যেরই পশ্চিম সীমান্তে ছিল ভূমধ্যসাগরের আদিগন্ত নীল জলরাশি। দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল নিরবচ্ছিন্ন মামলুক সীমান্ত। শুধু একটা দিকই ছিল খোলা—উত্তর দিক। অর্থাৎ এন্টিয়ক-সিলিসিয়া সীমান্ত। আর এ সীমান্ত দিয়েই চলতো ক্রুসেড-মোঙ্গল দহরম-মহরম। সিলিসিয়া খ্রিস্টান রাজ্য হওয়ায় উত্তরের ইলখানি মোঙ্গলরা সর্বপ্রথম সিলিসিয়া হয়ে করিডোরের প্রথম রাজ্য এন্টিয়ক, অতঃপর হাশাশিন রাজ্যের উপর দিয়ে লেবাননভিত্তিক ত্রিপোলি রাজ্য, এরপর করিডোরের শেষ ভূখণ্ড ফিলিস্তিনভিত্তিক জেরুসালেম রাজ্যের সাথে সার্বিক যোগাযোগ রক্ষা করতো। বলা যায়, এই সিলিসিয়ার মাধ্যমেই পুরো লেভান্টে ছড়িয়ে থাকা তিন-তিনটি ক্রুসেডারাজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতো মোঙ্গলরা। এসব কারণেই সিলিসিয়া তখন ছিল আঞ্চলিক রাজনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দু।

১২৬৬ সালে বাইবার্স কর্তৃক সিলিসিয়া অভিযান বাহ্যত যদিও প্রতিশোধমূলক ছিল, মূলত কিন্তু শুধুই তা নয়। রণনিপুণ বাইবার্সের আসল উদ্দেশ্য ছিল পুরো সিলিসিয়া তার অধীনে এনে অত্র অঞ্চলে একক মোঙ্গল প্রভাব খর্ব করা। সেইসাথে এন্টিয়কসহ লেভান্টে জেঁকে বসা তিনটি ক্রুসেড রাজ্যকেই একসাথে মোঙ্গল সংশ্লিষ্টতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। অতঃপর নিঃসঙ্গ এন্টিয়ককে সহজেই পুনরুদ্ধার করে উম্মাহকে ১৭০ বছরের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়া। বাস্তবে হলোও তাই। সিলিসিয়া বিজয়ের মধ্যদিয়ে ইলখানাতের ডান হাতটা (সিলিসিয়া) কাটা তো গেলোই, বাম হাতটাও (এন্টিয়ক) সংযোগহীন অবশ পড়ে রইলো। এবার একদিক ভূমধ্যসাগর, অপর তিন দিক মামলুক সীমান্তের বেষ্টনিতে পড়ে দুনিয়ার বৃহৎ কারাগারে পরিণত হলো এন্টিয়ক। অনেকটা হামাস নিয়ন্ত্রিত আজকের গাজা ভূখণ্ডের মতোই একই অবস্থা হলো লেবাননভিত্তিক কিংডম অব ত্রিপোলিরও। বাইবার্স ঝড়ে ততোদিনে অবশ্য এ করিডোরের সর্বদক্ষিণের রাজ্য কিংডম অব জেরুসালেম লুণ্ঠন হয়েই গেছে! এবার তাই ত্রিপোলি ও এন্টিয়কের পাল্লায় বাইবার্স সিলিসিয়ার অধিকার বুঝে নিয়েই প্রথমে হাত বাড়ালেন দুর্জয় দুর্গ এন্টিয়কের দিকে।

এটা সেই অজেয় দুর্গ, যুগে যুগে যার পাদদেশে অসংখ্য মুসলিম বাহিনী মাথা কুটে মরেছে—তবু এর লৌহকপাট কোনোকালেই উন্মুক্ত করা যায়নি। এ দুর্গের

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এতোটাই দুর্ভেদ্য; স্বয়ং ইমাদউদ্দিন জঙ্গি, নুরউদ্দিন জঙ্গির মতো ক্ষণজন্মা বীর সেনানায়কদের পর্যন্ত সেখান থেকে বারবার ব্যর্থ হয়েই ফিরতে হয়েছে! দুর্বোধ্যতায় এ দুর্গ ছিল অনেকটাই কনস্টান্টিনোপলের মতো। উন্মত্ত ক্রুসেডের সূচনাতেই খ্রিস্টানরা এটি দখলে নিয়ে আজ (১২৬৮) পর্যন্ত করায়ত্ত করে রেখেছে! এ দীর্ঘ সময়ে দুনিয়ার মানচিত্রে হাজারো পরিবর্তন ঘটলেও এন্টিয়কের ভাগ্য আর বদলায়নি। সুলতান বাইবার্স সব জেনেই শৈশবকাল থেকে দুর্জয় এ দুর্গটিকে জয় করার স্বপ্ন বুকে লালন করে আসছেন! এবার সে সুযোগ এলো বলে!

এন্টিয়ক। আধুনিক তুরস্কের হাতায় (Hatay) প্রদেশের অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগরী। বর্তমান নাম এন্তাকিয়া (Antakya)। শহরটির গোড়াপত্তন করেন গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের সেনাপতি এবং সেলুসিড রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সেলুকাস নিকেটর। খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ সালে শাম-আনাতোলিয়া সীমান্তে আসি নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত এই শহরটির নাম তিনি তার পুত্র এন্টিওকাসের নামেই রাখেন এন্টিয়ক। সেলুকাসের সময়েই শহরটি সেলুসিড সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। গ্রিক, রোমান ও বাইজান্টাইন শাসনামলে এই এন্টিয়ক ছিল পুরো শাম অঞ্চল এমনকি পুরো এশিয়া অংশেরও রাজধানী। রোমান আমলে এন্টিয়ক ছিল পুরো সাম্রাজ্যের বৃহত্তম তিনটি শহরের অন্যতম একটি। খ্রিস্টজগতের কাছে জেরুসালেম, কনস্টান্টিনোপল ও রোমের মতোই পবিত্র নগরী হিসেবে এন্টিয়ক ছিল সমান বিবেচিত।

৬৩৭ সাল। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর রা.'র শাসনকাল। দিগ্বিজয়ী মুসলিম বাহিনী সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে এন্টিয়ককে সর্বপ্রথম মুসলিম নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। সে সময় থেকেই এটি ইন্তাকিয়া নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। আর তখন থেকে টানা ৪৬১ বছর সেখানে ইসলামি শাসন বহাল থাকে। ১০৯৫ সালে পোপ দ্বিতীয় আরবান কর্তৃক প্রথমবারের মতো ক্রুসেড ঘোষিত হলে ক্রুসেডাররা বানের পানির মতো পবিত্র ভূমির দিকে ধেয়ে আসে। ১০৯৭ সালে খ্রিস্টান সেনাপতি বোহেমন্ড ৩০ হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে এন্টিয়কের উপর চড়াও হন। সালজুক আমির মাসিউদ্দিন মাত্র ৬ হাজার সৈন্য নিয়েই রুখে দাঁড়ান। গুরু হয় দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। তুমুল প্রতিরোধের মুখেও খ্রিস্টানরা পিছু হটেনি। টানা সাতমাস তারা এন্টিয়ক অবরোধ করে রাখে। কারণ তাদের বিশ্বাসমতে ঈসা আ.কে বিদ্ধকারী কথিত সেই ক্রুশদণ্ড তখন এই শহরেই রক্ষিত ছিল। এটা হাতে পেতেই তাদের এই মরিয়ানভাব। অবশেষে আর্মেনীয় এক সৈন্যের বিশ্বাসঘাতকতায় ১০৯৮ সালের ৩ জুন এন্টিয়ক চলে যায় খ্রিস্টীয় জবরদখলে। দখল পরবর্তী খ্রিস্টীয় গণহত্যার কিঞ্চিৎ



আলোকপাত পরে আসছে। এ দখলদারিত্ব বহাল থাকে টানা ১৭০ বছর। বাইবার্স টর্নেডো আপতিত না হওয়া পর্যন্ত সেখানে নিরবচ্ছিন্ন চললো ক্রুসেডের অপশাসন।

ভৌগলিক বিবেচনায় এন্টিয়ক তখন ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে। বিশ্ব সভ্যতায় রোমানদের সেরা অবদান যে বিস্ময়কর মহাসড়ক—যে উন্নত বিশ্বরোড তিন মহাদেশকে রোমের অধীনে এনে দিয়েছিল সেই রোমান রাজপথ এগিয়ে গিয়েছিল এই এন্টিয়কের বুক চিরেই। আঁসি নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত হওয়ায় শামের মূল ভূখণ্ড থেকে এই নদীপথেই সব সরবরাহ আসতো। আপতকালীন পানির জন্য শহরের পূর্বদিকে ছিল সুবিশাল এক হ্রদ। পশ্চিমেই ছিল ভূমধ্যসাগর। এ সাগর পথেই ক্রুসেডাররা ইউরোপ থেকে লেভান্টে সৈন্য, রসদ ও অস্ত্র পাচার করতো। এসব ছাড়াও দুর্লভ শহররক্ষা প্রাচীর বিশাল এ মহানগরীকে করে তুলেছিল বর্ণনাভীত দুর্ভেদ্য। অবিশ্বাস্য সব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কারণে তখনকার দুনিয়ায় এন্টিয়ক সত্যিই ছিল অন্যতম নিরাপদ শহর। এর পাষাণ প্রাচীরই ইমাদউদ্দিন ও নুরউদ্দিন জঙ্গির মতো পাহাড়ের সাথে টক্কর নিয়েছিল। রুখে দিয়েছিল তাদের প্রাণান্ত অগ্রযাত্রা। কিন্তু চিতারাজ বাইবার্সের বজ্রধাবা এবার আর সহিতে পারলো না এন্টিয়কের অজেয় দুর্গ!

১২৬৭ সাল। সুলতান বাইবার্স সাকিফ আরনুন পদানত করার পরপরই সরাসরি নববিজিত সিলিসিয়া আসায় ক্রুসেড-মোগল সবাই ধরে নিল, সুলতান নিশ্চয় সিলিসিয়ার প্রাশাসনিক ব্যবস্থাপনা তদারকির জন্যেই এসেছেন। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও একথা কেউ টের পায়নি, সুলতান বাইবার্সের স্বয়ং সিলিসিয়া আগমন এন্টিয়ক আক্রমণের উদ্দেশ্য থেকেই! এমনকি খোদ সিলিসিয়া অভিযানটাই মূলত ছিল আরাধ্য এন্টিয়ক অভিযানের একটা ভূমিকামাত্র!

১২৬৮ সাল। সুলতান বাইবার্সের হামলার সময় এন্টিয়কের রাজা ছিলেন চতুর্থ বোহেমন্ড। মজার ব্যাপার হলো, এন্টিয়কের প্রথম রাজার নামও ছিল বোহেমন্ড। চতুর্থ বোহেমন্ড একই সাথে কিংডম অব ত্রিপোলিরও রাজা ছিলেন। তাই তিনি এন্টিয়ক থেকে তার দরবার ত্রিপোলিতে স্থানান্তর করে নিয়েছিলেন। অবশ্য এন্টিয়ক-ত্রিপোলির অবস্থান কাছাকাছি হলেও, সীমান্ত সংযোগ ছিল না। মাঝে ছিল ছোট্ট একটা হাশাশিন রাজ্য। বাইবার্সের সিলিসিয়া আগমনের সংবাদে রাজা বোহেমন্ড ত্রিপোলিতে থাকাই সঙ্গত মনে করলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, বাইবার্স অগত্যা যদি সিলিসিয়া থেকে এন্টিয়কের উত্তর দিকে আক্রমণ করেই বসেন; তাহলে হাশাশিন রাজ্যের উপর দিয়ে প্রয়োজনে তিনি দক্ষিণ দিক থেকে এন্টিয়কের সাহায্যে এগিয়ে যেতে পারবেন। বাইবার্সও সেটা জানতেন। সে আশঙ্কাতেই তিনি হাশাশিনদের রাজধানী মাসইয়াফে দূত পাঠিয়ে কড়া নির্দেশ

দিলেন: “বোহেমন্ড যেনো তাদের রাজ্যের ভেতর দিয়ে কোনো অবস্থাতেই এন্টিয়কে যাতায়াত করতে না পারে।”

সব প্রস্তুতি সম্পন্নের পর সুলতান বাইবার্স আচমকা তার সৈন্যদেরকে এন্টিয়কের উত্তর প্রান্তে হাজির হবার নির্দেশ দিলেন। বাইবার্স অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এন্টিয়ক ঘেরাও করে স্থানে স্থানে এমন সব ভারী-ভারী দূরপাল্লার নাফতুন বসাতে লাগলেন, যা দেখেই ক্রুসেডারদের পিলে চমকে উঠলো! মৃত্যু-ধ্বংস তাদের চোখের সামনে নাচানাচি করতে লাগলো। তারা বুঝে নিল, এবার তারা বাইবার্সের পাল্লায় পড়েছে! বিধায় এন্টিয়কের আর রক্ষা নেই!

তখন এন্টিয়কের সেনাপ্রধান ছিলেন সিমন্ মাস্কেল। তিনি শুধু এন্টিয়কের সেনাপতিই ছিলেন না; বরং এন্টিয়কের সবচে’ ক্ষমতাধর আমাত্যও ছিলেন। কারণ তার স্ত্রী ছিলেন স্বয়ং এন্টিয়করাজ বোহেমন্ডের বোন। মুসলিম বাহিনী এন্টিয়কের অবরোধ এখনো শেষ করতে পারেনি—যেই তারা দক্ষিণের আসি নদীর দিকে ঘেরাও করতে যাবে, অমনি সিমন্ মাস্কেল তাদের উপর প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ চালিয়ে বসেন। অবশ্য তার দুঃসাহসী এ আক্রমণ পুরোপুরিই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মামলুকদের ছত্রভঙ্গ করতে গিয়ে নিজেই শোচনীয়ভাবে পরাজিত এবং সসৈন্যে ধৃত হন। আর এভাবেই শুরু হয় এন্টিয়কবাসীর দুর্দশা। এন্টিয়কের দুর্গপাঁচিল ছিল অবিশ্বাস্যরকম দুর্ভেদ্য। অসম্ভব দুর্লভ, অজেয়। অনেকটা কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীরের মতোই এর দেয়ালগাত্র ছিল সুদৃঢ় ও উঁচু। কিন্তু এতো বড় একটা শহরের মাইলের পর মাইল বিস্তৃত প্রাচীর পাহারা দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত সৈন্য তখন এন্টিয়কে বিদ্যমান ছিল না। কারণ সেনাবাহিনীর বৃহৎ একটা অংশ সিমন্ মাস্কেলের বোকামির ফলে যুদ্ধের আগেই মুসলিমদের হাতে হয় নিহত, না হয় বন্দি হয়ে আছে। আর সবচে’ বড় অংশটি রাজা বোহেমন্ডের সাথে এন্টিয়কের বাইরে বর্তমানে ত্রিপোলিতে আটকা পড়ে আছে। ফলে ক্ষুদ্র একটি অংশই এখন কেবল এন্টিয়ক রক্ষা নিয়ে নিয়োজিত রয়েছে।

শঙ্কিত এন্টিয়কবাসীর মনে ত্রাস ছড়াতে বাইবার্স এবার নিজ বাহিনীকে নাফতুন থেকে নিরবচ্ছিন্ন ভারী-ভারী পাথর ও জ্বলন্ত নাফতুন নিক্ষেপের নির্দেশ প্রদান করেন। সেইসাথে শহরবাসীকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের আদেশও দেন। নগরবাসীর কোনো সাড়া না পেয়ে অবশেষে শুরু হলো বাইবার্স ঝড়! নাফতুনের বিধ্বংসী অগ্নিগোলায় পুরো শহর ঝলসে উঠলো। অসহায়বোধ করলো শহরবাসী। প্রকাণ্ড সব পাথরের অবিরাম আঘাতে কেঁপে কেঁপে উঠলো এন্টিয়কের লৌহপ্রাচীর। নিজেদের ভবিষ্যৎ চিন্তায় তারা তাই আতঙ্কিত হয়ে পড়লো। এদিকে বাইরের কোনো সাহায্যের ক্ষীণতম আশাটুকুও তখন নেই।

অবশ্য সে সুযোগও ছিল না। বাইবার্স যে আটঘাট বেঁধেই নেমেছেন। তাই তারা না পারছে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে আর না পারছে অসহায় আত্মসমর্পণ করতে! কারণ বাইবার্সকে তারা ভালোই চেনে। ১৭০ বছর আগে খোদ এ শহরেই বিজয়ী খ্রিস্টান বাহিনী কর্তৃক বিজিত মুসলমানদের উপর যে নারকীয় গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল, স্বয়ং তারাও এটা ভুলেনি! জাত্যাভিমानी বাইবার্স ভুলবেন কী করে!

এন্টিয়কের এ দূরাবস্থায় রাজা বোহেমন্ড ত্রিপোলি থেকে তখনই এগিয়ে আসেন। হাশাশিন গুপ্তঘাতকদের সময় যেহেতু শেষ হয়ে এসেছিল, তারা তাই বাইবার্সের নিষেধ অগ্রাহ্য করে বোহেমন্ডক তাদের রাজ্যের ভেতর দিয়ে চলাচলের সুযোগই শুধু দেয়নি; বরং তাকে পথ দেখিয়ে পর্যন্ত নিয়ে যায়। হাশাশিন রাজ্য পেরিয়ে বোহেমন্ড একসময় এন্টিয়ক সীমান্তের ভেতরেও ঢুকে যান। কিন্তু অপরূদ্ধ দুর্গের কাছেও তিনি যেতে পারলেন না। কারণ সামান্য দক্ষিণেই তিনি সবিষ্টময়ে দেখলেন, দুর্ধর্ষ মামলুক বাহিনীর পতাকা পতপত করে উড়ছে! মুসলিম বাহিনী যে তারই প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে বসে আছে! আর তখনই তার মাঝে জেগে উঠলো পুরোনো বাইবার্স ভীতি।

আসলে এটা ছিল ঝানু সেনানায়ক সুলতান বাইবার্সের বাড়তি সতর্কতা! তিনি ধরেই নিয়েছিলেন, হাশাশিন (গুপ্তঘাতক) শয়তানরা তার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই বোহেমন্ডকে এন্টিয়ক যাবার পথ করে দেবে! সেমতে তিনিও পাল্টা ব্যবস্থাস্বরূপ বোহেমন্ডকে স্বাগত জানাতে স্বয়ং নিজেই উত্তর থেকে এদিকে এগিয়ে আসেন!

বাইবার্স দর্শনে সন্তুষ্ট বোহেমন্ড এন্টিয়ক ছেড়ে দিয়ে জান নিয়ে কোনোক্রমে আবারো ত্রিপোলিতে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তৎক্ষণাৎ ইউরোপের দুই খ্রিস্টান পরাশক্তি ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডকে এন্টিয়ক রক্ষার দোহাই দিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ফের ক্রুসেড ঘোষণার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেন। পবিত্র ক্রুসেডের রক্ষক এন্টিয়ক আক্রান্তের সংবাদে সারা ইউরোপে শোরগোল পড়ে যায়! হাহাকার উঠে পুরো খ্রিস্টজগতে! নড়েচড়ে বসেন স্বয়ং পোপ-চতুর্থ ক্রেমন্ট! তবে কি আবারো ঘোষিত হবে রক্তস্নাত ক্রুসেড? অষ্টম ক্রুসেড তাহলে অত্যাশঙ্ক?

মে ১২৬৮ সাল। সুলতান বাইবার্সের নেতৃত্বে এন্টিয়কের কঠিন অবরোধ চলছে। দুর্ভেদ্য এ শহরের উপর ক্ষণে ক্ষণে আছড়ে পড়ছে মামলুক ক্রোধ। নাফতার অহর্নিশ অগ্নিগোলা, বিশাল বিশাল পাথরের বিরামহীন আঘাতে ক্রমেই টলে উঠছে হাজার বছরের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ অজেয় দুর্গনগরীটি। মামলুক আক্রোশে ভূমধ্যসাগরের উত্তর-পূর্ব কোণের এ নগরীতে তাই কেয়ামতের আবহই বিরাজ করছে। বজ্র আঁটনির অবরোধের মধ্যেও একদিকে সুলতান বাইবার্স শহরের

উপর নিরন্তর গজব টেলে চলছেন, অন্যদিকে এর অধিবাসীদেরকে বারবার নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের নির্দেশও দিচ্ছেন।

এদিকে ক্রমাগত চাপে শহরবাসীর অবস্থাও হয়ে উঠলো খুবই সঙ্গীন। তারা ভেবে দেখলো, এমন অসম একটা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া আত্মহত্যারই নামান্তর। কারণ রাজা বোহেমন্ড স্বয়ং অনুপস্থিত। বাইবার্সের ভয়ে তিনি যুদ্ধ না করে বিশাল বাহিনী নিয়ে সীমান্ত থেকেই পালিয়ে গিয়েছেন। আবার সেনাপতি সিমন মাসেল তার বোকামির প্রায়শ্চিত্য করছেন সৈন্যে বন্দি হয়ে। তাই এন্টিয়ক রক্ষার জন্য বর্তমানে যে ১০ হাজার হাজার সৈন্য রয়েছে, এতো বড় শহর রক্ষায় এরা মোটেই যথেষ্ট নয়। সর্বোপরি এরা আবার নেতৃত্বহীনও। তাছাড়া বাইরের কোন সাহায্যের আশাও আপাতত নেই! অতএব যুদ্ধ করা মানে ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করা বৈ নয়। কেননা এ অবস্থা চলতে থাকলে আজ না হয় কাল শহরের পতন ঘটবেই! বাইবার্সের গতি-প্রকৃতি যা, তখন কিন্তু কারোরই রক্ষা হবে না।

এসব সাত-পাঁচ ভেবেই এন্টিয়কের অধিবাসীরা অবশেষে তাদের জীবন ভিক্ষার শর্তে আত্মসমর্পণে রাজি হয়। ১২৬৮ সালের ১৮ মে নগরবাসীর অসহায় আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে এন্টিয়ক পদানত হয়। বাস্তবে ধরা দেয় সুলতান বাইবার্সের আজন্ম লালিত অধরা সেই স্বপ্ন-এন্টিয়ক বিজয়! হাতছাড়া হবার ১৭০ বছর পর এন্টিয়কের দুর্গশীর্ষে সগৌরবে ফের ইসলামি পতাকা পতপত করে উড়লো!

কিন্তু বিপত্তি দেখা দিল অন্যত্র! শহরবাসী আত্মসমর্পণ করলেও এন্টিয়কের সেই ১০ হাজার সৈন্য অস্ত্রসমর্পণে অস্বীকৃতি জানালো। তারা শহরের মধ্যখানে অবস্থিত মূল দুর্গে জমা হয়ে শেষ প্রতিরোধ গড়ে তুললো। তাদের প্রত্যয়, শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও পবিত্র এ শহর তারা রক্ষা করবে। কিন্তু দুর্ধর্ষ মুসলিম বাহিনী সেই দুর্গকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে এমন প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করলো যে, মাত্র দুদিনের মাথায়ই ২০ মে ১২৬৮ সালে এ দুর্গেরও পতন ঘটলো! সাফ হলো ক্রুসেডের জঞ্জাল।

১০৯৮ সালে খ্রিস্টান সেনাপতি প্রথম বোহেমন্ড যখন দীর্ঘ সাত মাস অবরোধের পর এন্টিয়ক দখল করেন। তখন ক্রোধান্বিত ক্রুসেড বাহিনী প্রথমেই পুরো শহরে আগুন লাগিয়ে দেয়। নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল মুসলিম নাগরিককেই গণহত্যায় ঠেলে দেয়া হয়। মৃত্যুর আগে সকল নারীরা হয় গণহারে ধর্ষণের অসহায় শিকার। সকল মসজিদ-ধর্মীয় স্থাপনা নিমিষেই মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। ধর্মীয় ব্যক্তিদেরকে করা হয় গণজবাই। নির্বিচার লুটপাটের পর মুসলিম বাড়ি-ঘরগুলোকেও করা হয় ভূমিস্মাৎ। কুরআন-

হাদিসের গ্রন্থগুলোকে করা হয় অসম্মান, ছিন্ন-ভিন্ন। একজন মুসলিমও কেয়ামতের এ তাগুব থেকে সেদিন রক্ষা পায়নি। ১৭০ বছর ধরে এন্টিয়কের পাষণ্ড প্রাচীর সে নির্মমতার রাজসাক্ষী হয়ে আজও (১২৬৮) দাঁড়িয়ে আছে। এবার সে দেখলো ইতিহাসের উল্টোযাত্রা! দেখলো চিরকঠিন বাইবার্সের অগ্নিমূর্তি! বাইবার্স ১৭০ বছরের পুরোনো হিসেব এবার কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দিলেন। এন্টিয়কের খ্রিস্টানদের কাছ থেকে নিলেন চরম প্রতিশোধ! সীমাহীন উদারতার কারণে ইসলামি ইতিহাসে এমন পাই পাই হিসেবের প্রতিশোধ আসলেই খুব একটা নেই!

এন্টিয়ক বিজয়ের পর সুলতান বাইবার্স প্রথমেই এন্টিয়কের সমস্ত সামরিক ও ধর্মীয় স্থাপনা নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। তার নির্দেশে প্রত্যেক সৈন্য ও পাদ্রীদেরকে হত্যা করে দুর্গ ও গির্জাসমূহে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। এমনকি এন্টিয়কের বিখ্যাত শহররক্ষা প্রাচীরও ধ্বংস করে দেয়া হয়। বাইবার্সের এ নির্দেশে একদিনেই এন্টিয়কের ১৬ হাজার মানুষ নিহত হয়। তবে নিরস্ত্র ও নিরীহ কোন মানুষকে সেদিন হত্যা করা হয়নি। বাইবার্স সেদিন নিজের গনিমতের অংশটি ছেড়ে দিয়ে সৈন্যদের জন্য সব উন্মুক্ত করে দেন। এন্টিয়কের প্রতিটি বাড়িই সেদিন লুণ্ঠিত হয়। প্রাণে না মেরে সকল খ্রিস্টানকেই দাসে পরিণত করা হয়। মামলুক সৈন্যরা শুধু এন্টিয়ক থেকেই একলাখ দাস সংগ্রহ করে। বাইবার্সের বিরামহীন অভিযান ও বিজয়ের ফলে গনিমতের মালে এমনিতেই প্রতিটি মামলুক সৈন্য ধনী হয়ে গিয়েছিল। এবারের এন্টিয়ক বিজয়ের ফলে দেখা গেলো সৈন্যরা আরো বিত্তশালী হয়ে উঠলো। এমন কোনো সৈন্য ছিল না, যার ভাগে একাধিক দাস-দাসী পড়েনি। গনিমতের পরিমাণ এতো বেশি ছিল যে, সৈন্যরা গোটা শহর থেকে সম্পদ সংগ্রহ করে নিজেরা প্রয়োজন মতো রেখে বাকিটা রাস্তায় ফেলে দেয়! সেসব কুড়িয়ে টোকাইরা পর্যন্ত স্বচ্ছল হয়ে ওঠে!

অবশ্য ১৭০ বছর আগে মুসলিম নারীরা যেভাবে পথে-ঘাটে ক্রুসেডার কর্তৃক গণধর্ষিত হয়েছিল, এবার কিন্তু তার বিন্দুমাত্রও হলো না। এ ব্যাপারে বাইবার্স ছিলেন খুবই কঠোর। প্রতিশোধ নিতে গিয়ে শরিয়তের নির্ধারিত সীমা তিনি কোথাও, কখনো ছাড়াননি। পৌনে দুশ বছর আগে বোহেমন্ড এন্টিয়ক দখল করেই উমর রা. কর্তৃক নির্মিত মসজিদটি পর্যন্ত ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তাই বাইবার্স এর চরম প্রতিশোধ নিলেন—এন্টিয়কের সমস্ত গির্জা ও ধর্মীয় স্থাপনা ধ্বংস করে দিয়ে!

সুলতান বাইবার্স ছিলেন প্রচণ্ডরকম জাতিগতপ্রাণ এক মহান সৈনিক। ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা তার কাছে কখনোই পাত্তা পেতো না। তাই ক্ষণভঙ্গুর জাতির পুনর্গঠনরূপেই তার পুরো জীবনটা ওয়াকফ হয়ে গিয়েছিল! কাফেরদের বিরুদ্ধে

তাকে যতোটা একরোখা, জেদি ও কঠিন প্রকৃতির মনে হয়-মুসলিমদের সাথে তিনি কিন্তু ততোটা ছিলেন না। বিশেষত নিষ্ঠাবান মুসলমানদের জন্য সর্বদাই তিনি ছিলেন হামদর্দ, বন্ধুসুলভ। কাফেরদের বিরুদ্ধে বাইবার্সের এ কঠোরতাই মূলত তাকে চিরঅমরত্ব দিয়েছে। তার ইনসানিভিত্তিক কাঠিন্যেই ক্রুসেড মোঙ্গল-হাশাশিনরা পথ হারিয়েছিল। আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল পুরো বস্তুত তার গোটা জীবনটাই ছিল কুরআন বর্ণিত অনবদ্য সাহা...

“আশিদাউ আলাল কুফফার রুহামাউ বাইনাহুম” এর বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তার ভয়ঙ্কর সুন্দর এ রূপটাই এন্টিয়কের পরাজিত খ্রিস্টানরা সেদিন সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছিল। মুসলিমরা হয়েছিল মুগ্ধ, বিমোহিত। ইতিহাস থমকে দাঁড়িয়েছিল। হয়েছিল দায়মুক্ত! এন্টিয়কে সেদিন আসলে কী ঘটেছিল?

‘সীরাত আয যাহির বাইবার্স’ থেকে একখানা পৃষ্ঠা হুবহু তুলে দিচ্ছি: “মৃত্যু শহরের প্রতিটি দিক ও প্রতিটি রাস্তা দিয়ে এগিয়ে এলো। শহরের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত প্রতিটি ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলা হলো। তুমি শহরের প্রতিটি কোণে উঁকি দিলে তাদের লাশের স্তূপ দেখতে পাবে। আমাদের অশ্বারোহীরা (মামলুক) ঘোড়ার পদতলে নাইটদের মাড়িয়ে ফেললো।

আমরা তাদের উপর দিয়েই ঘোড়া চালিয়ে দিলাম। পুরো প্রদেশটি লুটে নেওয়া হলো। এর চাল ও খাদ্যশস্য সমানভাবে বণ্টন করে দেওয়া হলো। ক্রুসেডারদের স্ত্রী-কন্যাদের প্রকাশ্যে হাটে বেচে দেওয়া হলো। সমস্ত মূল্যবান সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হলো। ওদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোতে আগুন দেওয়া হলো। বাইবেলের অধ্যায়গুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দেওয়া হলো। তাদের সমস্ত পবিত্র বস্তুকে অপবিত্র করা হলো। যেসব সমাধিস্তম্ভ, পবিত্র তাবু ও গির্জাতে ওরা উপাসনা করতো, সেসব স্থানেই সকল পাদ্রি ও যাজকদের বলি দেওয়া হলো। মুসলিম প্রজারাও উৎসাহী হয়ে এই কাজে এগিয়ে এলো। তুমি এই শহরের যেদিকেই উঁকি দেবে, সেদিকেই আগুনের রাজত্ব দেখতে পাবে। আমরা এর সর্বত্রই আগুন লাগিয়ে দিয়েছি। আমি তোমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি, সেন্ট পল ও সেন্ট পিটারের গির্জার নাম-নিশানাও আমরা এখানেই ফেলেছি। ধুলোর সাথে মিশিয়ে দিয়েছি সবকিছু।”



১২৬৭ সালে গোটা সিলিসিয়া এবং ১২৬৮ সালে অজেয় এন্টিয়ক বিজয়ের মধ্য দিয়ে আধুনিক তুরস্কের বিস্তৃত ভূখণ্ড মামলুক শাসনাধীন চলে এলো। অথচ বাইবার্সের অভিযানের পূর্বে সেখানে মামলুক সালতানাত এক ইখিও প্রসারিত ছিল না! সুলতান বাইবার্সের প্রতি মহান আল্লাহর এ এক অপার অনুগ্রহ যে, বাইবার্স যে ক'টি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুক্ত করেছেন, তাতে মুসলিম শাসন দীর্ঘস্থায়ীই হয়েছে। এটা আসলেই বাইবার্সের আল্লাহ প্রদত্ত বরকতময় অমর কীর্তি!

এই এন্টিয়কের কথাই ধরুন, বাইবার্স সেই যে ১২৬৮ সালে এন্টিয়ক অধিকার করেছিলেন, সেই থেকে আজ পর্যন্ত ৭৪৯ বছর ধরে এন্টিয়ক মুসলিম অধিকারেই রয়েছে। তেমনি সিলিসিয়া, আজও সে ভূখণ্ড আধুনিক মুসলিম তুরস্কের অঙ্গীভূত হয়ে আছে!

আর পবিত্র জেরুসালেম! ১০৯৯ সালের ১৫ জুলাই ক্রুসেডাররা সর্বপ্রথম এটি দখলে নেয়। এরপর থেকে ১১৮৭ সাল পর্যন্ত টানা ৮৮ বছর সেখানে ক্রুসেডার অপশাসন অব্যাহত থাকে। ২ অক্টোবর ১১৮৭ সালে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ক্রুসেডার নাগপাশ থেকে একে মুক্ত করলেও এর উপর মুসলিম কর্তৃত্ব তখন ৪২ বছরের বেশি স্থায়ী হয়নি! ১২২৯ সালে সুলতান সালাহউদ্দিনের অযোগ্য উত্তরসূরী আল কামিল একে ক্রুসেডারদের হাতে তুলে দেন। দ্বিতীয়বার হাতছাড়া হবার ১৫ বছর পর আরেক আইয়ুবীয় সুলতান আস সালিহর তত্ত্বাবধানে, মূলত কিশোর বাইবার্সের বীরত্বপূর্ণ নেতৃত্বে পবিত্র জেরুসালেম ১২৪৪ সালে এসে ফের মুসলিম শাসনাধীনে আসে। তখন থেকে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত এই জেরুসালেম টানা ৭২৩ বছর যথারীতি মুসলিম অধিকারে থাকে। ১৯৬৭ সালে স্বদেশি বাইতুল মাকদিস চূড়ান্তভাবে জায়নবাদি ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণে যাবার পর থেকে আরো একজন সালাহউদ্দিনের অভ্যুদয়, একজন বাইবার্সের অবির্ভাবের প্রতীক্ষায় আল কুদসের সোনালি গুম্বুজ আজ পঞ্চাশটি বছর ধরে শুধরে ফিরছে!

১২৬৮ সালে এন্টিয়ক বিজয়ের মধ্য দিয়ে একমাত্র কিংডম অব জেরুসালেমের আঁকা নগরী এবং কান্ট্রি অব ত্রিপোলির লেবাননভিত্তিক সামান্য অংশ ছাড়া প্রায় পুরো লেভান্টই মুসলিম অধিকারে চলে আসে। ফলে শাম সাগরের পূর্ব উপকূলে একচ্ছত্র ক্রুসেড নিয়ন্ত্রণ আলাগা হয়ে পড়ে। মুসলিম দুনিয়ার জন্য অব্যাহত

হয়ে যায় ভূমধ্যসাগরের প্রবেশদ্বার। এতে ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের ব্যবসায়িক ধাক্কায় মারাত্মক ধ্বস নেমে আসে! স্বাভাবিকভাবেই তেতে ওঠে খ্রিস্টীয় ইউরোপ। সুর ওঠে ফের ক্রুসেড ঘোষণার! কী সে ধাক্কা? যার জন্য যুগ-যুগ ধরে ঘোষিত হয়ে আসছে সিরিজ হিংস্র ক্রুসেড? এবার রক্তাক্ত এই ক্রুসেডের স্বরূপ, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা যাক।

১০৯৫ সালের কথা। বাহ্যত পবিত্র ভূমি উদ্ধারের প্রত্যয় নিয়ে মূলত লেভান্ট গ্রাসের উদ্ভব বাসনায় পোপ দ্বিতীয় আরবান মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে প্রথমবারের মতো ক্রুসেড ঘোষণা করলেন। দ্বিশতবর্ষী উন্মত্ত এ ক্রুসেড নামে ধর্মযুদ্ধ হলেও; কার্যত এটি ছিল খ্রিস্টীয় ইউরোপের রাজনৈতিক নয়া খেল। পারম্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ভুলে দ্বিধা-বিভক্ত ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধ করাই ছিল এর অন্যতম লক্ষ্য। পরবর্তীতে ক্রুসেডের কল্যাণে বাস্তবে হয়েছিলও তা-ই। তাছাড়া খ্রিস্টীয় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যকে একটু-একটু করে গিলতে থাকা উদীয়মান মুসলিম শক্তি সালজুক রুমের হাত থেকে বাইজান্টাইন রাজধানী কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) রক্ষাও ছিল ক্রুসেডের আরো একটি অন্যতম লক্ষ্য। ক্রুসেডের সৌজন্যে সাময়িক হলেও তাদের সে উদ্দেশ্যও হাসিল হলো।

তবে পবিত্র ভূমি উদ্ধারের দোহাই দিয়ে ঘোষিত প্রথম ক্রুসেড এবং পরবর্তী সবগুলো ক্রুসেডেরই মূল উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন-দরিদ্র ইউরোপের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। বলা যায়, ধর্মীয় চেতনা ছিল হিংস্র এ ক্রুসেডের লেভেলমাত্র। মূলত ক্রুসেড ছিল আপাদমস্তক জঘন্য একটা ব্যবসায়িক ধাক্কা! ক্রুসেডের মাধ্যমে অনুন্নত ইউরোপের ইচ্ছে ও স্বপ্ন ছিল পুরো লেভান্ট (আধুনিক ইসরাইল, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, লেবানন ও তুরস্কের পশ্চিম উপকূল) করায়ত্ত করা। এতে করে উন্নত বিশ্বের (তৎকালীন মুসলিম বিশ্ব) গোটা ব্যবসা-বাণিজ্যটাই তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। কেননা পুরো লেভান্ট দখল করে নিলে মিশর থেকে তুরস্ক পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরের গোটা উপকূলীয় অঞ্চল মুসলিম বিশ্বের জন্য চিররুদ্ধ হয়ে পড়বে। তখন শামসাগরে (পূর্ব ভূমধ্যসাগর) মুসলিম দুনিয়াকে প্রবেশাধিকার দিয়ে কর হিসেবে প্রচুর অর্থ আদায় করা যাবে। তাই ক্রুসেডের গুরু দিকেই তারা লেভান্টে চড়াও হয়। সাধ্য থাকলেও তারা মুসলিম জাহানের ভেতরে প্রবেশ করেনি। কেবলমাত্র জেরুসালেম ও পুরো লেভান্ট দখল করেই ক্ষান্ত দেয়। আর তখন থেকেই শুরু হয় তাদের পরিকল্পিত কর ব্যবসা। যা একনাগাড়ে চললো ১১৮৭ সাল পর্যন্ত।

১১৮৭ সালে হাতিন প্রান্তরে ক্রুসেডের অমরযোদ্ধা সালাহউদ্দিন আইয়ুবির হাতে পুরো লেভান্টের সম্মিলিত ক্রুসেড বাহিনী বিধ্বস্ত হলে জেরুসালেমসহ পুরো লেভান্টের ক্রুসেডরাজ্যগুলো তাদের ঘরের মতোই ধ্বসে পড়ে। ফলে একের



পর অঞ্চল থেকে ক্রুসেড শাসনের অবসান ঘটে। এতে খ্রিস্টানদের বাণিজ্যিক স্বার্থে মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটে। মুখ খুবড়ে পড়লো রমরমা কর ব্যবসা। বরাবরের মতো গেলো গেলো রব ওঠে সমগ্র ইউরোপে। ফের ক্রুসেড ঘোষণার দাবিতে উচ্চকিত হয়ে উঠলো খ্রিস্টজগত। তাই ধর্মীয় চেতনার ছদ্মাবরণে ব্যবসায়িক ধাক্কায় এবার ক্রুসেডের নেতৃত্বে এগিয়ে এলেন খ্রিস্টীয় ইউরোপের সবচে' দুর্ধর্ষ ও জেদি সেনানায়ক স্বয়ং ইংরেজ সম্রাট রিচার্ড 'দ্য লায়নহার্ট'। জেরুসালেমসহ গোটা লেভান্ত পুনরুদ্ধারের শপথে ঘোষিত হলো তৃতীয় ক্রুসেড।

জেরুসালেম নয়; খ্রিস্টীয় ক্রুসেডের মূল লক্ষ্যই যে ব্যবসা ও টাকার ধাক্কা, সেটাই উলঙ্গভাবে বেরিয়ে আসে তৃতীয় ক্রুসেডের শুরুতে। কারণ রিচার্ড সাগর পাড়ি দিয়ে এসে পবিত্রভূমি জেরুসালেম উদ্ধারের কোনো চেষ্টাই করলেন না। তার পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ রইলো কেবল লেভান্টেই। তাই তিনি প্রথমেই ভৌগলিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আক্কা (আক্রা) অবরোধ করেন। গাজি সালাহউদ্দিন আইয়ুবি আত্মপ্রাণ চেষ্টা করেও আক্কার পতন রোধ করতে পারেননি! আক্কা পতনের পর থেকেই সালাহউদ্দিন আইয়ুবি লেভান্টের মাটিতে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে একের পর এক যুদ্ধে পরাজিত হতে থাকেন। লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, এসব যুদ্ধের প্রতিটিই কিন্তু সংঘটিত হয়েছিল লেভান্টে-কোনোটাই জেরুসালেমের আশপাশেও না। এতেই ক্রুসেডারদের মূল উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হয়ে যায়।

একের পর এক পরাজয় এবং জেরুসালেম বাদ দিয়ে রিচার্ডের লেভান্ট দখলের উদ্যম ইচ্ছা দেখে সালাহউদ্দিন বুঝে নিলেন, রিচার্ড দমবার পাত্র নয়। পুরো লেভান্ট হজম না করে এরা ফিরে যাবে না। তাছাড়া ১১৯২ সালে রিচার্ডের কাছে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবি আরসুফের যুদ্ধে শোচনীয় পরাজিত হলে তার সীমিত সেনাশক্তির অনেকটাই হ্রাস পেয়ে যায়। ফলে তিনি রিচার্ডের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন।

১১৯২ সালে রমলার সন্ধি অনুযায়ী সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবি জেরুসালেমের বিনিময়ে গোটা লেভান্ট ক্রুসেডারদের হাতে তুলে দেন। ক্রুসেডাররা ঠিক এটাই চেয়েছিল। তাই লেভান্ট পেয়েই তারা বর্তে যায়। পবিত্রভূমি গোল্লায় যাক, তাদের ব্যবসা টিকবেই হলো! লেভান্ট ফিরে পেয়ে এবার তারা পুরোনো কর ব্যবসার মাধ্যমে ফের মুসলিমবিশ্বকে চুষে নিতে শুরু করলো। এমনকি শামসাগরে প্রবেশের কর তারা দিন দিন বাড়িয়ে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেলো যে, কর পরিশোধ করতে করতেই মুসলিম বিশ্বের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়লো। কাপুরুষ আইয়ুবীয় সুলতান আল কামিল যুদ্ধ করে

লেভান্ট পুনরুদ্ধারের পরিবর্তে কেবল এই করের বোঝা থেকে নিষ্কৃতি পেতে এবং শামসাগরে অবাধ প্রবেশের শর্তে ১২২৯ সালে এসে খোদ জেরুসালেম খ্রিস্টানদের কাছে ছেড়ে দেন। অথচ তারই পূর্বপুরুষ সুলতান সালাহউদ্দিন এই জেরুসালেমের খাতিরেই গোটা লেভান্ট কুরবানি দিয়েছিলেন! মুসলিম জাহানের এ অবরুদ্ধ দশা চললো ১২৬০ সাল পর্যন্ত। সুলতান বাইবার্সের অভ্যুদয়ের পরেই আন্তে-আন্তে কাটতে শুরু করলো অন্ধকারের অমানিশা।

সুলতান বাইবার্স লেভান্টের গুরুত্ব ভালোই বুঝতেন। তাই ১২৬০ সালে মসনদে বসেই তিনি মোঙ্গলদের হাত থেকে শামসাগরের উপকূলীয় গাজা ভূখণ্ড অধিকার করে মুসলিম বিশ্বের জন্য সাগরে নামার ছোট্ট একটা ঘুলঘুলি সৃষ্টি করেন। তার ইচ্ছা ছিল, অচিরেই ক্রুসেডারদের গ্রাস থেকে আরো কিছু ভূখণ্ড কেড়ে নিয়ে ছোট্ট এ ঘুলঘুলিকে বৃহৎ একটা বাতায়নের রূপ দেবেন। কিন্তু কুদরতের ফয়সালা ছিল ভিন্ন! বাইবার্স চেয়েছিলেন একটিমাত্র জানালা, অথচ কালক্রমে পেয়ে গেলেন দরজা-জানালাগুদ্ধ পুরো বাড়িটাই!

১২৬৩ সাল। সুলতান বাইবার্স ততোদিনে মোঙ্গল তুফান সামলে নিয়েছেন। এবার তার শ্যেনদৃষ্টি পড়লো লেভান্টের প্রতি। শামসাগরে বহুদিনের পরিকল্পিত একটা বড়সড় বাতায়ন খুলতে এবার তিনি সরোষে আছড়ে পড়লেন ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে। একটিমাত্র টর্নেডো অভিযানে একমাত্র আক্কা নগরী ও লেবাননের অংশবিশেষ ছাড়া মুক্ত হলো লেভান্টের গোটা উপকূল। আর এভাবেই শামসাগরের আরাধ্য বাতায়নের স্থলে বাইবার্স পেয়ে গেলেন এর আস্ত করিডোরটাই। ফলে ক্রুসেডারদের কর ব্যবসা লাটে উঠলো! তেতে উঠলো পুরো ইউরোপ। অবশ্য ঘরে-বাইরে নানাবিধ চাপে থাকায় সময়টা তাদের মোটেই ভালো যাচ্ছিল না। তাই সাময়িকভাবে দুঃসহ সে জ্বালা তারা হজম করে নিল। কিন্তু অদম্য বাইবার্স যখন পুরো সিলিসিয়া পদানত করার পর ১২৬৮ সালে এসে সাগরপাড়ের কৌশলগত এন্টিয়কও অধিকার করে নিলেন, তখন তারা আর চুপ মেরে থাকলো না। এন্টিয়কের পতনে রীতিমতো তাদের আঁতে ঘা লাগলো। প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয় খ্রিস্টীয় ইউরোপে। পোপ চতুর্থ ক্লেমেন্ট আবার ক্রুসেডের ডাক দেন। ঘোষিত হয় অষ্টম ক্রুসেড। ক্রুসেডের দিকপাল হয়ে এবার ময়দানে আসলেন ইংরেজ যুবরাজ এডওয়ার্ড (পরবর্তীতে সম্রাট প্রথম এডওয়ার্ড)।

যুবরাজ এডওয়ার্ড নেতৃত্বে আসায় ইউরোপে আনন্দের জোয়ার বইলো। জয়ের ব্যাপারে খ্রিস্টানরা হয়ে উঠলো প্রচণ্ডরকম আত্মবিশ্বাসী। কারণ ইংল্যান্ডের সামরিক শক্তির উপর পুরো খ্রিস্টজগতের তখন আলাদা একটা আস্থা-বিশ্বাস ও সমীহভাব ছিল। সুলতান সালাহউদ্দিনের সাথে অন্য ইউরোপীয় সম্রাটরা কুলিয়ে

উঠতে না পারলেও; এই ইংল্যান্ডেরই রাজা রিচার্ড হচ্ছেন একমাত্র ব্যক্তি, যার সাথে অধিকাংশ যুদ্ধেই গ্রেট সালাদিন পরাজিত হয়েছেন। পোপের আহ্বানে সাড়া দিয়ে রক্তাক্ত এ ক্রুসেডে প্রিন্স এডওয়ার্ডের সারথি হলেন সাইপ্রাসের রাজা ফগ, ইলখানাত শাসক হালাকু খান পুত্র আবাগা খান, এমনকি ফরাসি সম্রাট নবম লুই-ও।

এই সেই নবম লুই, যিনি দু'দশক আগেও আরো একবার ব্যর্থ ক্রুসেডের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেই সপ্তম ক্রুসেডে এই বাইবার্সের কাছেই মানসুরাহর যুদ্ধে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন। ক্রুসেডের দীর্ঘ ইতিহাসে একমাত্র ইউরোপীয় সম্রাট হিসেবে তখন বন্দি হবার লজ্জাকর রেকর্ডও তিনিই গড়েছিলেন। পরে অবশ্য মুচলেকা দিয়ে মুক্তি পেয়ে যান।

ইউরোপজুড়ে এবার বিরাট প্রস্তুতি শুরু হলো। সাজ সাজ রব পড়লো খ্রিস্টানদের ঘরে ঘরে। সিদ্ধান্ত হলো, এবারের ক্রুসেডে সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্ব দেবেন মোঙ্গল নেতা আবাগা খান। যুদ্ধ চলবে একইসাথে জল ও স্থলপথে। তিন দিক দিয়ে যুগপৎ হামলার মধ্যদিয়েই শুরু হবে এবারের ক্রুসেড। নবম লুই মামলুক সালতানাতের পশ্চিম কোণ-আফ্রিকার তিউনিসিয়ায় আক্রমণ চালিয়ে অগ্রসর হবেন। এডওয়ার্ড ও সাইপ্রাসরাজ ফগ হামলা করবেন লেভান্টে। আবাগা খান চড়াও হবেন শামের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত দিয়ে। এভাবেই বেজে উঠলো অষ্টম ক্রুসেডের দামামা।

এদিকে অষ্টম ক্রুসেডের এ ডামাডোল এবং মোঙ্গল-ক্রুসেডারদের যৌথ মহাপরিকল্পনার বিষয়ে বাইবার্স ছিলেন সম্পূর্ণ বেখবর। তাই এন্টিয়ক বিজয়ের পর বাইবার্সের শৈয়ন দৃষ্টি পড়লো মাসইয়াফের উপর। এন্টিয়ক অবরোধের প্রাক্কালে এন্টিয়ক-ত্রিপোলিকে বিভক্তকারী লেভান্টের এই হাশাশিন রাজ্যটি বাইবার্সের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই বোহেমন্ডকে সর্বোতভাবে সহায়তা করছিল। যাতায়াতের করিডোর পর্যন্ত দিয়েছিল। বাইবার্স ভাবলেন, এবারে এদের একটা বিহিত করা অপরিহার্য কর্তব্য।

বাইবার্স পারবেন? যুগ যুগ ধরে উনিশটি দুর্ভেদ্য দুর্গের অজেয় এ রাজ্যকে পদানত করতে! কী হবে এবার? হাশাশিন বধ, নাকি ক্রুসেড-মোঙ্গল প্রতিরোধ!



জুন ১২৬৮ সাল। সুলতান বাইবার্স সদ্য বিজিত এন্টিয়ক থেকে রাজধানী কায়রোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। উদ্দেশ্য, টানা যুদ্ধের পর কিছুদিন বিশ্রাম এবং এই ফাঁকে হজ সম্পাদন। সুলতান বাইবার্সের বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি এতো যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যেও প্রায় প্রতি বছরই হজব্রত পালন করতেন। সেবারও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। হজ সম্পাদন করেই রণাঙ্গনের অমিত তেজী যোদ্ধা ফের যুদ্ধে নামতে মুখিয়ে উঠলেন। ১২৬৯ সালে পুনরায় তিনি শামে প্রত্যাবর্তন করেন। যথারীতি যুদ্ধসাজে। এবারের টার্গেট মাসইয়াফের অজেয়-অপ্রতিহত হাশাশিন গুপ্তঘাতকগোষ্ঠী। ক্রমাগত গুপ্তহত্যায় মুসলিম উম্মাহকে নেতৃত্বশূন্য-আতঙ্কিত করে তোলায় এমনিতেই এরা ছিল বাইবার্সের চক্ষুশূল। তদুপরি বাইবার্সের চোখে এদের সাম্প্রতিক অপরাধ ছিল আরো অমার্জনীয়। কারণ বাইবার্সের এন্টিয়ক অবরোধের প্রাক্কালে এই শয়তানরাই খ্রিস্টানদেরকে সর্বোতভাবে সহায়তা করেছিল। এমনকি বাইবার্সের কঠোর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ত্রিপোলি ও এন্টিয়করাজ চতুর্থ বোহেমন্ডকে তাদের ভূমির উপর দিয়েই সসৈন্যে ত্রিপোলি-এন্টিয়ক যাতায়াতের অবাধ করিডোর দিয়েছিল। এদের শায়েস্তা করতেই বাইবার্সের এবারের রণসাজ।

এদিকে ফেদাইনদের মূলোচ্ছেদে বাইবার্স লেভান্টমুখী হলেও অপরদিকে খোদ তাকে নিয়ে ইউরোপে তখন কী চলছে? ঘুণাক্ষরেও তিনি জানতে পারলেন না। টেরও পেলেন না ইতোমধ্যেই তার বিরুদ্ধে ঘোষিত হয়ে গেছে অষ্টম ক্রুসেড। বুঝতেই পারলেন না মোঙ্গল-খ্রিস্টান যৌথ প্রযোজনার সর্বাগ্রাসী ক্রুসেড সয়লাব ধেয়ে আসছে যুগপৎ তিন দিক থেকে। তাই মামলুক সালতানাতের প্রত্যাগমনের ত্রিত্ব-শামানবাদি মারাত্মক পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি রইলেন অসম্পূর্ণ বেখবর, অন্ধকারে। বাইবার্সের মনোজগতজুড়ে তখন শুধুই বিরাজ করছিল ইসমাইলি গুপ্তঘাতকদের কাছ থেকে চরম প্রতিশোধ গ্রহণের সুত্রীত আকাঙ্ক্ষা। লেভান্টের এই ফেদাইনরা তখন ভূমধ্যসাগরের পূর্বপাড়ে জাম্বলি আন নাসিরিয়ার পাদদেশে ত্রিপোলি ও এন্টিয়কের মাঝ বরাবর মাসইয়াফের রাজধানী করে ১৯টি দুর্ভেদ্য দুর্গের অপরায়েয় এক রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। এরা এতোটাই বেপরোয়া ছিল যে, কোন মুসলিম সুলতানই এদের ঘাটাতে সাহস করতেন না। যা-ও একমাত্র সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবি এদেরকে একবার অবরুদ্ধ করছিলেন; কিন্তু বিষবৃক্ষের মূলোৎপাটনে তিনি ব্যর্থ হন।

এরা ছিল পেশাদার গুপ্তঘাতক। ইতিহাসে এরা হাশাশিন, এসাসিন, হাসানি, ফেদাইনসহ বিভিন্ন নামে পরিচিত। এরা ছিল ইসমাইলি শিয়া। অবাধ করা তথ্য হলো, এদের প্রতিষ্ঠাতা একজন মুফতি! যে কি-না আবার জগদ্বিখ্যাত এক আলেমের শিষ্যও! নাম তার হাসান ইবন সাবাহ। কে এই হাসান? কী তার উদ্দেশ্য-পরিচয়! দুর্ধর্ষ এই ফেদাইন চক্রের ব্যাকগ্রাউন্ডই বা কী? সেসব জানতে আমাদেরকে চলে যেতে হবে ইতিহাসের অনেকটা উল্টোপথে। আরো কয়েক শতাব্দী পেছনে।

৬৩০ সাল। ইসলামি ইতিহাসের স্বর্ণকাল। মুসলিমদের পরাক্রমে সারা বিশ্ব তখন কম্পমান। গোটা পারস্য সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করে আফ্রিকা মহাদেশের শেষ ইঞ্চি জমি থেকেও রোমান শাসন মুছে দিয়েছেন তিনি। ঠিক সে সময় ইয়ামানেও ইসলাম পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানকার অনেক ইয়াহুদি হযরত আলি ও মুয়াজ রা. প্রমুখ সাহাবিদের প্রচেষ্টায় ইসলাম গ্রহণ করে। তবে কিছুসংখ্যক ইয়াহুদি তখনও ইসলাম কবুল করেনি। তারা ইসলাম গ্রহণের চেয়ে জিযিয়া কর প্রদানেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলো।

আরব জাতির উল্লেখযোগ্য একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এরা নিজেদেরকে ইয়ামানি বলে দাবি করতে ভালোবাসতো এবং গর্ববোধ করতো। কারণ আরব বিশ্বের মধ্যে একমাত্র ইয়ামান ছিল প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী, ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ এক দেশ। তাই মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অন্যান্য আরবিদের দেখাদেখি নিজেদের কৌলিন্য বাড়ানোর জন্য একদল ইয়ামানিও নিজেদেরকে ইয়ামানি, এমনকি ইয়ামানের পূর্ববর্তী সম্রাটদের বংশধর বলে দাবি করতো। এমনই একজনের নাম আবদুল্লাহ। মুসলিমদের এই সুদিনে মুসলিম হওয়াকেই সুবিধাজনক মনে করে এই আবদুল্লাহ ইসলাম গ্রহণের ভান করলো। পিতার দিক থেকে সে ছিল ইয়াহুদি। তার মতো তার পিতাও ছিল চরম এক মিথ্যাবাদী। সে নিজেকে একই সাথে ইয়ামানের সাবাহ ও হিমইয়ারি রাজবংশের ওয়ারিশ বলে দাবি করতো এবং নিজেই নিজের নাম দিয়েছিল সাবাহ। স্বঘোষিত এই সাবাহপুত্রই হচ্ছে মুনাফিকশ্রেষ্ঠ আবদুল্লাহ ইবন সাবাহ আল হিমাইয়ারি।

উসমান রা.'র খিলাফতের শেষ দিকে গুটিকয়েক মিশরবিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে আবদুল্লাহ ইয়ামান থেকে বেরিয়ে নতুন নতুন শয়তানী যুক্তি দিয়ে সেই বিশৃঙ্খলাকে আরো উস্কে দিতে থাকে। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা আসলে মুসলিম জাতি ও ইসলামের জন্যেই এমন করছে, সেটা বোঝানোর জন্য তারা উসমান রা.'র পর শ্রেষ্ঠ সাহাবি আলি রা.কে বেছে নেয়। কারণ রীরত্ব ও জ্ঞানে আলি রা. ছিলেন অবিসংবাদিত, সর্বজনমান্য। আবদুল্লাহ ইবন সাবাহ অচিরেই

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের নেতায় পরিণত হয়। একসময় সে তাদেরকে বিদ্রোহীতে রূপান্তর করে ফেলে। অবশেষে এই শয়তানের দলই ১৭ জুন ৬৫৬ সালে উসমান রা.কে নির্মমভাবে শহিদ করে দেয়। আর তখন থেকেই বিদ্রোহী এই দলটি ইসলামের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিকল্প ধারার উদ্ভব ঘটায়। পরবর্তীতে এরাই শিয়া নামে পরিচিতি পায়। এরা তখন থেকেই আবদুল্লাহ ইবন সাবাহর নেতৃত্বে আলি রা.'র পক্ষে বিভিন্ন মিথ্যা কথা রটাতো এবং খুব ভাব দেখাতো। এরা নিজেদেরকে ইসলামের খাদেম ও আলি রা.'র অন্ধভক্ত হিসেবে জাহির করতো। প্রকৃতপক্ষে এরা চাইছিলো ভেতর থেকে ইসলামকে ধ্বংস করে দিতে!

একপর্যায়ে অতিভক্তি দেখাতে গিয়ে এরা আলি রা.কে ইলাহ পর্যন্ত বলে ফেললে ক্রুদ্ধ আলি রা. আবদুল্লাহ ইবন সাবাহকে সাক্ষপাঙ্গসহ আঙুনে পুড়িয়ে হত্যা করেন।<sup>৭</sup>

ফলে এই অনিষ্টের দলের অবশিষ্টরা আলি রা.'র খিলাফাহকালে যাযাবরের মতো দিগ্বিদিক ঘুরে বেড়াতো। আলি রা.'র ভয়ে দূরে থাকলেও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তার পক্ষে অতিরঞ্জিত কথা ঠিকই রটাতো। ৬৮০ সালে কারবালা প্রান্তরে হুসাইন রা.'র শাহাদাতের পর এরাই শিয়া নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। কালক্রমে এই শিয়াদের মধ্যেই বিভক্তি দেখা দেয়। গজাতে থাকে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা।

৭৭৫ সালে এসে ইমামত প্রশ্নে শিয়ারা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। শিয়াদের দাবিকৃত ষষ্ঠ ইমাম জাফর আস সাদিক রাহ.'র ইন্তেকালের পর তারই পুত্র ইসমাইলের ইমাম হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ইসমাইলের নৈতিক স্বলন ঘটলে শিয়াদের বৃহত্তর অংশ জাফর আস সাদিক রাহ.'র অপর পুত্র মুসা আল কাজিম রাহ.'র ইমামতের পক্ষে চলে যায়। কিন্তু একাংশ যথারীতি ইসমাইলের পক্ষেই অটল থাকে। তাদের মত ছিল নৈতিক স্বলন হলেও ইসমাইল-ই তাদের ইমাম হবেন। ইসমাইলের পক্ষে যারা চলে যায় ইতিহাসে তারাই ইসমাইলি নামে সমধিক পরিচিত। ইসমাইলিদের প্রধান শাখা আবার দুটি:

প্রথম শাখা হচ্ছে ফাতিমি। এরাই ঈসায়ি ৯০৯ সালে উবাইদুল্লাহর নেতৃত্বে উত্তর আফ্রিকায় ফাতিমি বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। ক্রমান্বয়ে এদের শাসন তিন মহাদেশেই বিস্তৃত হয়ে পড়ে। উবাইদুল্লাহ নিজেকে ফাতিমা রা.'র বংশধর দাবি করলেও সে আসলে ছিল দায়সান নামক জনৈক পৌত্তলিকের বংশধর। এই মিথ্যুক নিজেকে ইমাম মাহদি পর্যন্ত দাবি করেছিল!

৭. তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলক।

দ্বিতীয় ও নিকৃষ্টতম শাখাটি হচ্ছে কারামাতিয়া। ইসমাইলি ধর্ম প্রচারক ইবন মায়মুনের শিষ্য হামদান কারামাহ'র নামানুসারেই ইসমাইলিদের থেকে বের হওয়া নতুন এই শাখার নাম হয় কারামাতিয়া। এই দলেই ছিল আবদুল্লাহ ইবন সাবাহর কুখ্যাত মুনাফিক দলের অনুসারীরা। এরা ৮৯০ সালে কুফার অদূরে দারুল হিজরতে এদের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে। সামরিক শক্তিতে নয়, ছলে-কৌশলে তারা মাত্র ২ হাজার ৭০০ সৈন্য নিয়েই আব্বাসীয়দের অধিকার থেকে বসরাসহ পূর্ব আরব কেড়ে নিয়ে আলাদা এক রাজ্য গড়ে তোলে। এই কারামাতিয়ারা এতোই নিকৃষ্ট ছিল যে, ৯৩০ সালে মক্কা মুকাররামা আক্রমণ করে কাবা শরিফ থেকে হাজারুল আসওয়াদ পর্যন্ত খুলে তাদের রাজধানী আল আহসাতে নিয়ে যায়। তাদের এই ধৃষ্টতায় মুসলিম উম্মাহ টানা একুশ বছর পবিত্র হজব্রত পালন থেকে বঞ্চিত থাকে!\*

পরবর্তীতে বুওয়ায়ি সম্রাট আদুদ দাওলাহ ৯৫১ সালে হাজরুল আসওয়াদ উদ্ধার করে আবার মক্কায় নিয়ে আসেন। ৯৮৫ সালে অপর বুওয়ায়ি সম্রাট সামসাম উদ দাওলাহ কারামাতিয়াদের রাজ্য অধিকার করে তাদেরকে বাহরাইনে বিতাড়িত করেন। কুখ্যাত এই কারামাতিয়ারা আবার তিনটি শাখায় বিভক্ত।

১. দুরুজ, এরা ফাতিমি খলিফা আল হাকিমকে (পরবর্তীতে যিনি ইসমাইলি থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন) আল্লাহর অবতার মনে করে উপাসনা করতো।

২. নুসাইরি, ইসনা আশারিয়া শিয়াদের দাবিকৃত একাদশ ইমাম হাসান আল আসকারি রাহ.'র সহপাঠী মুহাম্মাদ ইবন নুসাইর কারামাতিয়া সম্প্রদায় থেকে আরেক বিকৃত গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটায়। এরাই নুসাইরি/আলাভি নামে পরিচিত। এরা আলি রা.কে ইলাহ সাব্যস্ত করে উপাসনা করতো!

৩. হাসানি, কারামাতিয়াদের এই তৃতীয় শাখাই আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু। ইতিহাসে এরাই বাতিনি, হাসানি, হাশাশিন, এসাসিন, ফেদাইন নামে কুখ্যাত। এদের উদ্ভাবক হচ্ছে কুলাঙ্গার হাসান ইবন সাবাহ। যে কিশা'র উসমান রা.কে হত্যাকারী নরাদম আবদুল্লাহ ইবন সাবাহর সাক্ষাৎ বংশধর। ছলা-কলা, হিংস্রতা-পাশবিকতায় সে ছিল ইতিহাস সেরা। সে ১০৫০ সালে কুফায় জনগ্রহণ করে। সে নিজেকে হিমইয়ারি রাজবংশের ওয়ারিশ দাবি করতো। হাসান তার কলঙ্কময় জীবন শুরু করে আর-রাযা (বর্তমান ইরানের রাজধানী তেহরান) শহরে বাতেনি তত্ত্ব শিক্ষা লাভের মাধ্যমে। এরপর সে খোরাসানের রাজধানী নিশাপুরে বিখ্যাত মুসলিম আলেম ইমাম মুওয়াফিকের কাছে ফিকাহর

শিক্ষা লাভ করে। সে ছিল অসম্ভব বাকপটু, তুখোড় মেধার অধিকারী। ফলে ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতেও সে ছিল সমান পারঙ্গম। এসময় সহপাঠী হিসেবে সে এমন দুজন ব্যক্তিকে পেয়েছিল, পরবর্তীকালে যারা নিজ নিজ অসামান্য কীর্তিতে বিশ্বখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। তারাও ইমামের কাছে ফিকাহ শিখতেন। তারা হচ্ছেন: জগদ্বিখ্যাত আলেম, কিংবদন্তির উজিরে আযম আবু আলি হাসান আত তুসি। যিনি নিযামুল মুলক নামেই সর্বাধিক পরিচিত। অপরজন বীজগণিতের জনক, বিশ্বখ্যাত কবি ও জ্যোতির্বিদ গিয়াস উদ্দিন আবুল ফাতিহ উমর ইবন খৈয়াম নিশাপুরি। কী আশ্চর্য! এক বৃন্তে ফোটা তিনটি ফুলই ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন সম্পূর্ণ বিপরীত কীর্তিতে। কেউ মানব সভ্যতা বিনির্মাণে, কেউ মনুষ্যত্ব ধ্বংসে।

হাসান ইবন সাবাহ বিদ্যার্জন শেষে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য মিশরে গমন করে। মিশরে তখনো শিয়া ফাতিমিদের শাসন চলছিল। ফাতিমিদের খলিফা তখন আল মুসতানসির। মুসতানসির ছিল সেই ব্যক্তি, যে নিজ প্রাসাদে একটি নকল কাবা নির্মাণ করে সেখানে বসে মদ্যপান করতে করতে গায়িকাদের গান শুনতো এবং বলতো: “কালো পাথরের দিকে তাকিয়ে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে শুনশুন (আযান) শোনা বা অশুদ্ধ পানি (জমজম) পান করার চেয়ে এটা অনেক সুখের।” নাউযবিদ্লাহ! তাই হাসানের মতো সাক্ষাৎ ইবলিসকে পেয়ে পাপিষ্ঠ খলিফাও বেজায় খুশি হলো এবং তাকে এশিয়া মহাদেশের দাওয়া রিভাগের প্রধান নিযুক্ত করলো। হাসানও যথারীতি পারস্যের সালজুক সালতানাতে এসে ইসমাইলি শিয়া মতবাদ প্রচার করতে লাগলো। কিন্তু কাক্ষিত সুবিধা সে করে উঠতে পারলো না। কিছুদিন পর যখন দেখলো তারই সহপাঠী নিযামুল মুলক এখন সালজুক সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী, তখন বুঝে নিল ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন এই ব্যক্তির কল্যাণেই মুসলিমরা ইসলামের সহিহ ধারায় আজও অবিচল, ঐক্যবদ্ধ। হাসান তখন ভিন্ন পথ ধরলো। সে ছলে-কৌশলে সমুদ্রতট থেকে ২১৬৩ মিটার উঁচু একটি দুর্গ অধিকার করে এর নাম দিল আলমুত। কালক্রমে এই আলমুত ঘিরে সে আরো চল্লিশটি দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে তুললো। এবং শুরু করলো নতুন এক মতবাদ প্রচারের কাজ। তার নবআবিষ্কৃত এই মতবাদই হচ্ছে কারামাতিয়াদের তৃতীয় শাখা-বাতিনি গুপ্তঘাতকগোষ্ঠী। ক্রমান্বয়ে হাসান ইবন সাবাহ গড়ে তুললো এমন এক আত্মঘাতী বাহিনী, যারা এই সালজুক সাম্রাজ্য এবং মুসলিম বিশ্বকে মেধাশূন্য করে নিঃশেষ করে দেবে।

মুসলিম উম্মাহকে নেতৃত্বশূন্য করার মানসে স্বয়ং হাসানের নেতৃত্বেই চললো আত্মঘাতী কর্মী সংগ্রহের কাজ। সে বারো থেকে বিশ বছর বয়সের বাছাই করা সামরিক গুণসম্পন্ন তরুণদের নিয়ে গড়ে তুললো বিশাল এক গুপ্ত সামরিক



বাহিনী। এরাই হলো ইতিহাসের কুখ্যাত ফেদাইনচক্র। হাশিশ (হিরোইন) এ আসক্ত হওয়ার কারণে ‘হাশাশিন’ নামেও এরা পরিচিতি পায়। এরা এতোই মাদকাসক্ত ছিল যে, হিরোইনের মূল উপাদান পিপরি পাতা ও ফুল পর্যন্ত চিবিয়ে নেশা করতো। হাশাশিনের ইংরেজি বিকৃত রূপই হচ্ছে এসাসিন (Assasin)। স্বয়ং হাসানের আত্মিক ও দৈহিক ট্রেনিং-এ এরা একেকটা আস্ত পিশাচে পরিণত হয়ে উঠে। বলা যায় এরা ছিল একেকজন রক্তপায়ী নিপুণ হত্যামাশিনী। এরা নিঃশব্দে চলতে পারতো। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাদের বিষাক্ত ছুরিকাঘাতে শিকার অঘোরে নিহত হতো। অন্ধ আনুগত্য ও গুপ্তহত্যায় পারদর্শিতা ছিল এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বর্ণনাভীত কঠোর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হাশাশিন বানানোর পর এদেরকে মাত্রাতিরিক্ত হাশিশ খাইয়ে ঘুমের ঘোরে আলমুতে ট্রান্সফার করা হতো এবং ঘুমন্তাবস্থায়ই দুর্গের পরিকল্পিত অপূর্ব সুন্দর উদ্যানে তাদের নিয়ে আসা হতো। রূপসী তরুণীদের নাচ-গানের শব্দে সাজানো উদ্যানের মাঝেই এদের ঘুম ভাঙতো। রূপসী নারীদের ছলা-কলা ও ভূবনমোহিনী নাচ-গানে এদের মনে হতো গুরুদের কথাই তো ঠিক! গুরুরা ট্রেনিংয়ের ফাঁকেই এদের মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দিতো, আলমুত সে তো মুমিনদের বেহেশত! শাইখ নির্দেশিত ভালো কাজ করলে এবং নিয়ম মেনে চললেই কেবল সেখানে যাওয়া সম্ভব। আলমুতের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হচ্ছেন শাইখুল জাবাল। শাইখুল জাবালের নুরানি মুখ দর্শন মানেই নিশ্চিত বেহেশত! তার কথায় মরলে তো কথাই নেই! বিনা হিসেবে জান্নাত!

তাই আলমুতে আসার পর অপ্রকৃতস্থ এসব ফেদাইনদের নেশার ঘোর টুটে গেলে উর্বশী নর্তকীদের নাচ-গান, সাজানো উদ্যান দেখে ভাবতো সত্যিই তারা বেহেশতে চলে এসেছে। হ্র-পরী মনে করে তারা তখন নর্তকীদের সাথে অবাধ ব্যভিচারে লিপ্ত হতো। অবশেষে তাদের সামনে দেখা দিতেন স্বয়ং শাইখুল জাবাল এবং নির্বাচিত ব্যক্তিদের হত্যা করার নির্দেশ দিতেন। জাবাল হতো: “তোমরা বেঁচে থাকলে ফেরেশতারা তোমাদের আবার এই জান্নাতে নিয়ে আসবে। আর মারা গেলেও স্থায়ীভাবে এই জান্নাতে ঠিকঠিক পৌঁছে যাবে”। এভাবেই ফেদাইনরা নেশার ঘোরে একেকটা ভয়ঙ্কর গুপ্তঘাতক হয়ে উঠে। এজন্যেই গুপ্তঘাতকদের প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়ায় ফেদাইন (জীবন উৎসর্গকৃত)। পারস্যের ফেদাইন দুর্গসমূহের প্রধান কেন্দ্র ছিল আলমুত। আলমুতের সর্বপ্রথম শাইখুল জাবাল ছিল সেই বদবখত হাসান ইব্রাহিম সাবাহ। তবে ফেদাইনরা তাকে ‘সায়্যিদিনা’ নামেই ডাকতো।

১০৯০ সাল। অবৈধভাবে আলমুত দুর্গ অধিকারের সংবাদ পাওয়ামাত্রই নিয়ামুল মুলক হাসানকে গ্রেফতারের চেষ্টা চালান। ধূর্ত হাসান গ্রেফতার এড়িয়ে

নবোদ্দীপনায় ফের মাঠে নামে। সে একে একে পারস্যের মাযানদারান অঞ্চলের ইলান, নাভিসার শাহ, শাহরাক, শিরকোহ, মায়মুন দেজ, মুয়াল্লাম কালায়া, মাযিল, লামাসার, গিরদকোহ ও শাহরিস্তান দুর্গ অধিকার করে নেয়। এই এগারোটি দুর্গের কেন্দ্র ছিল আলমুত। এছাড়াও লাম্বসার, রুদখান, সামিরান, মুহাম্মাদাবাদ ও আর রাজান-এই পাঁচটি দুর্গ নিয়ে জিবাল অঞ্চলে হাসানিদের আরেকটি প্রদেশ গড়ে ওঠে। শুধু তাই নয়; সারু, মুমিনাবাদ, কইন, ফুর্গ, কোহ-ই গালিয়েহ ও খালানজান-এই ৬টি দুর্গ নিয়ে কুহেস্তানে গড়ে ওঠে হাসানিদের তৃতীয় প্রদেশ। পারস্যের মাযানদারান, জিবাল ও কুহেস্তানের বাইরে সুদূর শামেও তখন একটি ফেদাইন ঘাঁটি আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমদিকে ৯টি দুর্গ নিয়ে প্রদেশটি গড়ে উঠলেও পরবর্তীতে দিন দিন এ সংখ্যা বাড়তে থাকে।

এক্ষেত্রে লজ্জাজনক ব্যাপার হচ্ছে, উত্তর শামের সালজুক সুলতান রিজওয়ান ইবন তুতুশের ইসলাম ত্যাগ করে হাসানি মতবাদ গ্রহণ করা! তার এই ডিগবাজিতেই মূলত উত্তর শামে ফেদাইনচক্রের উত্থান ঘটে। রিজওয়ানের কারণেই সেখানে হাসানিদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। প্রথমে নয়টি দুর্গ থেকে শুরু করলেও অচিরেই আন নাসিরিয়া পার্বত্যাঞ্চলে একে একে ১৯টি দুর্গ স্থাপন করে তারা প্রভূত শক্তি অর্জন করে। ৪ হাজার ১৯১ বর্গকিলোমিটার ভূমি নিয়ে গড়া তাদের লেভান্ট অঞ্চলের এই আখড়ার রাজধানী হয় মাসইয়াফ। যার ভৌগোলিক অবস্থান ছিল দুই ক্রুসেডরাজ্য কিংডম অব ত্রিপোলি ও এন্টিয়কের মাঝ বরাবর। তাদের এই আখড়াটি ছিল আলমুতের পরেই দ্বিতীয় বৃহত্তম, দুর্ভেদ্য ও অজেয়। এমনকি আলমুতের সমান্তরালে এখানেও আলাদা একজন শাইখুল জাবাল পর্যন্ত নিযুক্ত করতে হয়।

হাসানের এসব কাণ্ডকারখানায় তৎকালীন বিশ্বশক্তির সালজুক সুলতান, সালজুক বংশেরই সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক মালিক শাহ ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হন। ফলে ১০৯০ ও ৯১ সালে পরপর দুবার আলমুত অবরোধ করা হয়। কিন্তু নেশাখোর ফেদাইনদের চরম আত্মোৎসর্গ, গগণচুম্বী পর্বত, আলমুতের ভৌগোলিক অবস্থান এবং এর দুর্ভেদ্যতার কারণে মালিক শাহর দুটি অভিযানই ব্যর্থ হয়।

সালজুকদের ব্যর্থতার ফলে ফেদাইনদের মনোবল অনেকটাই বেড়ে যায়। মুসলিম মনীষীদের হত্যা করে মুসলিমদের মেধাশূন্য ও রাজনৈতিকভাবে পঙ্গু করার যে পরিকল্পনা হাসান করেছিল, এবার তা শুরু হয় স্বয়ং নিয়ামুল মুলকের মাধ্যমে।

২৪ অক্টোবর ১০৯২ সালে ইসফাহান থেকে বাগদাদ যাওয়ার পথে নিয়ামুল মুলক নেহাওয়ান্দে যাত্রাবিরতি করলে জনৈক গুপ্তঘাতক কর্তৃক খোদ হাসান ইবন সাবাহর বিষাক্ত ছুরির আঘাতে আশুরার দিনে তিনি শহিদ হন। নিয়ামুল মুলক ছিলেন সেই ব্যক্তি, যিনি বিশ্বে সর্বপ্রথম বর্তমান ধারার মাদরাসা প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন। হুজ্জাতুল ইসলাম নামে বিখ্যাত ইমাম গাযালি রাহ. হচ্ছেন তারই প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায়ে নিয়ামিয়ার যুগশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। এমনকি আধুনিক মাদরাসা ব্যবস্থার কালজরী শিক্ষা সিলেবাস 'দারসে নেযামি'র উদ্ভাবকও তিনিই।

এরপর থেকেই পারস্য ও শামের ফেদাইনরা অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। বিশ্ববাসীর মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে দাঁড়ায় অভিশপ্ত এই ফেদাইনচক্র! যুগের পর যুগ চলতে থাকে তাদের দৌরাত্ম্য। অবশ্য আলমুতকেন্দ্রিক পারস্যের ফেদাইনরা বাইবার্সের অভ্যুদয়ের আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। শেষ খাওয়ারিজম শাহ, জালালউদ্দিনের সময়ই (১২২১-১২৩১) মূলত পারস্যের ফেদাইনদের কোমর ভেঙ্গে যায়। তার বজ্রাঘাতে একমাত্র আলমুত বাদে পারস্যের প্রায় সবক'টি ফেদাইন দুর্গই ধ্বংস হয়ে যায়। পারস্যের গুপ্তঘাতকদের বিনাশের কৃতিত্ব হালাকু খানের মোঙ্গলদের দেয়া হয়, অথচ বাস্তবতা হলো ভিন্ন। হালাকু খান কেবল মরার উপর খাড়ার ঘা-ই মারেন। শাহ জালালউদ্দিনের নিরুদ্দেশের পর হাশাশিনরা আলমুতকে কেন্দ্র করে আবার তাদের দুর্গসমূহ আবাদ করা শুরু করলে হালাকু খান এ ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায়ই আঘাত হেনে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেন। তাই বলা যায়, হালাকু খান পারস্যের যে হাশাশিন রাজ্য জয় করেন তা আদৌ অজেয় ছিল না। কিন্তু মাসইয়াফকেন্দ্রিক লেভান্টের হাশাশিন রাজ্যের অবস্থা ছিল ঠিক তার উল্টো। এটা চিরকালই অজেয় ছিল। কোনো মুসলিম শাসক না এটা জয়ের স্বপ্ন দেখেছেন, না কারো হাতে তাদের একটা দুর্গেরও পতন ঘটেছে! সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর মতো ক্রুসেডের অমরযোদ্ধা যেখানে মাসইয়াফের শাইখুল জাবালের হুমকির ফলে অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেখানে বাইবার্সের রণমূর্তিতে মাসইয়াফের শাইখুল জাবাল আজ তটস্থ, কম্পমান।



১২৬৯ সাল। সুলতান বাইবার্সের নেতৃত্বে অদম্য মামলুক বাহিনী আচমকা হামলে পড়লো লেভান্টের অজেয় হাশাশিন রাজ্যে। বাইবার্স শুরুতেই আন নাসিরিয়া পর্বতমালার চতুর্পাশে অবস্থিত এলাকাগুলোতে কঠিন আদেশ জারি করলেন: “মুসলিম হোক বা শিয়া অথবা খ্রিস্টান-কেউ যেন হাশাশিনদের কাছে এক কণা খাদ্য-শস্যও বিক্রি না করে। কেউ যদি এমন দুঃসাহস দেখায় তাহলে তার জন্য গোটা এলাকাই ধ্বংস করে দেয়া হবে”।

মুসলিমরা এমনিতেই সুলতানের অনুগত ছিল। এ আদেশের ফলে তারা আরও সতর্ক হলো এবং বিধর্মীদের উপর নজরদারি বাড়ালো। আর বিধর্মীরা তো বাইবার্সের রুদ্ররূপ ভালোই জানে। এ ঘোষণায় তারা আরো ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো।

পূর্বে আন নাসিরিয়া পর্বতমালা থেকে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, উত্তরে এন্টিয়ক থেকে দক্ষিণে কিংডম অব ত্রিপোলি, মধ্যবর্তী ৪১৯১ বর্গকিলোমিটার ভূমি নিয়ে ছিল তখনকার দুর্বৃত্ত হাশাশিন রাজ্য। দুর্গম আন নাসিরিয়া পর্বতমালার উপর সমান্তরাল রেখার মতো একনাগাড়ে ১৯টি দুর্ভেদ্য দুর্গও তাদের ছিল। অবস্থানগত দুর্বোধ্যতা ও হাশাশিন গুপ্তঘাতকদের ক্ষিপ্ততার কারণে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত মুসলিম-অমুসলিম কোনো শাসকই লেভান্টের এই হাশাশিন রাজ্য দখলে আনার, এমনকি হানা দেবার চিন্তাও করেননি। শামের এই হাশাশিন ঘাঁটিটি অভ্যুদয়ের পর থেকে হাসান ইবন সাবাহর অধীনস্থ থাকলেও তার মৃত্যুর পর এটি আলমুতের কর্তৃত্ব থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কালক্রমে রশিদউদ্দিন সিনান শামের ৯টি হাশাশিন দুর্গেরই কর্তৃত্ব লাভ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসে। সেই থেকে সিনান শাইখুল জাবাল নামে খ্যাত হয়ে ওঠে। সিনানের প্রভাবে শামের এই হাশাশিন রাজ্য এতোই বিস্তৃতি লাভ করে যে, আন নাসিরিয়া পার্বত্যঞ্চলেই আরো দশটি দুর্গ স্থাপন করে তারা টানা ১৯টি দুর্গের দুর্লভ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলে। সেজন্যই সিনান ছিল হাসান ইবন সাবাহর পর হাশাশিনদের দ্বিতীয় পথিকৃৎ নায়ক। অবশ্য একদিকে সে হাসানকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল তার প্রতি ফেদাইনদের অন্ধ আনুগত্য। এ অন্ধ আনুগত্যের একটা উদাহরণ দিলেই সবার পিলে চমকে যাবে।

১১৯৪ সালে ক্রুসেডরাজ্য কিংডম অব জেরুসালেমের রাজা শ্যাম্পেইন এর হেনরি সিনানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এলে সিনান তার দুই অনুচরকে আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাবার ইঙ্গিত করে। শাইখুল জাবালের উদ্ভূত পাওয়া মাত্রই দুই ফেদায়ি পাহাড়ের উপরিস্থিত মাসইয়াফ দুর্গ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করে!

এই সেই সিনান, যার নির্দেশে ফেদাইনরা সুলতান রশিদউদ্দিন আইয়ুবির উপর তিন-তিনবার প্রাণঘাতী হামলা চালায়। অবশেষে তুর্ক-বিরক্ত সুলতান আইয়ুব ফেদাইনদের শায়েস্তা করতে তাদের এই অশুভা অবরোধ করে বসেন। বাইবার্সের আগ পর্যন্ত এটাই ছিল একমাত্র অবরোধ। কিন্তু তার এই অবরোধ ছিল নিতান্তই দুর্বল। এরই মধ্যে সিনানের পক্ষ থেকে এলো কঠোর হুঁশিয়ারি বার্তা: “অবরোধ প্রত্যাহার না করলে যে কোন মূল্যে আইয়ুবিকে হত্যা করা হবে।” অনন্যোপায় হয়ে আইয়ুবিও তাই তড়িঘড়ি অবরোধ তুলে নেন।

কিন্তু সুলতান বাইবার্স ছিলেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া। নামের মতো প্রকৃত অর্থেই ক্ষিপ্রচিতা। তিনি এসেই একটি-দুটি নয় একসাথে ১৯টি দুর্গই অবরোধ করার মতো অবিশ্বাস্য কাণ্ড করে বসেন। বাইবার্সের অবরোধ! সে-কী কঠিন, একমাত্র অবরুদ্ধরাই জানে! অকল্পনীয় এ অবরোধ নিশ্চিহ্ন করতে বাইবার্স তার গোটা বাহিনীকে ৩৯টি ভাগে বিভক্ত করেন। অবরোধের মাস্টারপ্ল্যান বুঝতে হলে সর্বাত্মে দুর্গগুলোর অবস্থান নির্ণিত হওয়া দরকার।

পুরো হাশাশিন রাজ্যে মোট দুর্গ ছিল ১৯টি। ইতিহাসে সেগুলোর নাম এভাবে পাওয়া যায়: আল মাসইয়াফ, আবু কুবাইস, আল কাহাফ, আল খাওয়াবি, আর রুসাফা, আল কদমুস, আল মাদিক, আল আলাইকা, আল কুলাইয়া, আস সারমিন, আল মানিকাহ, আশ শাইয়ুম, আস সফিতা, আত তালকালাহ, আল কাফরুন, আল কারদাহা, আল উলাইদাহ, আল আফা ও আল লাদিকিয়াহ। হাশাশিন রাজ্যের বুকের উপর সোজা উত্তর থেকে দক্ষিণে দাঁড়িয়ে ছিল আন নাসিরিয়া পর্বতমালা। এই পর্বতমালারই উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত কিছুদূর পরপর নাক বরাবর ছিল এই দুর্গগুলোর অবস্থান। সবগুলো দুর্গেরই পূর্বদিকে শাম, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের অঁথে নীল জলরাশি। সর্বউত্তরের দুর্গটি এন্টিয়ক সীমানায় আর দক্ষিণ প্রান্তেরটি কিংডম অব ত্রিপোলির সীমান্ত লাগোয়া।

এবার দেখা যাক ক্ষিপ্র বাইবার্সের নিপুণ সেনাবিন্যাস! বাইবার্স তার মূল বাহিনীকে প্রধানত দুভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম অংশকে আবার ১৯টি ভাগে বিভক্ত করে ১৯টি দুর্গকে পূর্ব দিকে শাম সীমান্ত দিয়ে অবরোধ করেন। দ্বিতীয় অংশকে আরও ২০টি ভাগে বিভক্ত করে প্রতি দুটি দুর্গের মাঝে একটি করে মোট ১৮ ভাগ মোতায়ন করেন। বাকি দুভাগের একটিকে সর্বউত্তরের দুর্গের এন্টিয়ক সীমান্তের দিকে এবং অবশিষ্ট ভাগকে সর্বদক্ষিণের দুর্গের ত্রিপোলি সীমান্তে মোতায়ন করেন। বাইবার্সের অকল্পনীয় এই সেনাবিন্যাস ও পরিকল্পিত অবরোধে হাশাশিনদের প্রতিটি দুর্গই তিন দিক দিয়ে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। শুধু পশ্চিমের ভূমধ্যসাগরের দিকটাই অব্যাহত থাকে। দ্বিতীয় ভাগের ২০টি বাহিনীর কাজ ছিল দুর্গগুলোর পারস্পরিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা এবং সীমান্ত দিয়ে বাইরে পালানো রোধ করা। এর মধ্যে মাঝের ১৮টি বাহিনী আবার প্রতিটি দুভাগে বিভক্ত হয়ে আলাদা শিবির স্থাপন করেছিল। যাতে দুটি বাহিনী একসাথে দুটি দুর্গের দিকেই নজর রাখতে পারে!

সুলতান বাইবার্স হাশাশিন ফেদাইনদের ১৯টি দুর্গ সমৃদ্ধ অজেয় রাজ্য অধিকার করতে নিপুণ সেনা বিন্যাসের সাথে সাথে কয়েক স্তরবিশিষ্ট ভয়ানক রণকৌশলও অবলম্বন করেছিলেন। প্রথম স্তরে প্রত্যেক দুর্গের সম্মুখভাগে সুবিধাজনক স্থানে নাফতুন বসিয়ে অনবরত নাফতা (জ্বলন্ত অগ্নিগোলা) নিক্ষেপ করে দুর্গের

প্রাচীরগুলো চুরমার করে দেবার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় স্তরে তিনি তার প্রতিটি সেনা ইউনিটের সম্মুখভাগে মিদফা (বাইবার্স আবিষ্কৃত হাত কামান) বাহিনী মোতায়েন করেছিলেন। যাতে দুর্গের প্রাচীরগুলো ধ্বংসে পড়ামাত্রই হাশাশিনরা যখন পালাবে, তখন এই মিদফা বাহিনী তাদের উপর অগ্নিবোমার টর্নেডো বইয়ে দেবে। তৃতীয় স্তরে ছিল কিলিজধারী (বিশেষ ধরণের মামলুক তরবারি) মামলুক অশ্বারোহী সেনা। এদের কাজ ছিল, যেসব হাশাশিনরা কোনোক্রমে মিদফার হাত থেকে বেঁচে গিয়ে পালাতে যাবে, তাদেরকে নিশ্চিত যমালয়ের টিকিট ধরিয়ে দেয়া।

এই তিন স্তর ছাড়াও বাইবার্স প্রত্যেক দুর্গের দু'পাশে বিশেষ তীরন্দাজ ও আলাদা বর্শাধারী অশ্বারোহী বাহিনী মোতায়েন করেছিলেন। যাদের কাজ ছিল, হাশাশিনরা এক দুর্গ থেকে অপর দুর্গকে সাহায্যের চেষ্টা করা মাত্রই তাদের উপর আঁড়ধনুর তীরবৃষ্টি বর্ষণ করা এবং পলায়নপর ফেদাইনদেরকে অশ্বারোহী বর্শাধারীদের দ্বারা তাড়া করা। বাস্তবে হয়েছিলোও তা-ই! পাঁচটি বাহিনীই নিজ নিজ কাজ ভয়ঙ্কর সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছিল।

সুলতান বাইবার্সের অপূর্ব-অদ্ভুত এই রণকৌশলের চাপায় পড়ে হাশাশিনরা রীতিমত ফাঁদে পড়া হুঁদরের মতো হাঁসফাঁস করতে লাগলো। দুর্বীর গতির মামলুকদের প্রচণ্ড হামলার মুখে চোখে তারা দিব্যি সর্ষে দেখতে শুরু করলো। হাশাশিনরা হাড়ে-হাড়ে টের পেলো গুপ্তহত্যা আর নিয়মিত যুদ্ধের তফাৎ কতো! স্বয়ং বাইবার্সের পাল্লায় পড়ে সহসাই একে একে পতন ঘটতে লাগলো অজেয়-দুর্ভেদ্য দুর্গগুলোর। মামলুক তাগুব থেকে সেসময় ফেদাইনদের কেউই বাঁচলো না। যারা ভূমধ্যসাগর দিয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছিল, কেবল তারাই ছিল ভাগ্যবান। কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল হাতেগোনা। আর যারা পালিয়ে যেতে পারেনি, তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল ইতিহাসের শিক্ষণীয় দণ্ড! বাইবার্স আতঙ্কে স্বয়ং শামের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী তখনকার শাইখুল জাবালও মাসইয়াফ পতনের আগেই ভূমধ্যসাগর দিয়ে চম্পট দিলেন! ফেদাইনদের রেখে গেলেন মামলুকদের দয়ার উপর! যা কেউ কোনোদিন ভাবেইনি, বাইবার্স তা-ই দিব্যি করে দেখালেন। মাত্র একবছরের মধ্যেই ১৯টি দুর্গসহ পুরো ফেদাইন রাজ্য অধিকার করে দুনিয়ায় অন্যরকম একটা ত্রাসের রাজ্যই ছড়িয়ে দিলেন! এই না হলে বাইবার্স-দ্য প্যাছার!

অবরোধ চলাকালীন সময়ে বাইবার্স অসংখ্য কষ্ট সহিষ্ণুতা, ভীষণ ক্ষিপ্ততার পরিচয় দেন। যখনই কোনো দুর্গের ব্যাপারে খারাপ সংবাদ আসতো তখনই সেই দুর্গের উদ্দেশে তিনি ছুটে যেতেন। দেখা যেতো, সুলতান এ সপ্তাহে মাসইয়াফে তো পরের সপ্তাহেই আল কাহাফে অবস্থান করছেন। এভাবেই

সুলতান বাইবার্দের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে কম-বেশি মাত্র একবছরের ব্যবধানে ১২৭১ সালের মধ্যেই ফেদাইনদের সবগুলো দুর্গের পতন ঘটে। তৎকালীন বিশ্ব ইতিহাসের এ এক অনন্য-অবিস্মরণীয় কীর্তি, কোনো মুসলিম শাসকের হাতে দুর্ধর্ষ গুপ্তঘাতকদের গোটা একটি রাজ্যের পতন ঘটলো। তা-ও একই বারে। নির্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যেই। অথচ পরাক্রমশালী হালাকু খানও পারস্যের হাশাশিনদের গোটা রাজ্য জয় করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তার হাতে আলমুত দুর্গের পতন ঘটলেও অপর দুর্গ গিরদকোহর পতন ঘটাতে তিনি ব্যর্থ হন। অবশ্য গিরদকোহকে জেদি হালাকু খান আমৃত্যু অবরুদ্ধ করে রাখেন সেই ১২৫৬ সাল থেকেই। ১২৭১ সালে এসে বাইবার্দের হাতে যখন শামের এই হাশাশিন রাজ্যের পতন ঘটে ঠিক তখনই শাম থেকে সাহায্যের সব আশা-ভরসা শেষ হয়ে যাওয়ায় মাটি কামড়ে থাকা গিরদকোহর ফেদাইনরা দীর্ঘ ১৫ বছর অবরুদ্ধ থাকার পর হালাকুপুত্র আবাকা খানের কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়।

মহান সালজুক সুলতান সানজার (১০৯৭-১১১৮) এর আমলে ফেদাইনদের অসং কৰ্মকাণ্ডের সব সীমা ছাড়িয়ে গেলে এবং এদের শিকড় উচ্ছেদে পুরো সালজুক রাষ্ট্রশক্তি ব্যর্থ হলে সুলতানের অনুপ্রেরণায় তৎকালীন উলামা-মাশায়েখরা এই মর্মে ফাতওয়া দেন: “ফেদাইনদের যেখানে দেখা যাবে, সেখানেই বাছ-বিচার ছাড়া হত্যা করা হবে”। এই ফাতওয়াতে তৎকালীন প্রখ্যাত সব ফকিহদের স্বাক্ষরও ছিল। প্রায় পৌনে দুশো বছর পর এসে সুলতান সানজারের আমলের সেই ফতওয়ার পুরোপুরি হক আদায় করেন কঠোর ধর্মপ্রাণ মামলুক সুলতান বাইবার্! বাইবার্দের বজ্রকঠিন নির্দেশে ১৯টি দুর্গের সমস্ত ফেদাইনকেই দুর্ধর্ষ মামলুক যোদ্ধারা হত্যা করে! অধিকাংশ ফেদাইন-ই পলায়নকালে নিহত হয়। বাকিদেরকে তন্ন-তন্ন করে খুঁজে নির্বিচারে জাহান্নামের লাইসেন্স দেয়া হয়। অবশেষে তাদের লাশ বিনা দাফনে আলআসি নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। বাইবার্! সর্বত্র নির্দেশ জারি করেন: “কেউ যেন ফেদাইনদের প্রতি কোনো রকমের দয়া না দেখায়, এমনকি তাদের লাশ কবরস্থ করার চেষ্টাও না করে”। এভাবে খুবই করুণ প্রক্রিয়ায় পতন ঘটে ইসমাইলি শিয়া বিকৃত মতাবলম্বী হাসানি ভাবধারার হাশাশিন ফেদাইনদের! প্রায় দুশো বছর দুনিয়া কাঁপিয়ে অবশেষে বাইবার্দের থাবায় ধুঁড়েই অতীত ইতিহাস হয়ে যায় ফেদাইন উপাখ্যান!

নিরক্ষর হালাকু খান আলমুত দুর্গে পাওয়া সমস্ত বইপত্র পুড়িয়ে দেন। কিন্তু সুলতান বাইবার্! সে পথে যাননি। আর তিনি সেটা করেননি বলেই মানুষ আজও জানতে পারছে এই ইসমাইলি হাশাশিনরা আসলে কি চীজ ছিল! তারা আসলে ছিল মুসলিমের মুখোশপরা মারাত্মক কাফের! মানুষের চেহারায়ে একেকটা আস্ত

জানোয়ার, পিশাচ। বাইবার্স তাদের বইপত্রগুলো না পুড়িয়ে শুধু এজন্যেই সংরক্ষণের আদেশ দিয়েছিলেন, যাতে পরবর্তী প্রজন্ম জানতে পারে সুলতান বাইবার্স কেন হাশাশিনদের সাথে এতোটা নির্দয় আচরণ করেছিলেন! তাই আজ দ্ব্যর্থহীনভাবেই বলা যায়, হাশাশিনরা মুসলিম তো নয়ই; মূলত ছিল শয়তানের পূজারি। কুরআন-হাদিস তো ছুঁয়েই দেখতো না; বরং কুফরি কালামেই এরা ছিল নিত্য অভ্যস্ত।

সুলতান বাইবার্সের নির্মম ক্র্যাকডাউনের পর অবশিষ্ট হাশাশিনদের মনে এমন ত্রাসের সঞ্চার হয় যে, বিচ্ছিন্ন বসবাস করা হাশাশিনরাও রাতারাতি গোটা মামলুক সালতানাত ত্যাগ করে চলে যায়। ভুলেও এরা আর মামলুক ত্রিসীমানা মাড়ায়নি। এমনকি কোনো মুসলিম ভূখণ্ডকেই এরা আর নিরাপদ ভাবে নি। এদের মাথায় শুধু এই একটা বিষয়ই ঘুরপাক খেতে থাকে, “তাদের জন্য কেবল উপকূলীয় এলাকাই সবচেয়ে নিরাপদ!” কারণ বাইবার্সের মতো ফের কোনো নির্দয় মুসলিম শাসকের কবলে পড়লে তারা দ্রুত সাগর পাড়ি দিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে পারবে! সেই থেকে তারা ওমান, ইয়ামান, পূর্ব আফ্রিকার উপকূল এবং ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিম উপকূলে বিচ্ছিন্নভাবে তাদের বসতি স্থাপন করতে থাকে। ভারতের পশ্চিম উপকূল দাক্ষিণাত্যে তখনও মুসলিম অধিকার কায়েম হয়নি, দাক্ষিণাত্যের উত্তরে তখন যাদব বংশীয় হিন্দুদের রাজত্ব চলছে। দিগ্বিদিক পলায়নপর এই ইসমাইলি কুচক্রিদেরকে যাদবরা সানন্দে আশ্রয় দেয়। কারণ যাদবরাজ ঠিকই জানতেন, এরা নিজেদেরকে ইসমাইলি মুসলিম বলে পরিচয় দিলেও এরা মূলত মুসলিমদেরই জাতশত্রু। যাদবরাজের প্রশ্নে এভাবেই ভারতবর্ষে এদের নতুন আস্তানা গড়ে ওঠে। অবশ্য বাইবার্সের হাতে চূড়ান্ত মার খেয়ে ইতোমধ্যেই এরা চিরদিনের তরে গুপ্তহত্যা ছেড়ে দিয়ে শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনে আগ্রহী হয়ে উঠে। ব্যবসায়-বাণিজ্যে এরা নিবিড় মনোনিবেশ করে। এমনকি নামটাও পার্টে ফেলে। তবে মুসলিমের লেভেল এঁটে এরা ঠিক সেই বিকৃত-মনগড়া মতবাদ প্রচারে আগের মতোই সক্রিয় থাকে। ষোড়শ শতাব্দীতে এসে এদের মতবাদের অন্যতম ধর্ম প্রচারক দাউদ ইবন কুতুব শাহর (১৫৩৯-১৬১২) নামানুসারে এদের নতুন নাম হয় ‘দাউদি বোহরা’। বোহরা শব্দটি এসেছে গুজরাটি শব্দ ‘ভেহর’ থেকে। যার অর্থ ব্যবসা। গুজরাটে তখন দুই শ্রেণির মানুষই শুধু ব্যবসায়ী ছিল। একদল ছিল প্রকৃত মুসলিম, যাদেরকে বোহরা মুসলিম বলা হতো এবং অপর দল ছিল সেই দাউদ ইবন কুতুব শাহর বংশধর ও তার ফেদাইন অনুসারী, যাদেরকে বলা হতো ‘দাউদি বোহরা’।



দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, আজকাল কিছু মুর্খ অজ্ঞতাবশত এবং কিছু কূপমণ্ডুক জ্ঞাতসারে লেবাসধারী এই দাউদি বোহরাদেরকে দেওবন্দি আলেম বলে আখ্যায়িত করছে! অথচ বাস্তবে এরা হচ্ছে- হাসান-সিনানের দুনিয়ায় রেখে যাওয়া অবশিষ্ট প্রেতাত্মা। অভিশপ্ত হাশাশিন-ফেদাইনদের আপডেট ভার্সন!

প্রকৃত সত্য হচ্ছে, দাউদি বোহরাদের সুনুতি লেবাস, বেশভূষা দেখে বোঝার কোনো উপায়ই নেই যে, এরা মুসলিম দরবেশ নাকি মূলত মুসলিম বেশধারী জঘন্য কাফের! এদের মুখভর্তি লম্বা দাড়ি, মাথায় টুপি, গলায় রুমাল-চাদর ও গৌড়ালি পর্যন্ত লম্বা পাঞ্জাবি দেখলে অচেনা যে কেউ এদেরকে দেওবন্দি আলেম ভাবতে বাধ্য! পরিচয় নিশ্চিত করার সমস্যা এখানেই। এরা যে লেবাসধারী মুসলিম সেটা প্রামাণিত হয় এদের কথিত ইবাদতের মাধ্যমেই। এরা সুনুতি লেবাস পরেই নিঃশঙ্কচিত্তে মাজারে গিয়ে যেমন মাথা ঠুকতে পারে তেমনি শিব মূর্তির সামনে ফুলও রাখতে জানে! এমনকি হিন্দু মন্দিরে গিয়ে এরা সদলবলে প্রার্থনাও করতে পারে! (নাউজুবিল্লাহ)!

বিস্ময়কর তথ্য হলো, এই দাউদি বোহরা সংশ্লিষ্ট আজকের শিক্ষিত-ধনাঢ্য আগা খানিরাও হচ্ছে বাইবার্সের তাড়া খেয়ে পলায়নকারী শামের শেষ শাইখুল জাবালের সরাসরি বংশধর। আগা খান শব্দটি এসেছে প্রাচীন তুর্কি শব্দ ‘আকা’ (বড়ভাই) ও মোঙ্গল শব্দ ‘খান’ (শাসক) শব্দ থেকে। যার মিলিত অর্থ দাঁড়াচ্ছে শাসক বড় ভাই। এই উপাধি প্রথম ধারণ করেন, ইসমাইলি শিয়াদের ৫২তম ইমাম হাসান আলি শাহ। তিনি ভারতের মুম্বাইয়ে ১৮৮১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। সেই থেকে ইসমাইলি শিয়াদের ইমামের নতুন উপাধি হয়ে যায় আকা খান বা আগা খান। আজকাল আধুনিক তুর্কিতেও আকাকে আগাই বলা হয়। আমরা যারা স্যার আগা খানের নাম শুনেছি, তিনিই ইসমাইলি শিয়াদের ৫৪তম ইমাম তৃতীয় আগা খান। তিনি চামচামি করেই ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে স্যার উপাধি বাগিয়ে নেন। বর্তমানে ইসমাইলি শিয়াদের ৫৫তম ইমাম হচ্ছেন চতুর্থ আগা খান উপাধিধারী প্রিন্স শাহ করিম আল হুসাইনি। পাকিস্তানের আগা খান ইউনিভার্সিটি ও আগা খান ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন চতুর্থ এই আগা খান। সম্প্রতি এই আগা খান ট্রাস্ট-ই মাসইয়াফসহ অসংখ্য হাশাশিন অঞ্চলের পুরাকীর্তিগুলোকে নতুন করে সংস্কার করেছে। বর্ষা বাহুল্য, চতুর্থ আগা খান প্রিন্স শাহ করিম শামের কুখ্যাত শাইখুল জাবাল-রশিদউদ্দিন সিনানের সাক্ষাৎ বংশধর। উল্লেখ্য, চতুর্থ আগা খান কিছুদিন আগে বাংলাদেশও সফর করে গিয়েছেন।



১২৬৮ সালের কথা। সুলতান বাইবার্দের নেতৃত্বে এন্টিয়কের কঠিন অবরোধ যখন চলছিল, তখন এন্টিয়করাজ চতুর্থ বোহেমন্ড বাইবার্দের তাড়া খেয়ে ত্রিপোলি এসে অবস্থান নেন। চেষ্টা করেও অবরোধ ভাঙতে না পেরে রাজা বোহেমন্ড মনের দুঃখে ইউরোপে দূত পাঠান। এন্টিয়ক রক্ষায় বাইবার্দের বিরুদ্ধে নতুন করে ক্রুসেড ঘোষণার আর্জি জানান। ইংরেজ ও ফরাসিদের কাঁধে ভর করে পোপ চতুর্থ ক্রেমন্ট তাই ফের ডাক দেন রক্তঝরা ক্রুসেডের। ক্রুসেড ইতিহাসের ক্রমধারায় এটাই অষ্টম ক্রুসেড হিসেবে বিবেচিত। অবশ্য এর অনেক আগেই এন্টিয়ক তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। অষ্টম এই ক্রুসেডে ইলখানি মোঙ্গলরাও সরাসরি অংশ নেয়। সর্বসম্মতিক্রমে হালাকুপুত্র আবাগা খান সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মনোনীত হন।

সিদ্ধান্ত হয়, সম্মিলিত ক্রুসেড বাহিনী একই সাথে তিন দিকে বাইবার্দের মামলুক সালতানাতে আক্রমণ চালাবে। ফ্রেঞ্জ সম্রাট নবম লুইয়ের নেতৃত্বাধীন বাহিনী আফ্রিকার তিউনিসে হামলার মাধ্যমে পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে বাইবার্দের রাজ্যে প্রবেশ করবে। ইংল্যান্ড ও সাইপ্রাসের নেতৃত্বে আরেকদল ক্রুসেডার আক্রমণ চালাবে বাইবার্দের রাজ্যের এশীয় অংশে, তারা নৌপথে ঢুকবে লেভান্ট হয়ে। আর ইলখান নেতা আবাগা খান তার দুর্বীর মোঙ্গলদের নিয়ে হামলা চালাবেন বাইবার্দের রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত দিয়ে, শাম সীমান্তের উত্তর দিক দিয়ে ঢুকে তিনি হালব-দামেশক দখলে নেবেন। ত্রিমুখী এ হামলায় তখন দেখা যাবে, বাইবার্দের টিকেন কীভাবে?

সম্রাট নবম লুইয়ের উদ্দেশ্য ছিল, তিনি তিউনিসে ঘাঁটি গেড়ে পশ্চিম দিক দিয়ে মামলুক সালতানাতে হামলা চালিয়ে একে একে অধিকার করে নেবেন লিবিয়ার ত্রিপোলি ও মিশরের কায়রো। অতঃপর কায়রো থেকে সরাসরি জেরুসালেম আক্রমণ করে বসবেন। ইংল্যান্ড ও সাইপ্রাসের যৌথ বাহিনী আক্রমণ চালাবে সোজা জেরুসালেমে। এবং আবাগা খান হালব ও দামেশক অধিকার করে ইংল্যান্ড, সাইপ্রাস ও ফ্রান্সের বাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে সম্মিলিতভাবে আক্রমণ চালাবেন সোজা জেরুসালেমে। মঙ্গল ব্রাহ্মণের ব্যাপার হচ্ছে, যে বাইবার্দেরকে ধ্বংস করার জন্যে এই মহাপরিকল্পনা, 'বাহাদুর' খ্রিস্টান-মোঙ্গল ফৌজের কোনো একটা পরিকল্পনাতেই কিন্তু বাইবার্দের মুখোমুখি হওয়ার উল্লেখ ছিল না! তাদের মূল লক্ষ্যই ছিল বাইবার্দেরকে এড়িয়ে বাইতুল মাকদিস অধিকার করে

নেয়া! তারা চেয়েছিল বাইবার্স হাশাশিন রাজ্যে ব্যস্ত থাকার সুযোগেই কাজ সারতে হবে। এতোই ভয় ছিল তাদের বাইবার্সকে নিয়ে!

সম্রাট নবম লুই তার মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও বাইবার্সের সাথে তার বিশ বছর আগের সব হিসাব চুকানোর লক্ষ্যে ইতালির নেপলসের রাজা প্রথম চার্লস এবং স্পেনের ন্যাভারের রাজা দ্বিতীয় থিওবোল্ডকে সাথে নেন। বিশ বছর আগে এই বাইবার্সের হাতেই তিনি মানসুরাহ প্রান্তরে সসৈন্যে বিধ্বস্ত ও ধৃত হন। উল্লেখ্য, ইতালির নেপলস তখন ছিল ফ্রেঞ্চ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। খ্রিস্টানরা বাইবার্সকে শেষ করার জন্য এতোই উন্মুখ ছিল যে, ক্ষুদ্র ন্যাভারের রাজাও সসৈন্যে নবম লুইয়ের অনুগামী হয়। সিসিলির রাজা ফ্রুসেডারদের প্রচুর পরিমাণ অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন। অবশেষে তিন রাজ্যের সম্মিলিত বাহিনী বিশাল এক নৌবহরে করে তিউনিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। উদ্দেশ্য, সেখানে ঘাঁটি গেড়ে পর্যায়ক্রমে সামনে অগ্রসর হওয়া। শত্রুর রাজ্যে সরাসরি হামলা না চালিয়ে শত্রুরই রাজ্যের পাশে ঘাঁটি স্থাপন মারাত্মক একটা সামরিক ও কৌশলগত ভুল। ব্যাপারটা এমন নয় যে, সম্রাট নবম লুই এটা জানতেন না। প্রকৃত ব্যাপার হলো, তখনকার ফ্রুসেডাররা সরাসরি বাইবার্সের রাজ্যে হামলা চালাবার মতো সাহসী ছিল না, তাই তারা ঝুঁকিটা নিয়েছিল। তখন তিউনিস (আধুনিক তিউনিসিয়া) শাসন করতেন বনু হাফস বংশীয় সুলতান প্রথম মুহাম্মাদ। সুলতান মুহাম্মাদ ও বনু হাফস বংশীয়রা ছিল খ্রিস্টানদের বন্ধু। তারা ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের সাথে সর্বদাই মিত্রতা বজায় রেখে চলতো। তবুও বাইবার্স কোনদিনই তিউনিসে হামলা চালাননি। বাইবার্সের এই একটি গুণ ছিল ব্যতিক্রমী, মহৎ। তিনি “মুসলিমদের প্রতি কোমল ও বিধর্মীদের প্রতি ছিলেন বজ্রকঠিন”। বিনা কারণে পার্শ্ববর্তী কোনো মুসলিম রাজ্যে তিনি কখনোই হামলা চালাননি! নিজ সাম্রাজ্যের পরিধি বাড়ানোর জন্য তো নয়ই। অথচ তিনি মহাশক্তিধর ফ্রুসেডার, সূর্যপূজারি মোঙ্গল, ভয়ঙ্কর ফেদাইন কাউকেই সামান্যতম ছাড় দেননি। বাইবার্স এখানেই অনন্য, অসাধারণ, বেনজির।

জুলাই ১২৭০ সাল। ফ্রুসেডারদের বিশাল নৌবহর বনু হাফস সালতানাতের প্রাচীন নগরী কার্থেজ এর উপকূলে এসে পৌঁছলো। কিন্তু সমুদ্রযাত্রার জন্য সময়টা মোটেই অনুকূলে ছিল না। তাই দেখা গেলো, পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানির অভাব ও দূষিত পানি পানের ফলে বেশির ভাগ সৈন্যই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বিশ বছর আগে সপ্তম ফ্রুসেডার সময় সম্রাট নবম লুই যখন আদ দামিয়াত অধিকার করেন, তখন তার ঘর আলো করে একটি পুত্র সন্তান জন্মেছিল। বিশ বছর বয়সের সেই টগবগে যুবক জন ক্রিস্তান এবার আশায়ে ভুগে ৩ আগস্ট তিউনিসে মারা গেলেন। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! সপ্তম ফ্রুসেডার দুর্দিনে

জন্ম নেয়া শিশু, উঠতি যৌবনেই অষ্টম ক্রুসেডের দুর্বিপাকে পড়ে প্রাণ খোয়ালেন!

এখানেই শেষ নয় ক্রুসেডারদের দুর্দশার। প্রতিকূল পরিবেশে অসংখ্য ক্রুসেডার ডায়রিয়ার প্রকোপে মারা তো গেলোই, প্রায় গোটা বাহিনীতেই মহামারির মতো আমাশয় ছড়িয়ে পড়লো। এমনকি স্বয়ং ফ্রেঞ্জ সম্রাট নবম লুই-ও ২৫ আগস্ট ১২৭০ সালে বিধ্বংসী এই আমাশয়ের ফলে সৃষ্ট প্রচণ্ড পেটের ব্যথায় মারা গেলেন। তার মৃত্যুর মধ্যদিয়ে ক্রুসেড বাহিনীতে হতাশা দেখা দেয়। সেই হতাশা থেকেই এবার তারা উল্টোযাত্রা শুরু করে। যুদ্ধ না করেই ফিরে যায় নিজ দেশে। ফরাসি বাহিনীর এ করুণ অবস্থা দেখে পরিকল্পনা মতো ইংরেজ ও মোঙ্গল বাহিনী আর মাঠেই নামলো না। ফলে এখানেই যবনিকাপাত ঘটলো অষ্টম ক্রুসেডের।

নবম লুই খ্রিস্টান হলেও তিনি ছিলেন ভিন্নধরণের একজন মহান ব্যক্তি। তিনি সমসাময়িক খ্রিস্টান রাজাদের মতো মদ্যপ, লম্পট ও বদম্যায় চরিত্রের ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ। একারণেই সম্রাট নবম লুইকে ‘সেন্ট লুই’ বা ‘সাধু লুই’ বলা হয়। মৃত্যুকালেও তার শেষ কথা ছিল “হায়! জেরুসালেম”। নবম লুইয়ের মৃত্যুর পর তার বিশ্বস্ত ভাই নেপলসের রাজা ও আনজুর সাবেক কাউন্ট প্রথম চার্লস নবম লুইয়ের পুত্র তৃতীয় ফিলিপকে ফ্রান্সের সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন।

তিউনিস উপকূলে ক্রুসেডাররা যখন প্রকৃতির রুদ্ররোধের শিকার, সুলতান বাইবার্স তখন আন নাসিরিয়া পার্বত্যঞ্চলে হাশাশিন গুপ্তঘাতকদের দুর্গপুঞ্জ অবরুদ্ধ করে রেখেছেন। সুলতান বাইবার্স রশিদউদ্দিন সিনানের মৃত্যুস্থল আল কাহাফ দুর্গের অবরোধ তদারক করাবস্থায়ই সর্বপ্রথম ক্রুসেডারদের সর্বপ্লাবী এ পরিকল্পনা এবং স্বয়ং নবম লুইয়ের সসৈন্যে তিউনিস আগমনের সংবাদ পান। সাথে সাথে সুলতান বাইবার্স তার অন্যতম সেরা সেনাপতি কালাউনকে দ্রুত তিউনিস আক্রমণের নির্দেশ দেন। কালাউনকে এরকমই যেকোনো অকস্মাত বিপদ মোকাবেলার জন্য সুলতান তার রাজধানী কায়রোতে রেখে গিয়েছিলেন। সুলতানের নির্দেশ পাওয়ামাত্রই কালাউন কায়রো থেকে তিউনিস অভিমুখে সসৈন্যে অগ্রসর হন। সুলতান কেবলমাত্র কালাউনকে নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না; বরং নিজেও আল কাহাফ থেকে তিউনিস পানে অগ্রসর হন। সুলতান বাইবার্স এই অগ্রাভিযানে অস্বাভাবিক রকমের ক্ষিপ্ততার পরিচয় দিয়ে আবারো তার নামের স্বার্থকতার প্রমাণ দেন। তিনি মাত্র ৫০ ঘণ্টায় দামেশকের আরো উত্তরের আল কাহাফ থেকে লেবানন, ইসরাইল হয়ে মিশরের রাজধানী কায়রো পৌঁছে যান। অথচ সে সময় বারবার ঘোড়া বদলিয়েও কায়রো থেকে দামেশক

যেতে সর্বনিম্ন ৬০ ঘণ্টা সময় লাগতো। ততোক্ষণে কালাউনও পৌছে গিয়েছেন তারাবুলুস আল গারব-এ (আধুনিক লিবিয়ার ত্রিপোলি)। ঠিক সে সময়ই সুলতান বাইবার্স ক্রুসেড বাহিনীতে মহামারির প্রাদুর্ভাব ও তাদের ফিরে যাওয়ার সংবাদ পান। ক্রুসেডারদের ফিরে যাওয়ার সংবাদ পেয়েই বাইবার্স কালাউনকে ফিরে আসার নির্দেশ দেন। কারণ তিনি খামোখাই কোনো মুসলিম রাজ্যে আক্রমণ পছন্দ করতেন না। অথচ চাইলে ক্রুসেডারদের সাথে সখ্যতার ধূয়া তুলে তিউনিসকে তখনই তিনি রাজ্যভুক্ত করে নিতে পারতেন। কিন্তু বাইবার্স ছিলেন সুস্থ চিন্তার পরিচ্ছন্ন এক সমরনায়ক, হীনকৌশল তার ধাতে ছিল না মোটেই। আর এজন্যেই তিনি ছিলেন আমৃত্যু অপরাজেয়। আজও হয়ে আছেন চিরঅমর।

অষ্টম ক্রুসেডের ফল ক্রুসেডারদের জন্য মোটেই সুখকর হয়নি। এ যেন সপ্তম ক্রুসেডেরই পুনরাবৃত্তি। সপ্তম ক্রুসেডে এই সশ্রুট নবম লুই-ই লজ্জাজনকভাবে পরাজিত ও ধৃত হয়েছিলেন। পরে বিশাল অঙ্কের মুক্তিপণ ও মুচলেকা দিয়ে ব্যর্থ মনোরথে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। এবারের অষ্টম এই ক্রুসেডেও প্রতিকূল আবহাওয়ার কাছে পরাজিত হয়ে সেই সশ্রুট নবম লুই ফিরে গেলেন ফ্রান্সে। ঠিক সশ্রুট লুই-ও নয়; লুইয়ের মৃতদেহ! সপ্তম ক্রুসেডের সবচেয়ে তৎপর নায়ক নবম লুইয়ের ভাই নেপলসের রাজা ও আনজোর সাবেক কাউন্ট চার্লস আবারো খালি হাতে ফিরে গেলেন সেই একই ব্যক্তির ভয়ে! যার নাম ‘বাইবার্স’!

ক্রুসেডাররা যুদ্ধ না করেই বিপর্যস্ত বাহিনী নিয়ে বিধ্বস্ত মনোবলে ইউরোপে ফিরে গেলো ঠিকই। কিন্তু ইউরোপে পৌছেও তারা ব্যর্থতার জ্বালা ভুলতে পারলো না। এরই মাঝে কাঁটা গায়ে নুনের ছিটা হয়ে সংবাদ এলো-তাদের মহাশত্রু বাইবার্স আরও একটি বিরাট বিজয় লাভ করেছেন! ১২৭১ সালের মধ্যেই সুলতান বাইবার্স উনিশটি দুর্গসমেত লেভান্টের পুরো হাশাশিন রাজ্যই হজম করে নিয়েছেন। প্রায় গোটা লেভান্টের তীর এখন বাইবার্সের সাম্রাজ্যভুক্ত। বাইবার্স থাবায় ঐতিহাসিকভাবেই ভয়ানক গুপ্তস্বতন্ত্রীদের পতন ঘটেছে আন নাসিরিয়া পার্বত্যঞ্চল ও গোটা শাম উপকূল থেকে।

বাইবার্সের সিংহাসনারোহণের সময়ে শামে যেখানে মুসলিম আধিপত্য সামান্য অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানে মাত্র এক দশকের ব্যবধানে ১২৭১ সালে এসে হাশাশিন রাজ্য জয়ের মধ্য দিয়ে বর্তমান সিরিয়া-লেভান্ট ভূখণ্ডে মুসলিম আধিপত্য সর্বোচ্চ স্তরে পৌছে। সিংহাসনে বসেই সুলতান বাইবার্স ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে একের পর এক সিরামহীন অভিযান পরিচালনা করে একমাত্র আক্কা বাদে ক্রুসেডরাজ্য কিংডম অব জেরুসালেমের প্রায় পুরোটাই হজম করে ফেলেন। অপর দুই ক্রুসেডরাজ্য এন্টিয়ক-সিলিসিয়াকেও নিমিষেই মামলুক সালতানাতে অঙ্গীভূত করে নেন!

ক্রুসেডারদের দুর্দশার এখানেই শেষ নয়; তাদের নতুন মুনিব বিশ্বত্রাস মোঙ্গল বাহিনীকে পর্যন্ত তিনি ক্রমাগত নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছেড়েছেন! বাইবার্সের বিরুদ্ধে কি ক্রুসেডার-মোঙ্গল, কি সিলিসিয়ান-জর্জিয়ান নাইট, এমনকি খতরনাক হাশাশিন কেউই এখনতক পেরে ওঠেনি। একটা যুদ্ধেও কেউ জিততে পারেনি। বরং সম্মিলিত বিশ্বশক্তির অবস্থা দিন দিন করুণ ও বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বাইবার্স লেভান্ট অঞ্চলে ক্রুসেডারদের পা রাখার জন্য এক ইঞ্চি মাটিও আর অক্ষত রাখবেন না। এ পর্যায়ে এসে বিধর্মীদের জন্য সবচে' লজ্জার ব্যাপার হচ্ছে- ক্রুসেডার, আর্মেনীয়-জর্জিয় নাইট এমনকি শামানবাদি মোঙ্গলদের মনেও চরমভাবে 'বাইবার্স ভীতি' ঢুকে গেছে। এরা ধরেই নিয়েছে বাইবার্স এদের কাউকেই ছাড়বেন না। বাইবার্সের হাতে একে একে এদের সবারই পতন ঘটবে। কেননা তাদের চোখে বাইবার্স এক অপরাজেয় শক্তি। আসলে ছিলেনও তা-ই।

এতো এতো বিজয়, বলদর্পী সব বিধর্মী রাজ্যজয়ের পরেও বাইবার্স কিন্তু পুরোপুরি সন্তুষ্ট ছিলেন না। অন্তত একটা ভূখণ্ডের ব্যাপারে তার চাপা অস্বস্তি রয়েই গিয়েছিল। সেটি হচ্ছে লেভান্টের একমাত্র অক্ষত ক্রুসেডারাজ্য কিংডম অব ত্রিপোলি। এন্টিয়ক বিজয়ের প্রাক্কালে ত্রিপোলি সীমানায় বাইবার্স একবার চড়াও হলেও এন্টিয়কের প্রয়োজনে ত্রিপোলির হিসাব তখন বাকি রেখেই তাকে সেখানে চলে যেতে হয়। অষ্টম ক্রুসেডে ফ্রান্স আবারো মুসলিমদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ক্রুসেডে এগিয়ে আসায় বাইবার্স এবার তাদের প্রতি মারমুখী হয়ে উঠলেন। কিংডম অব ত্রিপোলিকে শায়েস্তা করার তার পুরোনো ইচ্ছাও আবার জেগে ওঠলো। কারণ ত্রিপোলি তখন ছিল ফ্রান্স সাম্রাজ্যের অধীনে। অদম্য বাইবার্স এবার সেদিকেই হাত বাড়ালেন। উদ্দেশ্য, ফরাসিদেরকে মোক্ষম একটা জবাব দেয়া।

টানা ভ্রমণ ও রণক্লান্ত বাইবার্স নিজে যেমন কোনো বিশ্রাম নিলেন না, তেমনি বিশ্রাম নিতে দিলেন না তার অদম্য মামলুক সেনাদলকেও। বরং সেই ১২৭১ সালেই তিনি ফের লেভান্টে ফিরে এলেন। এসেই লেভান্টে ফ্রান্স সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ ও অন্যতম ক্রুসেডারাজ্য কান্ট্রি অব ত্রিপোলির অন্তর্গত বুর্জ সাফিতা অভিমুখে অগ্রসর হন। এই অঞ্চলটি কিছুদিন আগেও হাশাশিন গুণ্ড্যাতকদের অধীনে ছিল। কিন্তু বুর্জ সাফিতার ব্যাপারটি ছিল ভিন্ন। এটি এতোই সুদৃঢ় একটি দুর্গ ছিল যে, হাশাশিনদের রাজ্যের পেটের ভেতরেই স্বাধীন ও সার্বভৌমভাবে এটি তার স্বকীয়তা ধরে রেখেছিল। লুবনান পর্বতমালার তিনটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল নাইট টেম্পলারদের এই দুর্গটি। এই তিন পাহাড়ের মাঝেরটির শীর্ষচূড়ায় ছিল এই দুর্গের বুর্জ বা

মিনার। যার উচ্চতা ছিল ৯২ ফিট! একে তো গোটা দুর্গ এলাকাটিই গড়ে উঠেছিল লুবনান পর্বতমালার বরফাবৃত সর্বোচ্চ চূড়ায়, তার উপর ৯২ ফিট উঁচু বিখ্যাত সেই বুর্জিটি দুর্গকে সীমাহীন দুর্ভেদ্য-অজেয় করে তুলেছিল। এই দুর্গের মূল বৈশিষ্ট্য ও আকর্ষণই ছিল এর সুউচ্চ বুর্জ। হাশাশিন রাজ্যের মাঝে এটি ছিল ক্রুসেডারাজ্য কিংডম অব ত্রিপোলির অধীনস্থ একটি এলাকা। এর ইউরোপীয় নাম ছিল Chastel Blanc।

সুলতান বাইবার্স আচমকা এসেই অজেয় দুর্গটি অবরোধ করে বসেন। বাইবার্সের নির্দেশে দুর্ধর্ষ কিছু মামলুক সেনা কোনো প্রকারের ভারী অবরোধ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া কেবল দড়ি ও মইয়ের সাহায্যেই দুর্গের সুউচ্চ বুর্জে উঠে পড়লে ক্রুসেডারদের পিলে চমকে যায়। ফলে সহসাই দুর্গটির পতন ঘটে। এক্ষেত্রে সুলতান বাইবার্সের রণকৌশল ছিল এরকম, একদল সেনা মিদফা দিয়ে বুরজ রক্ষীদের উপর ক্রমাগত তীব্র অগ্নিশোলা বর্ষণ করবে আর এই সুযোগে বাছাইকৃত আরেকদল দুর্ধর্ষ মামলুক সেনা মই-দড়ির সাহায্যে জীবনবাজি রেখে বুরজের শীর্ষে আরোহণ করবে। বাইবার্সের এ চাল কাজেও দিয়েছে বেশ! ১২৭১ সালে বুর্জ সাফিতার পতন ঘটলে বাইবার্সের সামনে এবার ত্রিপোলির দুয়ার খুলে যায়!

ভৌগলিকভাবে বুর্জ সাফিতার গুরুত্ব ছিল খুবই বেশি। কারণ এর পশ্চিমে ছিল ভূমধ্যসাগর, পূর্বে আন নাসিরিয়া পর্বতমালা, উত্তরে জাবাল লুবনান এবং দক্ষিণে ত্রিপোলি। এই বুর্জ সাফিতার চারদিকে ক্রুসেডাররা আরো চারটি শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। ঘাঁটিগুলো হচ্ছে আনতারতুস, আরওয়াদ দ্বীপ, কালাত ইয়াহমুর ও আক্কার। এই চারটির মধ্যে আরওয়াদ ও আক্কার ছিল খ্রিস্টানদের দখলে। আন তারতুস ও ইয়াহমুর ছিল বাইবার্সের অধিকারে। বুর্জ সাফিতার অবস্থান ছিল আন তারতুসের দক্ষিণে, আরওয়াদের পূর্বে, কালাত ইয়াহমুরের পশ্চিমে ও আক্কারের উত্তরে। বুর্জ সাফিতার পতনের অর্থ ছিল, আক্কারের এবং একই সাথে কান্দ্রি অব ত্রিপোলির রাজধানী ত্রিপোলি নগরীর মিরাপতাও হুমকির মুখে পড়া। বাইবার্স কর্তৃক বুর্জ সাফিতা অধিকারের ফলে ক্রুসেডাররা তাই নিশ্চিতভাবেই ধরে নিয়েছিল বাইবার্স এবার ত্রিপোলি হানা দিচ্ছেন। তাই তারা বাইবার্সকে রুখতে ত্রিপোলি রাজ্যের সীমাহীন শহর ও দুর্গগুলোতে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে সেগুলোকে মজবুত করে তুললো। খ্রিস্টানরা ভেবেছিল বাইবার্স পদে পদে এতোসব বাঁধা-বিপত্তি পরিয়ে ত্রিপোলি পৌছতেই পারবেন না! তাই বাইবার্সের একের পর এক সামরিক অভিযানের ফলে বাস্তবচ্যুত ভীত খ্রিস্টান শরণার্থীরা নিরাপত্তার খোঁজে দলে দলে ত্রিপোলিতে এসে আশ্রয় নিতে লাগলো। এ সময় ত্রিপোলিতে খ্রিস্টান শরণার্থীর সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়িয়ে

যায়! কিন্তু চিরসবুজ বাইবার্স তার ক্ষিপ্ত গতিসম্পন্ন মামলুক বাহিনী নিয়ে ত্রিপোলি রাজ্যের অন্যান্য দুর্ভেদ্য দুর্গ ও সৈন্যভর্তি শহর এড়িয়ে একেবারে খোদ ত্রিপোলির সামনেই হাজির হয়ে ক্রুসেডারদের তাক লাগিয়ে দিলেন। ১২৭১ সালে বাইবার্স ত্রিপোলির নগরদুর্গ অবরোধ আরম্ভ করলে খ্রিস্টানদের মধ্যে চরম হতাশা ও ভীতিভাব ফুটে উঠে। তারা ত্রিপোলি রক্ষায় সাহায্য চেয়ে দূত পাঠায় ইউরোপে। ইউরোপ ধর্ণা দেয় মোঙ্গল দরবারে। সহসাই ঘোষিত হয় নয়া ক্রুসেড। নবম ক্রুসেড। কিন্তু বাইবার্স জানতেন না এসবের কিছুই। তিনি বুঝতেই পারলেন না এরই মধ্যে তার বিরুদ্ধে আরো একটি ক্রুসেড ঘোষিত হয়ে গেছে!

মোঙ্গল ও ক্রুসেডাররা তাদের মুহুমূহ্ পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে এবার সত্যিই পাগলপ্রায় হয়ে উঠেছে! খ্রিস্টীয় ইউরোপ ধৈর্যে আসছে লেভান্ট অভিমুখে। নয়া ক্রুসেডের রণঝঙ্কারে তাই আকাশ-বাতাস গমগম করছে! ওরা হাজির শাম-লেভান্টের দোরগোড়ায়। যে কোনো মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারে বাইবার্সের স্বপ্নের মামলুক সালতানাত। ফের খোয়া যেতে পারে তীর্থের জেরুসালেম, বেদখল হতে পারে আরাধ্য লেভান্ট। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, সাইপ্রাস তো আছেই, আবাগা খানের নির্দেশে এক বাইবার্সের বিরুদ্ধেই তেড়ে আসছে কেন্দ্রীয় মোঙ্গল বাহিনীর স্পেশাল রেজিমেন্টও!

স  
পৃষ্ঠা



১২৭১ সাল। সুলতান বাইবার্স কর্তৃক অবরুদ্ধ ত্রিপোলি। নগরবাসীর মনে অজানা শঙ্কা। সর্বত্র হিমশীতল আতঙ্ক। সীমাহীন উদ্বেগ-উৎকর্ষের মধ্যেই তারা সাহায্যের আবেদন জানালো ইউরোপে। শরণাপন্ন হলো তাদের অঘোষিত পোপ ইলখানাত শাসক মোঙ্গল নেতা আবাগা খানের দরবারে। আবাগা খান এমনিতেই ছিলেন বাইবার্সের উপর ক্রুদ্ধ, বিরুদ্ধ। কেননা এই বাইবার্সের হাতেই তার অপরাজেয় পিতা হালাকু খান শেষ জীবনে কয়েকবার শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হন। অবশেষে সে শোকেই তিনি পরপারে পাড়ি জমান। মোঙ্গলরা অপরাজেয় নয়; আইন জালুতের স্বীকারণ দিয়ে এমন অবিশ্বাস্য একটা ধারণাকে তিনিই যে সর্বপ্রথম বাজারে চালু করেন। সেইসাথে ইলখানি মোঙ্গলদের চোখরাঙানিকে খুড়ি মেরেই বাইবার্স তাদের চিরশত্রু সিরওর্দা মুসলিম খানাতের সাথে মিত্রতাও গুরু করেন। শুধু তাই নয়, এই বাইবার্সের



হাতেই তাদের কৌশলগত দুই করদরাজ্য সিলিসিয়া ও এন্টিয়কের পতন পর্যন্ত ঘটে। এমনকি তাদের দুই শক্তিশ্রম সহযোগী ক্রুসেডার ও হাশাশিন গুপ্তঘাতকরা তারই হাতে বারবার লাঞ্চিত ও নিগৃহীত হয়ে আসছে। মাসইয়াফের হাশাশিনরা সমূলে উচ্ছেদ হবার পর বাইবার্স তোপে এবার লেভান্ট থেকে ক্রুসেডারদেরও তল্লাী গোটানোর পালা। এমন দৃশ্য আবাগা খান চেয়ে চেয়ে দেখেন কী করে! কারণ তিনি যে বাপের মতোই খ্রিস্টানদের পরম সখা, বাইবার্সের মহাশত্রু। তাই ক্রুদ্ধ আবাগা খান আর কালবিলম্ব না করে ফের মুসলিম-খ্রিস্টান রক্তাক্ত ক্রুসেডে নিজেদেরকে সরাসরি জড়িয়ে ফেললেন। কিন্তু আবাগা খান সিরওর্দার খান মিস্রু তিমুরের মুসলিম সেনাপতি নোগাইয়ের সাথে তুর্কিস্তানের একাংশের অধিকার নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত থাকার অজুহাতে নিজে এই ক্রুসেডে যোগ দিলেন না। বরং তার পোড়খাওয়া সেনাপতি সামাগারকে খোদ চীনের কেন্দ্রীয় কমান্ড থেকে আগত রাজকীয় মোঙ্গল বাহিনীর বাছাইকৃত ১০ হাজার সৈন্যসহ বাইবার্সের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। ঠিক বাইবার্সের বিরুদ্ধেও নয়; বরং বাইবার্সের অনুপস্থিতিতে শামের দখল বুঝে নিতে!

মূলত বাইবার্সের ভয়ে আবাগা খান যুদ্ধে অংশ না নিলেও এর পিছনে আরো একটা কারণ রয়েছে। সেটা হলো বাইবার্স সামাগারের কাছে পরাজিত হলে যুদ্ধে না গিয়েও বিশ্বে আবাগা খানের মর্যাদা বহুল পরিমাণে বেড়ে যাবে। ইতোমধ্যেই তিনি পারস্যের গুপ্তঘাতকদের শেষ ঘাঁটি গিরদকোহ অধিকার করেছেন, (যদিও তা বাইবার্সেরই কল্যাণে) যা হালাকু খানও পারেননি! মসনদে বসেই তিনি বিশ্বশক্তি সিরওর্দা খানাতকে পরাস্ত করে আজারবাইজান ও দাগেস্তান পর্যন্ত পুনর্দখল করেছিলেন। ফলে তার বীরত্বের একটা খ্যাতি এমনিতেই আছে। অপরদিকে বাইবার্স ছিলেন বিশ্বস্বীকৃত একজন অপরাজেয় মুসলিম যোদ্ধা। যিনি কখনোই একটি যুদ্ধেও পরাজিত হননি! তাই আবাগা খান নিজে ঝুঁকিটা না নিয়ে বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞ, বিদগ্ধ বর্ষিয়ান সেনাপতি সামাগারকেই বাইবার্সের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। আবাগা খান ধীরেই নিয়েছিলেন বাইবার্স এবার নিশ্চিতভাবেই পরাজিত হবেন। আর আবাগা খানের সেনাপতির কাছে বাইবার্সের মতো অপরাজেয় সমরনায়কের পরাজয়ের অর্থই হলো বিশ্বে আবাগা খানের নাম আরো ছড়িয়ে পড়া। আবাগা খানের নিশ্চিত বিশ্বাসের কারণ হলো, এই ১০ হাজার সৈন্য যেনতেন সৈন্য নয়; এরা এসেছিল মোঙ্গল রাষ্ট্রসম্রাজ্যের হাইকমান্ড চীনের ইউয়ান খানাতের খাকান খানের রাজকীয় বাহিনী থেকে। এদের আনাই হয়েছিল বাছাই করে। এরা ছিল এমন সৈন্য যারা কোনো যুদ্ধে কোনোদিনই পীঠটান দেয়নি! পরীক্ষিত দুর্ধর্ষ সৈন্যদের নিয়েই এই বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল।

নবম ক্রুসেডে সম্মিলিত বাহিনীর পরিকল্পনা ছিল, ইউরোপীয় খ্রিস্টানরা সুলতান বাইবার্সকে লেভান্তে ব্যস্ত রাখবে, এই ফাঁকে মোঙ্গলরা কাজ সারবে! বাইবার্সের অনুপস্থিতিতে সামাগারের মোঙ্গল ফৌজ চোখের পলকে পুরো সিরিয়া বিধ্বস্ত করে দখলে নেবে। এ পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়েছিল নবম ক্রুসেডের শুরুতেই। ত্রিপোলির সাহায্যের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ইংল্যান্ডের প্রিন্স এডওয়ার্ড আবাগা খানের কাছে সাহায্য চেয়ে নিবেদন করলে আবাগা খান এডওয়ার্ডকে লিখেন: “বিষয়টি অবগত হওয়ার পর আমরা এই সমস্যার ওষুধ হিসেবে সামাগারকে প্রচণ্ড শক্তিশালী এক বাহিনীসহ পাঠাচ্ছি। এ ব্যাপারে তোমরা নিজেদের মাঝে আলোচনা করে সঠিক একটা সিদ্ধান্ত নাও; যাতে সামাগার ওখানে পৌঁছামাত্রই তোমরাও যেন শত্রুকে ব্যস্ত রাখতে পারো”।

১৫ অক্টোবর ১২৭১ সাল। সামাগারের নেতৃত্বে ৩০ হাজার সৈন্যের বিশাল মোঙ্গল বাহিনী মুসলিম সীমান্ত অতিক্রম করলো। সামাগার রাজকীয় মোঙ্গল বাহিনীর ১০ হাজার সৈন্য ছাড়াও আবাগা খানের নির্দেশে আরো ২০ হাজার হাজার সৈন্য তাদেরই আশ্রিত রাজ্য সালজুক রুম থেকে সংগ্রহ করেন। এরমধ্যে ১০ হাজার ছিল সেখানে অবস্থানরত দখলদার মোঙ্গল সেনা, বাকি ১০ হাজার সালজুক রুমের মুসলিম সৈন্য। ফলে সামাগারের নেতৃত্বে সম্মিলিত বাহিনীর সংখ্যা দাঁড়ালো ৩০ হাজার। তারা উত্তর শাম সীমান্ত দিয়ে ঝড়ের বেগে মামলুক সালতানাতে প্রবেশ করলো। মোঙ্গলরা প্রথমেই উত্তর শামের বৃহত্তম শহর হালব (Aleppo) আক্রমণ করে বসলো। তখন হালব রক্ষার দায়িত্বে ছিল গুটিকয়েক তুর্কি সেনা। তারা সাহসিকতার সাথে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে যুদ্ধ করলো। ফল যা হবার তাই হলো। হাতেগোনা ক্ষুদ্র তুর্কি বাহিনী বিশাল ও দুর্ধর্ষ মোঙ্গল বাহিনীর হাতে সহসাই বিধ্বস্ত হলো। কিন্তু হালব রক্ষার জন্য বাইবার্সের কিছু অগ্রগামী মামলুক সৈন্য শহরে পৌঁছে গেলে সামাগার হালব দখলের আর কোনো চেষ্টাই করলেন না; বরং হালবকে এড়িয়ে মোঙ্গল বাহিনী আরো সামনে এগিয়ে চললো। সামাগারের দুর্ধর্ষ মোঙ্গল বাহিনী একে একে মাআরাত আন নুমান ও আফামিয়া শহরে হামলা চালিয়ে অবাধ লুটতরাজ ও মনমতো জুলুম-বর্বরতা চালিয়ে গেলো।

সুলতান বাইবার্স মোঙ্গলদের বর্বরোচিত এই অভিযানের সংবাদ পান এর এক সপ্তাহ পর, নভেম্বর মাসে। তিনি তখন সেন্টের ক্রুসেডরাজ্য কান্দ্রি অব ত্রিপোলির রাজধানী খোদ ত্রিপোলি অবরোধে ব্যস্ত। এ সংবাদ শোনামাত্রই তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ত্রিপোলির অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন এবং তৎক্ষণাৎ তার রিজার্ভ বাহিনীকে ডেকে পাঠান। যাদেরকে রাখা হয়েছিল দুর্ভেদ্য দুর্গ মন্টফোর্ট-এ।

মন্টফোর্ট। আধুনিক ইসরাইলে অবস্থিত দুর্ভেদ্য এ দুর্গটি একসময় ক্রুসেডরাজ্য কান্ট্রি অব জেরুসালেমের অর্ন্তগত ছিল। দুর্গটির স্থপতি ছিল ফরাসি ক্রুসেডাররা। কিন্তু ১২৬৬ সালে বাইবার্সের অধিকারে আসার আগ পর্যন্ত এটি ছিল টিউটনিক জাতীয় জার্মান নাইটদের নিয়ন্ত্রণে। লোকমুখে প্রসিদ্ধ ছিল- এই মন্টফোর্ট হচ্ছে পুরো ক্রুসেড রাজ্যেরই সবচে' শক্তিশালী ও সুদৃঢ় ঘাঁটি। ফরাসি শব্দ Mont অর্থ পর্বত আর Fort অর্থ শক্তিশালী, যার মিলিত অর্থ দাঁড়ায় 'শক্তিশালী পর্বত'। নামের মতো আসলেই দুর্গটি ছিল শক্তিশালী একটা পর্বত। পরবর্তীতে জার্মান টিউটনিকদের হাতে এলে তারা এর নামকরণ করে স্টার্কেনবার্গ। জার্মান শব্দ Starken অর্থ শক্তিশালী আর Berg অর্থ পর্বত। অর্থাৎ নাম বদলালেও জার্মান ভাষাতেও অর্থটা একই থাকে। ১২৬৬ সালের দিকে সুলতান বাইবার্স সুদৃঢ় এই দুর্গটি অধিকার করে নিলে তিনি তার সেনাবাহিনীর প্রকৌশলীদের নির্দেশ দেন দুর্গটিকে যেন আরও দুর্ভেদ্য ও নিশ্চিদ্র করে গড়ে তোলা হয়। এবারের ত্রিপোলি অবরোধের সময় বাইবার্স তার সেনাবাহিনীর একাংশকে রিজার্ভ বাহিনী হিসেবে এই দুর্গেই রেখেছিলেন। এখন সামাগারের অভিযানের সংবাদে বাইবার্স সেই বাহিনীকেই ডেকে পাঠান।

যেহেতু সবাই খুব জোর দিয়ে বলছে এবার মোঙ্গলরা ৫০ হাজার সৈন্য নিয়ে এসেছে! স্বয়ং সামাগারও এই ধাপ্লা দিয়ে জনমনে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। তাই সামাগারের মুখোমুখি হবার আগে নিজ শক্তি বাড়াতে বাইবার্সকে মন্টফোর্টের এই বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করতেই হলো। এই ফাঁকে তিনি সাবধানে ত্রিপোলির অবরোধ প্রত্যাহার করে রসদ সংগ্রহের জন্য দামেশকে চলে আসেন। তবে কিছুসংখ্যক সৈন্যকে তিনি ঠিকই ত্রিপোলি রেখে যান, যাতে ত্রিপোলির ক্রুসেড বাহিনী বাইবার্সের পিছু ধাওয়া করতে না পারে। বাইবার্সের পরিকল্পনা ছিল, মন্টফোর্টের বাহিনী এসে ত্রিপোলির অপেক্ষমাণ বাহিনীর সাথে মিলিত হতে হতে বাইবার্স দামেশক থেকে প্রয়োজনীয় রসদ যোগাড় করেই ত্রিপোলি চলে আসবেন। অতঃপর সকল সৈন্য নিয়ে সেখান থেকেই সৌজা উত্তর শামের আফামিয়া অভিযানে অগ্রসর হবেন, যেখানে তাওব চানাহে সামাগারের মোঙ্গল বাহিনী। এভাবে খুব দ্রুততার সাথে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে করতেই অনেকটা সময় বিলম্ব হয়ে গেলো!

১২ নভেম্বর ১২৭১ সাল। সুলতান বাইবার্স তার সর্বশক্তি নিয়ে সামাগারের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। এদিকে সামাগারও নিশ্চিন্তে বসে ছিলেন না। গুপ্তচরের মাধ্যমে তিনি প্রতিনিয়ত বাইবার্সের গতিবিধির উপর নজর রাখছিলেন। মামলুক বাহিনীর মন্টফোর্ট ত্যাগের সংবাদ শোনামাত্রই সামাগার ফিরতি যাত্রা শুরু করলেন। মোঙ্গল শব্দটি এসেছে 'মোঙ্গ' থেকে, যার অর্থই হচ্ছে সাহসী। কিন্তু

সামাগার ও দুঃসাহসী মোঙ্গলরা এবার সেই সাহসটাই হারিয়ে ফেললো। মোঙ্গলরা তীব্রগতির কারণে বিশ্বখ্যাত ছিল, এবার পালানোর ক্ষেত্রে সেই রেকর্ডও তারা ভেঙে দিল। মোঙ্গলদের পালানোর গতি এতোই তীব্র ছিল যে, বাইবার্স যখন আফামিয়া পৌঁছলেন মোঙ্গলরা তখন ফোরাত নদী অতিক্রম করে ইলখানাত সীমান্তে ঢুকে গিয়েছে। সমকালীন বিশ্বে বাইবার্সভীতি কতোটা প্রবল ছিল এটাই তার প্রকৃষ্ট স্মারক।

মোঙ্গলদের সীমাহীন লুটপাট ও নির্লজ্জ পলায়নে বাইবার্স অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তাই আফামিয়া এসে সামাগারকে না পেয়ে তিনি পলায়নপর বর্বর মোঙ্গলদের নাগাল পেতে দ্রুত ছুটলেন। মামলুক বাহিনী ঝড়ের গতিতে মহানদী ফোরাত অতিক্রম করে খাবুর নদী পর্যন্ত চলে এলো। তবু ধরা গেল না মোঙ্গলদের।<sup>৯</sup> বাইবার্সকে পরাস্ত করে আবাগা খান হালাকু খানের উপরে উঠতে চেয়েছিলেন। অথচ তারই প্রেরিত বাহিনী বাইবার্স ভয়ে বাতিক্রান্ত হয়ে দিগ্বিদিক ভুলে পালালো! হালাকু খানের আমলে আর যাই হোক কোনো মোঙ্গল বাহিনীই বিনা যুদ্ধে পালিয়ে যায়নি। অথচ আবাগা খানের আমলে এমনটাই ঘটলো। সবচে' বড় কথা হলো এরা যেনতেন সৈন্য ছিল না; এরা ছিল রাজকীয় মোঙ্গল বাহিনীর বাছাইকৃত সৈন্য! মোঙ্গলদের মান-সম্মান এতোদিন যেটুকুই অবশিষ্ট ছিল এবার তা-ও গেলো।

মোঙ্গলদের পিছু ধাওয়া করে বাইবার্স চলে এসেছেন তার রাজ্যের শেষ সীমা খাবুর নদী পর্যন্ত। এদিকে সুলতানের দূতও খবর নিয়ে চললো তার পিছু পিছু। বাইবার্স থামার পরই কেবল দূত তার নাগাল পেলো। সংবাদ দিলো, সুলতান অভিযানে বের হওয়ামাত্রই ইউরোপীয় ক্রুসেডাররা লেভান্টে আছড়ে পড়েছে। প্রথমেই তারা প্রায় পরিত্যক্ত মন্টফোর্ট দুর্গ আক্রমণ করেছে!

নবম ক্রুসেডের রণনীতিটাই এভাবে করা হয়েছিল, যাতে সাপও মরে না লাঠিও না ভাঙে। মোঙ্গল-ক্রুসেডারদের উদ্দেশ্য ছিল, কোনোভাবেই বাইবার্সের মুখোমুখি হওয়া যাবে না। কারণ তাদের সবার মনেই বাইবার্সভীতি সমান সুপ্ত ছিল। তাদের ধারণা ছিল বাইবার্স অপরাজেয় এক শক্তি, তাই তারা বাইবার্সের রাজ্যের দুদিকে হামলা চালায়, যাতে বাইবার্স তাঁর শত্রুদের পেছনেই ছুটে মরেন, নাগাল না পান। আর এই সুযোগেই ক্রুসেডাররা বাইবার্সের অনুপস্থিতিতে একের পর এক দুর্গ ও শহর অধিকার করে একসময় জেরুসালেম দখল করে নেবে!

৯. তারিখুল মালিক আজ জাহির।

বাইবার্স যখন মোঙ্গলদের ধাওয়া করছেন, তখন ইংল্যান্ডের রাজপুত্র প্রিন্স এডওয়ার্ড তার ১ হাজার রাজকীয় সৈন্য, জেরুসালেম ও ত্রিপোলি রাজ্যের ১০ হাজার টেম্পলার ও হসপিটালার নাইটসহ মোট ১১ হাজার সৈন্য নিয়ে মন্টফোর্ট দুর্গে আক্রমণ করে বসেন। মামলুক সেনাদের প্রকৌশলী দল দুর্গটিকে আরও দুর্ভেদ্য করে তুললেও তখন দুর্গটি ছিল প্রায় জনশূন্য। কারণ সামাগারের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য এই দুর্গের পুরো বাহিনীকেই বাইবার্স নিজের সাথে নিয়ে গিয়েছেন। ফলে এডওয়ার্ডের হাতে প্রায় বিনা যুদ্ধেই ১২৭১ সালে দুর্ভেদ্য মন্টফোর্টের পতন ঘটে! বাইবার্সের অবস্থান তখন মন্টফোর্ট থেকে সাড়ে ছয়শো কিলোমিটার দূরত্বের খাবুর নদী তীরে!

মন্টফোর্টের পতনে খ্রিস্টানরা উৎসাহী হয়ে উঠলো। তারা এবার সাগ্রহে নাজারেথ অভিমুখে অগ্রসর হলো। সেনাশূন্য নাজারেথও খ্রিস্টানরা বিনা যুদ্ধেই দখল করে নিল। নাজারেথ পতনের পর শহরে প্রবেশ করে তারা অবাক হয়ে দেখলো শহরে কোনো সৈন্য নেই। এখানে কেবল আছে বিপুলসংখ্যক তুর্কি যাযাবরের দল, পশু পালনই যাদের পেশা! আসলে এই তুর্কি যাযাবরেরা সেনাবাহিনীর কেউ না। এরা মোঙ্গলদের ধাওয়া খেয়ে মামলুক সালতানাতে আশ্রয় নিয়েছিল। সুলতান বাইবার্স এদের জীবন ধারণের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, জমি, অর্থ, অস্ত্র ও ঘোড়াসহ বসবাসের জন্য নাজারেথ ছেড়ে দিয়েছিলেন। এদের হাতেই শহরের নিরাপত্তার জিম্মাও দেয়া হয়েছিল। ১২৬৩ সালে সুলতান বাইবার্স যখন নাজারেথ অধিকার করেছিলেন তখন ঈসা আ.'র শহরে গির্জার আধিক্যে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি সমস্ত গির্জা ধ্বংসের আদেশ দিয়েছিলেন। এরই প্রতিশোধ নিতে এডওয়ার্ড এবার নাজারেথ লুণ্ঠনের আদেশ দিলেন। নির্বিচার লুণ্ঠনের মাধ্যমে খ্রিস্টানরা কেবল তুর্কি যাযাবরদের কাছ থেকেই ৫ হাজার পশু পেলো!

নাজারেথ দখলের পর ক্রুসেডারদের সাহস বহুগুণ বেড়ে যায়। তার উপর ইংল্যান্ড থেকে ১০ হাজার নতুন সৈন্যসহ এডওয়ার্ডের ছোটভাই এডমুন্ড ক্রোউচব্যাক, সাইপ্রাস থেকে ৫ হাজার সৈন্যসহ রাজা ৩য় ইঙ্গ এসে ক্রুসেড বাহিনীর সাথে যোগ দেন। ফলে প্রিন্স এডওয়ার্ডের অধীনে এখন মোট ক্রুসেড সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়ালো ২৬ হাজার। এডমুন্ড ছিলেন একান্তই ক্রুশভক্ত এক রাজপুত্র। তাই তার পোশাকের পীঠের উপর সর্বদা ক্রুশ চিহ্নিত থাকতো। এজন্যে তার নামই হয়ে যায় এডমুন্ড ক্রোউচব্যাক অর্থাৎ Cross back। পর্যাপ্ত পরিমাণ সৈন্য এসে পড়ায় এডওয়ার্ডও তাই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেন। তিনি ২৬ হাজার সৈন্যের বিশাল এই ক্রুসেড বাহিনী নিয়ে এবার নাজারেথের আরো দক্ষিণে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে সামনে পড়ে যায় কাকুন দুর্গ। তাই সেটিই অবরোধ করে বসেন।

কাকুন ছিল শক্তিশালী বুর্জবিশিষ্ট সুরক্ষিত দুর্গ। এতে ৩০ ফুট উঁচু একটি শক্ত বুর্জ ছিল। কিন্তু এই শহরেও কোন নিয়মিত মামলুক সৈন্য ছিল না। এরও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ছিল তুর্কি যাযাবরদের উপর। ফলে যা হবার তাই হলো। ক্রুসেডারদের প্রবল হানার মুখে সামান্য প্রতিরোধের পরই ধ্বংসে পড়ে দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। অনুমিতভাবে এখানেও তুর্কি যাযাবররা ক্রুসেডারদের রক্ততে ব্যর্থ হয়। ১২৭১ সালে মন্টফোর্ট, নাজারেথের পর কাকুনেরও পতন ঘটে ক্রুসেডারদের হাতে। সে যুদ্ধে একজন মামলুক আমির ও একজন মামলুক সৈন্য নিহত হয়। কিন্তু শহরে প্রবেশের পর এডওয়ার্ডের আদেশে একই দিনে ১ হাজার ৫০০ তুর্কি যাযাবরকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয়। কাকুনের এই গণহত্যার ঠিক পরেই ক্রুসেডারদের মাঝে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। কারণ লেভান্টজুড়ে তখন শোর উঠেছে বাইবার্স এসে গেছেন, বাইবার্স!

এদিকে দূত মারফত ক্রুসেডার কর্তৃক লেভান্ট আগ্রাসনের খবর পেয়েই বাইবার্স জ্বলে ওঠেন। খাবুর নদীর তীর থেকেই মিশরে অবস্থানরত বিশ্বস্ত সেনাপতি কালাউনকে সত্বর নৌপথে মিশর থেকে সাইপ্রাস আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। কারণ ভূমধ্যসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র এই সাইপ্রাসই হচ্ছে সব নষ্টের আখড়া। এরা যেমন সৈন্যে সরাসরি ক্রুসেডে অংশ নেয়, তেমনি সাগরের বুকে ইউরোপীয় বাহিনীকে পথনির্দেশসহ ঘাঁটি গাড়ার সুযোগও দেয়। তাই এদের ধ্বংসের ফরমান পাঠিয়েই স্বয়ং তিনিও দ্রুত লেভান্টমুখী যাত্রা শুরু করলেন। বাইবার্স আসছেন! লেভান্টে, নবম ক্রুসেডের চ্যালেঞ্জ লড়তে!

১২৭১ সাল। নবম ক্রুসেডের ডামাডোলে কাঁপছে পুরো লেভান্ট অঞ্চল। বাইবার্সের বিরুদ্ধে একই পতাকাতলে জড়ো হয়েছে ছয়টি বিধর্মী শক্তি। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, মোঙ্গল ইলখানাত, সাইপ্রাস, কান্ট্রি অব জেরুসালেম ও ত্রিপোলি রাজ্য। এদের মধ্যে সাইপ্রাস ছিল অন্যতম। ইংল্যান্ড এই সাইপ্রাস হয়েই লেভান্টে এসেছিল এবং তাদের নৌবহর সাইপ্রাসেই নোঙর করা ছিল। বাইবার্স তাই প্রথমেই সাইপ্রাসকে সাইজ করতে চাইলেন। সেমতে কালাউনের কাছে যথাযথ নির্দেশও পৌঁছে গেলো। সাইপ্রাস দ্বীপরাষ্ট্র হওয়ার নৌপথে আক্রমণের জন্য কালাউন তড়িঘড়ি করে ১৭টি রণতরীও নির্মাণ করে ফেললেন। মামলুক সেনাদের আলাদা কোনো নৌবাহিনী ছিলো না; ছিলো কোনো নৌসেনাও। তাই সম্পূর্ণ আন্দাজের ভিত্তিতেই দ্রুততার সাথে ১৭টি রণতরী নির্মাণ করে সাঁতার জানে ও সাগর ভয় করে না এমন কিছু সৈন্যকে জাহাজ ভর্তি করে সাইপ্রাস আক্রমণের জন্য পাঠানো হলো। তখনকার সময়ে একেকটি রণতরীতে মাল্লাসহ সর্বোচ্চ ১০০ জন সেনার স্থান সংকুলান হতো। সেমতে সর্বোচ্চ হিসাব ধরলেও মামলুকদের এই নৌবহরে সর্বোচ্চ ১ হাজার ৭০০ সৈনিক অংশ নিতে

পেরেছিল। অথচ সাইপ্রাসের একার রণতরীর সংখ্যাই ছিল এরচে' অনেক বেশি। তার উপরে যোগ হয়েছিল অন্য তিন খ্রিস্টান রাজ্য আক্কা, ত্রিপোলি ও ইংল্যান্ডের নৌবহর। নৌশক্তির ক্ষেত্রে সেকালে ইংল্যান্ড ছিল একাই একশো। ইংল্যান্ড বহুকাল থেকেই নৌশক্তির প্রতি ছিল চূড়ান্ত যত্নশীল।

মামলুক বাহিনীর ১৭টি রণতরীর এই ক্ষুদ্রে নৌবহরের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল লিমাসলের কোলোসি দুর্গ অধিকার করা। সে লক্ষ্যে ১২৭১ সালের শেষ দিকে তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর ইসকান্দারিয়া (আলেকজান্দ্রিয়া) থেকে মামলুক নৌবহর তাদের অভিযাত্রা শুরু করলো। কিন্তু বিধিবাম! কোলোসি দুর্গ তো দূরের বাতিঘর, খাড়ির প্রবেশমুখেই সম্মিলিত খ্রিস্টান নৌবহর আনকোরা মামলুক নৌবহরের গতিরোধ করে দাঁড়ালো। ফলে লিমাসলের সেই খাড়িতেই মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মাঝে এক প্রচণ্ড নৌযুদ্ধ শুরু হলো। এই যুদ্ধে মামলুকরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। ১৭টি রণতরীই ধ্বংস হয়ে যায়। কিছুসংখ্যক নৌসেনা রণতরীতে রক্ষিত নৌকার সাহায্যে কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে মিশরে ফিরে আসে। বাকিদের সেখানেই সলিল সমাধি ঘটে।

মুসলিম বাহিনীর এ পরাজয়ে ক্রুসেড শিবিরে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। ইংরেজরা গর্বের সাথে ক্রুসেডে তাদের বীরত্বের ইতিহাস বর্ণনা করতে থাকে। অন্য খ্রিস্টানরা তাদের উৎসাহ দিতে থাকে। সত্যও বটে। ক্রুসেডের দীর্ঘ ইতিহাসে খ্রিস্টানদের মাঝে সবচেয়ে সফল রাজ্য বলা যায় ইংল্যান্ড। কেননা এই ইংল্যান্ডেরই বিখ্যাত সম্রাট রিচার্ড তৃতীয় ক্রুসেডে গ্রেট সালাদিন খ্যাত ক্রুসেডের অমর যোদ্ধা সালাহউদ্দিন আইয়ুবিকে পরাস্ত করে আক্কা অধিকার করে নিয়েছিলেন। এমনকি আরসুফ ও জাফার মোড় পরিবর্তনকারী যুদ্ধে আইয়ুবিকে দু'দবার পরাজিত করে এক জেরুসালেম বাদে প্রায় সমগ্র লেভান্ট মুসলিম অধিকার থেকে কেড়েও নিয়েছিলেন। এবার তাই এডওয়ার্ডের হস্তে অপরাজেয় মামলুক বাহিনী নৌযুদ্ধে পরাজিত হলে ইউরোপ থেকে আগত খ্রিস্টান কথক ও কবিরা ক্রুসেডে ইংল্যান্ডের বীরত্ব ও অর্জন নিয়ে নতুন করে গান শুরু করলো। উল্লসিত ক্রুসেডেররাও বলে বেড়াতে লাগলো: “রিচার্ড যেমন সালাহউদ্দিনকে পরাজিত করে লেভান্টের উপকূল মুসলিমদের হস্ত থেকে মুক্ত করেছিলেন, তেমনি এবারে এডওয়ার্ডও লেভান্টকে বাইবলের দখল থেকে ফের মুক্ত করবেন”। অবশ্য ক্রুসেডারদের মাত্রাছাড়ার এ উল্লাস ও গগণচুম্বী আশাবাদের সঙ্গত কারণও ছিল। ভাবি ইংরেজ সম্রাট প্রিন্স এডওয়ার্ডের নেতৃত্বে খ্রিস্টানরা পবিত্র নাজারেথ শহর, দুর্ভেদ্য মন্টফোর্ট ও কাকুন দুর্গ যে ইতোমধ্যেই দখল করে নিয়েছে!

খ্রিস্টানরা যখন সাইপ্রাসের সফলতা নিয়ে এসব করে বেড়াচ্ছিল ঠিক তখনই লেভান্টজুড়ে শোর উঠলো “বাইবার্স আসছেন”। খ্রিস্টানরাও নিশ্চিত ছিল বাইবার্স অবশ্যই আসবেন। ছেড়ে কথা বলার মানুষ তিনি নন। ক্রুসেডারদের ধারণা ছিল তিনি হয়তো সদ্য হাতছাড়া হওয়া কোনো এলাকাতেই প্রথমে হামলা চালাবেন। এক্ষেত্রে তাদের অনুমিত ভূখণ্ড ছিল কাকুন দুর্গ। আসলে ক্রুসেডাররা বাইবার্সকে এখনো ভালো করে চিনতেই পারেনি! মন্টফোর্ট-কাকুন নয়; তিনি এসেই সবাইকে তাক লাগিয়ে একেবারে ক্রুসেডারদের কলিজায় হাত দেন। বাইবার্স মন্টফোর্ট ও নাজারেথকে পাশ কাটিয়ে সরাসরি কান্দ্রি অব জেরুসালেমের রাজধানী আক্কায় এসে সসৈন্যে উপস্থিত হন। নিজের হৃত ভূখণ্ড কুরবানি দিয়ে খোদ ক্রুসেডারদের রাজধানীতে বাইবার্সের এ ভীতিকর উপস্থিতি রীতিমত অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার। বাইবার্সের চরম এ পদক্ষেপে খ্রিস্টানদের মাঝে ভয়ঙ্কর ত্রাস ছড়িয়ে পড়লো। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এডওয়ার্ড তাই সকল ক্রুসেড নেতাদেরই জরুরি তলব করলেন রুদ্ধদ্বার বৈঠকে।

সুলতান বাইবার্স ৪০ হাজার সৈন্যসহ খাবুর নদীর তীর থেকে লেভান্ট অভিযুগে যাত্রা শুরু করলেও আক্কায় মাত্র ২০ হাজার সেনা নিয়ে পৌঁছান। কারণ তুর্কিদের উপর আস্থা রেখে একবার তিনি যে ভুল করেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি আর করতে চাইলেন না। তিনি আসার পথে গুরুত্বপূর্ণ সকল শহর ও দুর্গে ১ হাজার করে নিয়মিত মামলুক সৈন্য মোতায়েন করে আসেন। এদিকে আক্কা রক্ষায় তখন ৩২ হাজার সম্মিলিত ক্রুসেড সৈন্য এডওয়ার্ডের পতাকাতলে জড়ো হলো! বাইবার্সের চেয়ে দেড়গুণ বেশি সৈন্য থাকা সত্ত্বেও ক্রুসেডাররা বাইবার্স দর্শনেই ভড়কে গেলো। তার মুখোমুখি হবার সাহস কারো হলো না। নিমিষেই তাদের সব বাগাড়ম্বর বাতাসে মিলিয়ে গেলো। নবম ক্রুসেডে প্রকৃত অর্থে তাই কোনো যুদ্ধই হলো না। ভীত-সন্ত্রস্ত এডওয়ার্ড বাইবার্সের কাছে সন্ধি ভিক্ষা চাইলেন। বাইবার্স এবার খুবই কঠোর অবস্থান নিলেন। নবম ক্রুসেডের ঘোষণা থেকে নিয়ে মোঙ্গল-খ্রিস্টানদের কীর্তিকলাপে বাইবার্স এমনিতেই ছিলেন মারাত্মক ক্রুদ্ধ। তাই সাফ জানিয়ে দিলেন, তিনি যুদ্ধ করতে এসেছেন। সন্ধি যদি করতেই হয় তবে তা হবে একমাত্র বাইবার্সেরই আরোপিত শর্তে। এমন অপমানজনক জবাবও ভীত ক্রুসেডাররা নির্দিষ্ট সময় ইজম করে নিল। তবু তারা যুদ্ধ নয়; সন্ধি চায়!

বাইবার্স এবার শর্তারোপ করলেন:

১. মন্টফোর্ট, নাজারেথ ও কাকুনসহ আমার প্রত্যেকটি দখলকৃত শহর নিঃশর্তে ফেরত দিতে হবে।



২. আমার যেসব লোকদের হত্যা করা হয়েছে, তাদের পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৩. জেরুসালেমের খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীদের উপর পুনরায় বিধি-নিষেধ আরোপ করা হবে, যা ১২৬০ সালে সিংহাসনারোহণের পর আমি করেছিলাম।

ক্রুসেডাররা প্রথম শর্তটি সাথে সাথে মেনে নেয়; কিন্তু পরের দুটি শর্ত মানতে অপারগতা জানায়। তারা জানায়, এই মুহূর্তে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মতো আর্থিক সামর্থ্য তাদের নেই। আর তৃতীয় শর্তের ব্যাপারে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানায়।

ক্রুসেডারদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সুলতান বাইবার্স শর্তগুলোতে পুনরায় কিছুটা পরিবর্তন নিয়ে আসেন:

১. মন্টফোর্ট, নাজারেথ ও কাকুনসহ আমার প্রত্যেকটি দখলকৃত শহর নিঃশর্ত ফেরত দিতে হবে।

২. আমার লোকদের হত্যা করার ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিংডম অব জেরুসালেম ও ত্রিপোলিকে নিহত প্রজাদের পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্য মাসিক ৩০ দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) করে বার্ষিক ৩৬০ দিরহাম মাথাপিছু কর দিতে হবে।

৩. খ্রিস্টানরা জেরুসালেমে তীর্থ করতে পারবে, তবে তা হবে কর প্রদানের বিনিময়ে। সেজন্যে খ্রিস্টানদের আরো কিছু বিধি-নিষেধ মানতে হবে:

ক. তীর্থে এসে তারা কোথাও তাদের ধর্ম প্রচার করতে পারবে না।

খ. মামলুক সালতানাতের কোথাও বে-নামীতেও কোনো সহায়-সম্পত্তি কিনতে পারবে না।

গ. মামলুক সালতানাতের কোনো বিধর্মী প্রজাদের সাথেও কোনো প্রকারের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না।

ঘ. তীর্থের জন্য যতোদিন প্রয়োজন তার চেয়ে দুদিনের বেশি তারা মামলুক সালতানাতে অবস্থান করতে পারবে না। অতিরিক্ত দুদিনের একদিন আসার পর, আরেকদিন যাবার আগের দিন বিশ্রামের জন্য।

বাইবার্সের এসব কঠিন কঠিন শর্তাবলী শুনে এডওয়ার্ডের পিঁলে চমকে উঠলো; কিন্তু করার ছিল না কিছুই। তাই শুধুমাত্র দ্বিতীয় শর্তটি আরও একটু নমনীয় করার অনুরোধ করলে বাইবার্স যে জবাব দেন আজও তা উম্মাহর জন্য অনুকরণীয় এক আদর্শ হয়ে আছে।

এডওয়ার্ডের জবাবে বাইবার্স শুধু বললেন: প্রত্যেক বছর কর নিয়ে আপনাদের লোক এলে তাদের দেখেই আমার মনে পড়বে, আমি আমার প্রজাহত্যার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করছি। তখন আমি শান্ত থাকবো। কিন্তু প্রতি বছর আপনাদের

প্রতিনিধিরা কর নিয়ে আগমন না করলে আমার মনে তখন প্রতিশোধের চিন্তা জেগে ওঠবে। এটা কি আপনাদের জন্য ভালো হবে”?

বাইবার্সের ভয়ঙ্কর সুন্দর এ জবাবে ক্রুসেডারদের প্রতিনিধিদল চুপসে গেলো। শেষ পর্যন্ত চরম অবমাননাকর এই প্রস্তাবেই তারা সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচলো। সন্ধিচুক্তিটি ১২৭২ সালের মে মাসে কায়সারিয়াতে সাক্ষরিত হয়। যার মেয়াদ ধরা হয় দশ বছর দশ মাস দশ দিন।



মে ১২৭২ সাল। কায়সারিয়ার সন্ধির পর ক্রুসেড নেতৃবৃন্দরা একে একে লেভান্ট ত্যাগ করতে লাগলেন। সাধারণ ক্রুসেডাররাও ভগ্ন মনে নিজ নিজ দেশে ফিরে চললো। এতো হাঁক-ডাকের পরেও এভাবে বিনা যুদ্ধে ফিরে যাওয়া ছিল রীতিমত কাপুরুষোচিত একটা ব্যাপার। খ্রিস্টানদের অন্তরাত্মায় বাইবার্স কেমন ভীতি ছড়িয়েছিলেন, বাইবার্স দর্শনে ক্রুসেডারদের বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণই এর বড় উদাহরণ। এই নবম ক্রুসেডই কার্যত শেষ ক্রুসেড ছিল। এরপর থেকে ইউরোপীয় ক্রুসেডাররা আর কখনোই জেরুসালেম পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেনি। লেভান্ট উদ্ধারের দোহাই দিয়ে কার্যকর কোনো ক্রুসেডও তাই আর ঘোষিত হয়নি। বাইবার্সের লাগাতার ক্ষিপ্ততর সমরাভিযান এবং সীমাহীন কঠোরতায় তখনকার ক্রুসেডারদের নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল। তাদের সব যুদ্ধ-উন্মাদনা কর্পুরের মতোই উবে গিয়েছিল। বাইবার্স ক্রুসেডমানসে কেমন ত্রাস ও হতাশা ছড়িয়েছিলেন, তারই একটা চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় জনৈক হতাশাগ্রস্ত টেম্পলার নাইটের সংক্ষিপ্ত জবানবিত্তে: “ক্রোধ এবং দুঃখ আমার অন্তরে স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে। যা আমাকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে অবিশ্বাস্যভাবে। দেখে মনে হচ্ছে, শ্রষ্টার ইচ্ছাই বোধহয় মুসলিমদের সমর্থন করা আর আমাদের ক্ষতি করা। হায় ঈশ্বর হায়! পূর্বদিকে (লেভান্টে) পরাজয়ের যে ধারা গুরু হয়েছে, আমরা আর কোনোদিনই তার অবসানে সমর্থ হবো না। আহ! মা মেরির পবিত্র মঠকে তারা মসজিদে রূপান্তর করেছে, তার পুত্রের (যিশু) সুখ হরণ করা হয়েছে। যারা এজন্য কাঁদে ও আক্ষেপ করে তাদের এটা মেনে নিতে বাধ্য করা হচ্ছে যে, আমরা ভালোই আছি! আজও যারা ভাবে তারা মুসলিমদের সাথে লড়বে, তারা পাগল! যিশুর জন্য হলেও যিশু আর আমাদের সাহায্য করবেন না! পরিশেষে তারাই বিজয়ী, আমরা বিজিত। তারা তো অজয়! প্রতিনিয়ত তারা

আমাদেরকে নীচ থেকে আরো নীচে নামিয়ে দিচ্ছে! যারা জাগ্রত তারা জানে, ঈশ্বর এখন ঘুমোচ্ছেন আর মুহাম্মাদের প্রদীপ আরও ক্ষমতাশালী হয়ে জ্বলছে”।

কায়সারিয়ার সন্ধির পর অন্য ক্রুসেড নেতারা লেভান্ট ছেড়ে চলে যেতে শুরু করলেও প্রিন্স এডওয়ার্ড তখনো আক্রায় অবস্থান করছেন। আর তখনি ঘটে গেলো অপ্রীতিকর একটা ঘটনা: ইসমাইলি গুপ্তঘাতকদের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় বহু ইসমাইলিই তখন ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ফলে যোগ্যতার ভিত্তিতে তাদের অনেককেই মামলুক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তখনকার রামাল্লাহর আমির ছিলেন বাইবার্সের চেয়েও কঠোর ক্রুসেড মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি। তাই তিনি নবম ক্রুসেডের নায়ক এডওয়ার্ডকে হত্যার জন্য ইসলামে দীক্ষিত গুপ্তঘাতকদের মধ্য থেকেই একজনকে প্রেরণ করলেন। রামাল্লাহর আমির কর্তৃক প্রেরিত সেই গুপ্তঘাতক ১২৭২ সালের মে মাসে এডওয়ার্ডকে ঘুমন্তাবস্থায় বিষাক্ত ছুরি দ্বারা হত্যা করতে গেলে এডওয়ার্ড জেগে যান। পরিণামে সেই গুপ্তঘাতকই এডওয়ার্ডের হাতে নিহত হয়। এরপর এডওয়ার্ড আর লেভান্টে থাকাকেই নিরাপদ মনে করলেন না। সেমতে ১২৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি লেভান্ট ত্যাগ করলেন। এডওয়ার্ড এবার আক্রা থেকে সিসিলি পৌঁছলেন। অতঃপর ১২৭৩ সালে ইংল্যান্ডের উদ্দেশে ফিরতি যাত্রা আরম্ভ করেন। পথে পথে যাত্রাবিরতি দিয়ে অবশেষে গাসকোনি ও প্যারি হয়ে ১২৭৪ সালে ইংল্যান্ডে পৌঁছেই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ক্রুসেড। রক্তঝরা একটা উপাখ্যান। বীরত্ব-কাপুরুষতার অল্পমধুর এক চলন্ত ফ্লাটফর্ম। এটি একদিকে যেমন অসংখ্য পৈশাচিক নির্মমতার সাক্ষী, অপরদিকে অজস্র মহানুভবতারও উজ্জল স্মারক। ক্রুসেডের কল্যাণে বর্বর ইউরোপ যদি একঝাঁক বুনো ষাঁড় জন্ম দিয়ে থাকে, তবে মুসলিম উম্মাহ ইতিহাসকে উপহার দিয়েছে অবিস্মরণীয় ক’জন বীরশ্রেষ্ঠকে। সংক্ষিপ্ত সে তালিকাটির চারজনের নামই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য:

১. ইমাদউদ্দিন জঙ্গি-তিনি হচ্ছেন সেই মহান ব্যক্তি, যিনি সর্বপ্রথম সর্বগ্রাসী ক্রুসেডের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ডাক দিয়েছিলেন প্রতিরোধ যুদ্ধের। যখন বড় বড় মুসলিম সুলতানরাও ছিলেন নিষ্ঠুর, তখন এই নীলচোখা তুর্কি একজন জেনারেল হয়েও এগিয়ে এসেছিলেন দীক্ষিত উম্মাহর অশ্রু মুছে দিতে। মূলত তার পদাঙ্ক ধরেই পরবর্তী প্রজন্ম উন্মত্ত ক্রুসেডের মাড়ি পর্যন্ত ভেঙ্গে দিয়েছিল। তাই ক্রুসেডের দীর্ঘ বীরত্বের ইতিহাসে বলা যায় তিনিই পথিকৃৎ। শুধু ডাক দিয়েই তিনি ক্ষ্যান্ত দিলেন না, ক্রুসেডারদের সফল মোকাবেলার জন্য গড়ে তুললেন বিশাল জঙ্গি সালতানাত। ক্রুসেডে তার অন্যতম কীর্তি হচ্ছে,

খ্রিস্টানদের দখলকৃত চারটি ক্রুসেডরাজ্যের একটিকে তিনি উদ্ধার করেন। সেটি হলো, আর রোহা (এডেসা)।

২. নুরউদ্দিন মাহমুদ জঙ্গি-তিনি হচ্ছেন সেই পূণ্যাত্মা, যিনি রাসুল সা.কে বারবার স্বপ্নে দেখেছিলেন এবং ইয়াহুদি ষড়যন্ত্র থেকে রাসুলের সা. রওজা মোবারক হেফাজত করেছিলেন। তিনি গোটা শাম, জাযিরা, হিজায ও মিশরকে একই সূত্রে গেঁথে দিয়েছিলেন। তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে এতো বেশি লড়াই করেন যে, তা কেবল বাইবার্সের সাথেই তুলনীয়।

৩. সালাহউদ্দিন ইউসুফ আইয়ুবি-তিনি সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যিনি প্রথমবারের মতো ক্রুসেডারদের খপ্পর থেকে দীর্ঘ ৮৮ বছর পর পবিত্র নগরী বাইতুল মাকদিস পুনরুদ্ধার করেছিলেন। ঐতিহাসিক হাতিন প্রান্তরে তার হাতেই সম্মিলিত ক্রুসেড বাহিনী বিধ্বস্ত হয়েছিল। ফলে ইউরোপীয়দের চোখে তিনি হয়ে উঠেছিলেন “গ্রেট সালাদিন”।

৪. রুকনুদ্দিন বাইবার্স-তিনি ক্রুসেডেরই নয় শুধু; ইতিহাসেরই অন্যতম সেরা বীর। বাইবার্স সেই মহাবীর, যার যুদ্ধাভিষেকই হয়েছে ক্রুসেডযুদ্ধ বিজয়ের মধ্যদিয়ে। যিনি ৩৩ বছরের বর্ণাঢ্য যুদ্ধজীবনে কোনো একটিতেও হারেননি। তিনি শুধু ক্রুসেডারদেরই নয়; একইসাথে অপর দুই বিশ্বত্রাস মোঙ্গল-ফেদাইনদের কোমরও ভেঙ্গে দেন। দুর্দম চিতাগতি ও দুর্ধর্ষ থাবার কারণে ইউরোপীয়দের চোখে তিনি বরাবরই ছিলেন চিতারাজ-দ্য প্যাঙ্কার!

বিশ্ব ইতিহাসের ক্ষণজন্মা মহাবীর বাইবার্সকে মানুষ যতোটাই চিনে, তা মূলত আইন জালুতের অবিস্মরণীয় যুদ্ধজয় ও সর্বাগ্রাসী মোঙ্গল সয়লাব প্রতিরোধের কারণেই। অথচ রক্তস্নাত ক্রুসেডেও বাইবার্সের যেসব কৃতিত্ব ও রেকর্ড স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে, ক্রুসেডের দুশ বছরের ইতিহাসে এর ধারে-কাছেও কেউ যেতে পারেননি। একনজরে দেখে নেয়া যাক বাইবার্সের ক্রুসেডকীর্তি:

১. বাইবার্স হচ্ছেন সেই সেনাপতি, মাত্র একুশ বছর বয়সে ১১৪৪ সালে যার নেতৃত্বেই মূলত দ্বিতীয়বার বাইতুল মাকদিস পুনরুদ্ধার হয়।

২. ১২৫০ সালে সপ্তম ক্রুসেডের রক্তক্ষয়ী মানসুরাই যুদ্ধে ক্রুসেডারদের পরাজিত করে ফরাসি সম্রাট নবম লুইকে তিনিই বন্দি করেন। ক্রুসেডের দীর্ঘ ইতিহাসে কোনো ইউরোপীয় সম্রাটের বন্দি হবার এটাই একমাত্র ঘটনা।

৩. বাইবার্স সেই মহানায়ক, যিনি লেভান্টের তিনটি ক্রুসেডরাজ্যের মধ্যে জেরুসালেমের অধিকাংশ, ত্রিপোলি রাজ্যের অংশবিশেষ এবং গোটা এন্টিয়ক রাজ্যই অধিকার করেছিলেন।

৪. বাইবার্স একমাএ ব্যক্তি, যিনি সর্বাধিক চারটি ক্রুসেড (ষষ্ঠ-নবম) লড়েছেন। এবং প্রত্যেকটির ফল তার পক্ষেই ছিল।

৫. বাইবার্সের কষাঘাতেই ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের ক্রুসেড ঘোষণা করে লেভান্টে আগমন বন্ধ হয়ে যায়। বলা যায়, বাইবার্সের আমলেই কার্যত ক্রুসেডের পরিসমাপ্তি ঘটে যায়।

৬. বাইবার্স হচ্ছেন ক্রুসেডের একমাত্র অপরাজেয় যোদ্ধা, যিনি ক্রুসেডের কোনো যুদ্ধেই হারেননি।

৭. এককভাবে তাকে কেন্দ্র করে দু-দুটি ক্রুসেড (অষ্টম-নবম) ঘোষিত হয়। এবং দুটিতেই তিনি চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করেন।

৮. বাইবার্স হচ্ছেন ক্রুসেডের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ক্রুসেডার নিধনকারী মুসলিম সেনানায়ক। এক্ষেত্রে তার ধারে-কাছেও কেউ নেই। এ কারণেই বাইবার্স ছিলেন ক্রুসেডমানসের মূর্তিমান আতঙ্ক। খ্রিস্টীয় ইতিহাসে তিনি আজও তাই ‘শেষ আঘাত’ অভিধায় আখ্যায়িত হয়ে আছেন।



১২৭২ সাল। সুলতান বাইবার্স সবেমাত্র নবম ক্রুসেড সামলে নিয়েছেন। টানা যুদ্ধের পর কোথায় সামান্য বিশ্রাম নিবেন তা নয়; উল্টো নতুন যুদ্ধের হুক কষতে শুরু করলেন! এবারে তার লক্ষ্য প্রতিশোধমূলক যুদ্ধ। ঠিক করলেন, বেছে বেছে সেসব শক্তিশালী বিধর্মী রাজ্যগুলোকে একহাত দেখে নেবেন, যারা ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময় বাইবার্সের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল। বাইবার্সের এই একটা অভ্যাস ছিল চমকপ্রদ, তিনি তার দীর্ঘ সামরিক জীবনে কোথাও স্থির হয়ে দু’দণ্ডও বসেননি। এর অর্থ এটা নয় যে, তিনি যখন-তখন যত্রতত্র হামলে পড়েছেন। অথবা শ্রেষ্ঠ রাজ্য বিস্তারের জন্য পার্শ্ববর্তী কোনো দেশ আত্মসন চালিয়েছেন; বরং তার জীবনের সবগুলো যুদ্ধই মিল্লাতের সুদূরপ্রসারী সুরক্ষার চিন্তা থেকে পরিচালিত।

বাইবার্স প্রথমেই স্থির করলেন নুবিয়ার শক্তিশালী মুসলিম রাজ্যে আক্রমণ চালাবেন। দক্ষিণ মিশরের নুবিয়া তখন ছিল খ্রিস্টান রাজ্য। নবম ক্রুসেডে বাইবার্সের সাথে মোঙ্গল-ক্রুসেডারদের যুদ্ধের সময় নুবিয়ার খ্রিস্টান রাজা ডেভিড মিশরের দক্ষিণাঞ্চলের আইদুস শহরে আক্রমণ চালান। মিশরীয় মামলুক সৈন্যরা তখন ডেভিডের আত্মসন রুখে দিতে সক্ষম হয়। ডেভিডের এই আচরণে বাইবার্স তখন ক্রোধে জ্বলে উঠেছিলেন। এবার তাই প্রথম সুযোগেই শক্তিশালী এই খ্রিস্টান রাজ্যটিকে তিনি ধ্বংস করে দেবার দৃঢ়সংকল্প করলেন।

সেই রোমান শাসনামল থেকেই নুবিয়া খ্রিস্টান শাসিত রাজ্য। মাঝে কেবল তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান রা.'র সময়ে নুবিয়াসহ গোটা 'সুদ' অঞ্চলে মুসলিম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উসমান রা. থেকে উমাইয়া শাসন পর্যন্ত এই অঞ্চলটি মুসলিম অধিকারেই থাকে। এরপর এটি স্বাধীন হয়ে যায়। মিশরের আইয়ুবীয় শাসনামলে এই নুবিয়ায়ই গোলযোগ শুরু করেছিল। পরিণামে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবির ভাই আল আদিল নুবিয়ার উত্তরাংশ দখল করে একে দক্ষিণ মিশরের সাথে शामिल করে নিয়েছিলেন।

নুবিয়ান নিখোরা ছিল খ্রিস্টান। এরা ছিল সাংঘাতিক রকমের তীরন্দাজ। এদের অব্যর্থ তীরন্দাজী সম্পর্কে অবিশ্বাস্য সব কাহিনী প্রচলিত আছে। বালাদুরির 'ফতহুল বুলদানে' এদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে- যুদ্ধের সময় প্রতিপক্ষের উপর তীর নিক্ষেপের আগেই এরা একে অপরকে বলতো- “আমি ঐ ব্যক্তির অমুক স্থানে আঘাত করবো”। দেখা যেত, তারা সত্যি সত্যিই তা-ই করে দেখিয়েছে! ভয়ঙ্কর এই নিখো তীরন্দাজদের দেশ নুবিয়াই বাইবার্সের এবারের শিকার! মুসলিম সীমান্তে হামলার অপরাধে বাইবার্স এই নুবিয়াকেই শায়েস্তা করতে চাচ্ছেন। তার উদ্দেশ্য একটাই, খ্রিস্টীয় মুকুরিয়া রাজ্য ধ্বংস করে নুবিয়াকে মামলুক মিশরের করদরাজ্য বানানো। নুবিয়ার রাজা ডেভিড কল্পনাও করতে পারেননি, মিশর সীমান্তে হামলার ছোটখাটো অপরাধে স্বয়ং বাইবার্স তার রাজ্যে ছুটে আসবেন! সর্বাঙ্গিক যুদ্ধ শুরু করবেন গোটা নুবিয়া পদানত করতে! আসলে বাইবার্সের চরিত্রটাই ছিল ভিন্নধর্মী। তার কাছে মুসলিম সীমান্তের মূল্যায়ন একটু অন্যরকমই। স্বাভাবিকভাবেই সালতানাতের নাগরিক নিরাপত্তাও ছিল সর্বাধিক অগ্রগণ্য।

অবশেষে সুলতান বাইবার্স তার রণক্লান্ত বাহিনী নিয়ে ১২৭২ সালেই নুবিয়ায় হাজির হলেন। মহানদী নীলের তীর ধরে ক্রমশ দক্ষিণে এগিয়ে চললো তার অদম্য মামলুক সেনাবহর। লক্ষ্য তাদের নুবিয়ার রাজধানী জাঙ্গোলা। কিন্তু বাইবার্স ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলেন না, তিনি অজান্তেই জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছেন দীর্ঘস্থায়ী এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে। দুর্ধর্ষ নিখোদের জন্ত ও নিপুণ তীরন্দাজ নুবিয়ানরা কি আর সহজেই ছেড়ে দেবার পাত্র? হলো না তাই। সুলতান বাইবার্স যতোটা সহজ ভাবলেন, নুবিয়াকে ততো সহজে অধিকার করা গেলো না। বাইবার্স তাই দীর্ঘস্থায়ী নুবিয়ান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন। অবশ্য দুরন্ত মামলুকরাও ছেড়ে কথা বলার মতো সৈন্য ছিল না। ১২৭২ সালে শুরু হয় বিরামহীন সে যুদ্ধ। একনাগাড়ে চললো চার বছর-১২৭৬ সাল পর্যন্ত।

মামলুক হানা শুরু হতেই দুর্ধর্ষ নুবিয়ান যোদ্ধারা তাদের নিপুণ তীরন্দাজদের সহায়তায় রুখে দাঁড়ালো। তারা নুবিয়ার প্রতি ইঞ্চি মাটির জন্য লড়াই করতে

শুরু করলো। তাদের যুদ্ধকৌশল ছিল ভিন্নরকম। তারা সম্মুখযুদ্ধ এড়িয়ে পাহাড়-পর্বত ও জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতো। সেখান থেকেই আচমকা বের হয়ে মামলুক বাহিনীর উপর ঝটিকা হামলা চালাতো। মামলুকরা তাদের তাড়া করামাত্রই তারা আবার গিরি-কন্দরে আত্মগোপন করতো। এভাবেই নুবিয়ার অন্তহীন যুদ্ধ চলতে থাকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। এই ইঁদুর-বিড়াল লড়াইয়ের মাঝেই কেটে গেল বাইবার্সের জীবনের মূল্যবান চার-চারটি বছর।

অন্তহীন এই গেরিলা যুদ্ধের মধ্যেই সুলতান বাইবার্স ১২৭৩ সালে নুবিয়ার রাজধানীর দখল বুঝে নেন। দুর্ভিক্ষ মামলুকদের প্রচণ্ড হামলার মুখে একসময় পতন ঘটে ডাঙ্গুলার। এরপর থেকেই নতুন ধাঁচে আরো ভয়ঙ্করভাবে শুরু হয় নুবিয়ানদের গেরিলা যুদ্ধ। চোরাগোষ্ঠা হামলা তো ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার। এবার তারা রাতের অন্ধকারেও তাদের দক্ষ তীরন্দাজদেরকে মামলুক সেনাশিবিরে হামলার জন্য পাঠাতে লাগলো। তীরন্দাজীতে নুবিয়ানদের দক্ষতার কারণে এসব হামলায় প্রথম প্রথম মুসলিম বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বাইবার্স মামলুকদের সদাসতর্ক থাকার কঠিন আদেশ দিলে অল্পদিনেই ক্ষতির পরিমাণ কমে আসে। নুবিয়ান গেরিলাদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে ১২৭৩ সালের শেষদিকে বাইবার্স নুবিয়ার বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান শুরু করেন। এ পর্যায়ে এসে তিনি নতুন এক পদক্ষেপ নেন, নুবিয়ার প্রতিটি পাহাড়-পর্বত ও বন-জঙ্গলে তিনি চিরুনি অভিযান চালিয়ে গেরিলাদের নির্মূল করতে থাকেন। নুবিয়ার এই চিরুনি অভিযানে মুসলিম বাহিনীর দু'বছরেরও বেশি সময় লেগে যায়! নুবিয়ানদের মূল শক্তি ছিল দূরপাল্লার তীর নিক্ষেপের উপর, এ তীরের লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ। আর মামলুক বাহিনীর আসল শক্তি ছিল সম্মুখসমরে। চোরাগোষ্ঠা হামলার চেয়ে তারা বরং যুদ্ধের ময়দানে শত্রুসেনাদের বধ করতেই বেশি দক্ষ ছিল। কিন্তু নুবিয়ানরা সম্মুখসমরে না লড়ায় মুসলিম বাহিনীর অপরিমেয় এই শক্তি ও সময় ক্ষয় হয়ে চললো!

পুরো নুবিয়াজুড়ে একযোগে সাঁড়াশি আক্রমণ ও নিশ্চিহ্ন চিরুনি অভিযানের ফলে প্রায় তিন বছরের মাথায় এসে নুবিয়ানরা এবার খেই হারিয়ে ফেললো। প্রতিটি স্থানেই তারা পরাজিত হতে লাগলো। মুসলিম বাহিনীর পক্ষ থেকে নুবিয়ান গেরিলাদের প্রতি তখন নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের আহ্বান জানানো হলো। প্রথমদিকে কেউই আত্মসমর্পণে রাজি হলো না। তাই যারাই আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জানালো তাদেরকে হত্যা করা হলো। মামলুকদের নিষ্ঠুরতা দেখে নুবিয়ানরা এবার ভড়কে গেলো। ফলে বাধ্য হয়ে তারা একে একে আত্মসমর্পণ করতে লাগলো। এ ধারা চলতে থাকলো ১২৭৬ সাল পর্যন্ত। অবশেষে টানা চার বছর যুদ্ধের পর নুবিয়ার রাজা সেকান্দা ক্লান্ত হয়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য হন।

উল্লেখ্য, মিশর সীমান্তে হামলাকারী নুবিয়ার রাজা ডেভিড যুদ্ধের গুরুত্ব দিকেই মারা যান। রাজা সেকান্দা সন্ধি ভিক্ষা চাইলে স্থির হয় নুবিয়া এখন থেকে সরাসরি মিশরের অধীনেই শাসিত হবে। নুবিয়ার রাজা কেবল নামসর্বস্ব হবেন। নুবিয়ানরা বার্ষিক নির্দিষ্ট একটা হারে জিজিয়া কর প্রদান করবে। বাইবার্স কর্তৃক নুবিয়া অধিকারের পরই তিনি নুবিয়ার পতাকা আমূল পরিবর্তন করে ফেলেন। এতে তিনি ইসলামের প্রতীক অর্ধচন্দ্র খচিত করে দেন।

১২৭৬ সাল। টানা চার বছর যুদ্ধের পর অজস্র রক্ত ও শক্তিক্ষয়ের মধ্যদিয়ে গোটা নুবিয়া পদানত হলো। নুবিয়া বিজয়ের মাধ্যমেই বাইবার্স তার প্রতিশোধপর্বের সফল শুরু করলেন। বাইবার্স প্রতিবেশী দুর্বল মুসলিম রাজ্যগুলো দখল করে রাজ্যবিস্তারের চেয়ে শক্তিদ্র বিধর্মী রাজ্যগুলোকে শায়েস্তা করতেই বেশি পছন্দ করতেন। এ কারণেই তিনি মূলত তিউনিস ও ইয়ামানের মতো পরিস্থিতির শিকার দুর্বল মুসলিম রাজ্যগুলোকে কখনো আক্রমণ করেননি। প্রতিশোধের পালায় এবার শিকারের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে এলো মোঙ্গল আশ্রিত মুসলিম শাসিত সালজুক রুমের নাম। নামে সালজুক রুম হলেও বাইবার্সের টুকরটা এবার কিন্তু সরাসরি মোঙ্গলদের সাথেই হবে। কারণ সালজুক রুমিরা তখন মনেপ্রাণে মোঙ্গল আধিপত্য মেনে নিয়েছে। বলা যায় সে সময় সালজুক রুম ছিল ইলখানাতেরই অবিচ্ছিন্ন একটা প্রদেশ। আর ইলখানি এই মোঙ্গলদের সাথে ছিল বাইবার্সের আজন্ম শত্রুতা। নবম ক্রুসেডের মূল হোতাই যে ছিল এই মোঙ্গলরা। হালব আক্রমণ, মাআরাত আন নুমান ও আফামিয়ায় লুটতরাজ স্বয়ং মোঙ্গলদের নেতৃত্বেই সংঘটিত হয়েছিল। সুলতান বাইবার্স আইন জালুতের ঐতিহাসিক মহারণের পর অজস্রবার মোঙ্গলদের মুখোমুখি হয়েছেন। এবং প্রতিবারই তিনি বিজয়ী হয়েছেন। অথচ প্রতিটি যুদ্ধই ছিল মোঙ্গলদের চাপিয়ে দেয়া। বাইবার্স এবার খোদ মোঙ্গলদের উপর সর্বাত্মক একটা যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে চাইলেন। সে লক্ষ্যে তিনি সুসৈন্যে মামলুক সালতানাতের এশীয় অংশের রাজধানী দামেশক এসে পৌঁছালেন।

মুসলিম রাজ্য বিধায় সালজুক রুমকে হয়তো বাইবার্স ছেড়ে দিতেন। নবম ক্রুসেডে সন্নিবিষ্ট মোঙ্গল বাহিনীতে ১০ হাজার মুসলিম সৈন্য যোগানোর অপরাধও বোধহয় তাদের অপারগতার কারণে ক্ষমা করে দিতেন। কিন্তু সালজুক রুমের অবস্থা তখন ছিল “চায়ের চৈয়ে কাপ বেশি গরমে”র মতো। মোঙ্গলদের খাছ চামচায় পরিণত হয়ে প্রকৃত অর্থেই তারা হয়ে উঠেছিল মোঙ্গল দাসানুদাস। প্রভুকে খুশি করতে অনেকক্ষেত্রে গোলাম যেমন প্রভু থেকেও উৎসাহী হয়ে ওঠে, ঠিক এমনটাই ঘটেছিল নবম ক্রুসেডের প্রাক্কালে। বাইবার্সের অনুপস্থিতিতে মোঙ্গল বাহিনী উত্তর শামে হামলা চালিয়ে মাআরাত



আন নুমান ও আফামিয়ায় অবাধ লুণ্ঠন চালালে সালজুক সেনারা তাদের শুধু সহযোগিতাই করেনি; এক্ষেত্রে বরং তারা ছিল অন্য সবার চেয়ে অগ্রগামী। এদেরকে উচিত শিক্ষা দিতেই বাইবার্সের আজকের এই রণমূর্তি। এবার সময় এসেছে চরম প্রতিশোধ নেবার! আনাতোলিয়া থেকে মোঙ্গল আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে সালজুক রুমকে মুক্ত করার এটাই তো মোক্ষম সুযোগ। কিন্তু বাইবার্সের অভিযানের সংবাদ গোপন থাকলো না। বাইবার্স সসৈন্যে দামেশক পৌছামাত্রই চারিদিকে রটে গেলো বাইবার্স এবার সরাসরি মোঙ্গল সাম্রাজ্যে হানা দিচ্ছেন! গুপ্তচর মারফত সব জেনে ইলখানাত শাসক আবাকা খান এবং আনাতোলিয়ার মোঙ্গল প্রশাসক বিস্ময়ে থ' হয়ে গেলেন। তারা বিশ্বাসই করেননি বাইবার্স আবার এশিয়াতে আসছেন! আসছেন তাদেরই করদরাজ্য সালজুক রুম উদ্ধার করতে! তারা কল্পনাও করেনি মোঙ্গলরা যেমন প্রতিনিয়ত মুসলিম ভূমি আক্রমণ করে বাইবার্সও তেমনি মোঙ্গল ভূমি আক্রমণ করতে আসছেন! এ যে মারের বদলে মার!



আনাতোলিয়া। আধুনিক তুরস্ক সন্নিহিত বিস্তীর্ণ ভূভাগ। ঐতিহ্যবাহী এ অঞ্চলকে একসময় এশিয়া মাইনর হিসেবেও অভিহিত করা হতো। বহু সভ্যতা, অনেক বিশ্বশক্তির উত্থান-পতনের নীরব সাক্ষী হয়ে আজও বিশ্বমানচিত্রে টিকে আছে কৌশলগত এ ভূখণ্ডটি। ফিনিশীয়, গ্রিক ও পারসিকদের পর এই আনাতোলিয়ায় দীর্ঘস্থায়ী রোমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে রোমান সাম্রাজ্যের পতন হলেও বাইজান্টাইন নামে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যটিকে যায়। মুসলিম নিয়ন্ত্রণে আসার আগ পর্যন্ত পুরো আনাতোলিয়া এই বাইজান্টাইন বা পূর্ব রুম সাম্রাজ্যের অধীনেই শাসিত হয়ে আসছিল। এরই মধ্যে আবিষ্কৃত দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিমজুড়ে একযোগে বয়ে যায় মুসলিম বিজয়যাত্রার প্রচণ্ড গতির সুনামি। চীনের মহাপ্রাচীর থেকে আইবেরিয়া উপদ্বীপ পর্যন্ত বিশাল বিস্তৃত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম কর্তৃত্ব। অর্থাৎ ইসলামি দুনিয়ার দোরগোড়ায় অবস্থিত এই আনাতোলিয়ায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় আরো বহুকাল পর। ভঙ্গুর হলেও রোমান সাম্রাজ্যের সীমানা তখনো ছিল আদিগন্ত বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে। শামের নিকটবর্তী হওয়ায় মুসলিম দুনিয়া তখন রুম সাম্রাজ্য বোঝাতে কেবল এই আনাতোলিয়াকেই রুম হিসেবে অভিহিত করতো। সেই

থেকে মুসলিমদের কাছে আনাতোলিয়াই রুম হিসেবে পরিচিতি পায়। ১০৭১ সালের ভয়াবহ মানযিকার্ট যুদ্ধের পর আনাতোলিয়ায় প্রথম মুসলিম অধিকার স্বীকৃত হয়। মানযিকার্ট প্রান্তরে সালজুক সুলতান আলপ আরসালানের কাছে বাইজান্টাইন সম্রাট চতুর্থ রোমানোস পরাজিত ও বিধ্বস্ত হলে আনাতোলিয়ায় দীর্ঘ বাইজান্টাইন কর্তৃত্ব আলগা হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে এই আনাতোলিয়া বা এশিয়া মাইনরই তুর্কিদের আবাসভূমিতে পরিণত হয়। সুলতান আলপ আরসালান সদ্যবিজিত আনাতোলিয়া শাসন করতে তারই দূর সম্পর্কের চাচাতো ভাই সুলাইমান ইবন কুতলুমিশকে গভর্নর নিযুক্ত করেন।

ব্যক্তিগতভাবে সুলাইমান ছিলেন চরম উচ্চাভিলাষী। পারস্যের মূল সালজুক সালতানাতে অধীনস্থ হলেও তিনি সততই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন। পারস্যের কেন্দ্রীয় সালজুক সালতানাতে বাইরে ইরাক, কুর্দিস্তান, কিরমান ও শামের মতো পুরো আনাতোলিয়া নিয়ে আরো একটি সালজুক রাজ্য প্রতিষ্ঠার চিন্তা তার মাথায় অহর্নিশ ঘুরপাক খেতো। যার নাম হবে ‘সালজুক রুম’। সে লক্ষ্যেই তিনি আনাতোলিয়ার ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল থেকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে দিতে তৎপর হয়ে ওঠেন। এরই মধ্যে ১০৭৫ সালে এসে তিনি গুরুত্বপূর্ণ নাইসিয়া অধিকার করে নেন। এতে করে অধরা স্বপ্ন বাস্তবায়নে সুলাইমান পায়ে তলায় শক্ত ভিত্তি পেয়ে যান। সাথে সাথে তিনি তার রাজধানী কোনিয়া থেকে নাইসিয়াতে স্থানান্তর করেন। অবশেষে এই ১০৭৫ সালেই তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসেন। মূল সালজুক থেকে বেরিয়ে যাওয়া এশিয়া মাইনরভিত্তিক আনাতোলিয়ার স্বাধীন এ রাজ্যটিই ইতিহাসে সালজুক রুম নামে খ্যাত। পারস্যের মূল সালজুক সুলতান মালিক শাহ সুলাইমানের এই ধৃষ্টতায় ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। সুলাইমানকে শাস্তা করতে ১০৭৮ সালে তিনি আমির বারকুককে সৈন্যে সালজুক রুমের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মূল সালজুক বাহিনীর আক্রমণে সালজুক রুমের বাহিনী পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু আনাতোলিয়ায় সালজুক রুমের আধিপত্য পূর্বের ন্যায়ই অক্ষুণ্ণ থাকে। ফলে মালিক শাহ ১০৮২ সালে তার ভাই তুতুশের নেতৃত্বে আরো একটি বাহিনী সুলাইমানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। অবশেষে ১০৮৬ সালে অনুষ্ঠিত হয় ফয়সলামূলক এক যুদ্ধ। সে যুদ্ধে সালজুক রুমের স্থপতি সুলতান সুলাইমান পরাজিত ও নিহত হলে আনাতোলিয়া চলে যায় পারস্যের মূল সালজুকদের অধীনে।

১০৯২ সাল। সুলতান মালিক শাহর মৃত্যুর পর সুলাইমানের পুত্র কিলিজ আরসালান আনাতোলিয়ায় দ্বিতীয়বারের মতো স্থায়ীভাবে সালজুক রুম সালতানাতে প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে সালজুক রুমের সুলতানরা শৌর্য-বীর্যের সাথে এশিয়া মাইনর শাসন করলে স্বয়ং আক্বাসি খলিফা সুলতান

মাসউদকে ‘সুলতান’ হিসেবে ইজাযতনামা দেন এবং সালজুক রুম সালতানাতকে স্বীকৃতি প্রদান করেন। এমনকি মূল সালজুক সুলতান সানজার পর্যন্ত মাসউদের কৃতিত্বে খুশি হয়ে তাকে ‘মালিক’ উপাধিতে ভূষিত করেন। এরপর থেকে সালজুক রুমি সুলতানরা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। সে ধারাবাহিকতায় ১১০০ সালে মালাতিয়া ও আমাসিয়ার যুদ্ধ, ১১৪৭ সালে কোনইয়ার যুদ্ধ, ১১৭৬ সালে মাইবিস্ত-কেফালনের স্মরণীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সবগুলো যুদ্ধেই সালজুক রুমিরা জয়লাভ করে ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি করে। কিন্তু ১২৪৩ সালে এসে সালজুক রুমের সুলতান দ্বিতীয় কাইখুসরো কাযাদাগের ভয়াবহ যুদ্ধে ৮০ হাজার সৈন্য নিয়েও বাইদু নোয়নের ৩০ হাজার সৈন্যের মোঙ্গল বাহিনীর হাতে পরাজিত হলে সালজুক রুমে মোঙ্গল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আনাতোলিয়ায় শুরু হয় মোঙ্গল দাঙ্গা। সেখানে মোঙ্গল অনাচার তখন চরমে ওঠে।

১২৫৭ সালে সুলতান দ্বিতীয় কাইখুসরোর মৃত্যুর পর তার পুত্র চতুর্থ কিলিজ আরসালান সিংহাসনে আরোহণ করলে সালজুক রুমের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়ে। ইলখান শাসক হালাকু খানের চাপে চতুর্থ কিলিজ মোঙ্গল রাজধানীতে গিয়ে বার্ষিক নির্দিষ্ট হারে কর প্রদানের শর্তে মোঙ্গল খানের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য হন। পরবর্তীতে সুলতান দ্বিতীয় কাইখুসরোর পুত্ররা সিংহাসনের জন্য বিবাদ শুরু করলে হালাকু খান সালজুক রুমের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ শুরু করেন। একপর্যায়ে হালাকু খান সালজুক রুমকে কিজিল ইরমাক নদী বরাবর দু’ভাগে বিভক্ত করে দেন। কিজিল ইরমাকের পূর্বাঞ্চল চতুর্থ কিলিজ আরসালানকে এবং পশ্চিমাঞ্চল দ্বিতীয় কাযকাউসকে প্রদান করেন। পূর্বাংশের রাজধানী হয় তোকাত, পশ্চিমাংশের কোনইয়া। একইসাথে দুই সুলতানকে শাসন করার জন্য হালাকু খান ‘পারওয়ানা’ উপাধি দিয়ে একজন মোঙ্গল প্রশাসকও নিযুক্ত করেন। মুইনুদ্দিন সুলাইমান নামক সে পারওয়ানা ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী। তখন থেকে কার্যত এই পারওয়ানার কথাতেই দুই সালজুক সালতানাত পরিচালিত হতে থাকে। উল্লেখ্য, নবম ক্রুসেডের প্রাক্কালে উত্তর শাম সীমান্তে পূর্ব সালজুক রুমের সৈন্যরাই মুসলিমদের উপর সর্বাধিক বর্বরতা চালিয়েছিল।

দ্বিখণ্ডিত সালজুক রুমের নিয়ন্তা মোঙ্গল নিযুক্ত পারওয়ানাই নবম ক্রুসেডে আনাতোলিয়া থেকে ১০ হাজার মোঙ্গল সৈন্য যোগান দেন। দুই সালজুক সুলতানও তখন কম যাননি। তারা বাইবার্সের বিরুদ্ধে ৫ হাজার করে মোট ১০ হাজার সৈন্য দিয়ে মোঙ্গল সেনাপতি সামাগারকে সাহায্য করেন। বিস্ময়ের কথা হলো, এই মুসলিম সেনারাই বাইবার্সের অনুপস্থিতিতে হালব, মাআরাত আন

নুমান, আফামিয়ায় নির্বিচার লুণ্ঠন ও নিষ্ঠুর তাণ্ডব চালিয়েছিল। এদের অমার্জনীয় এ অপরাধের শাস্তি দিতেই নুবিয়া বিজয়ের পর সুলতান বাইবার্স এবার মোঙ্গল শাসিত সালজুক রুমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন। উদ্দেশ্য, মোঙ্গল অষ্টোপাশ থেকে সালজুক রুমকে মুক্ত করা।

১২৭৭ সাল। সুলতান বাইবার্স তার দুর্দমনীয় মামলুক বাহিনী নিয়ে আনাতোলিয়া অভিমুখে অগ্রসর হন। বাইবার্সের এ অভিযান বাহ্যত মুসলিম ভূখণ্ডের বিরুদ্ধে মনে হলেও কার্যত এটা ছিল আপাদমস্তক একটা মোঙ্গল বিরোধী যুদ্ধ। সেজন্য সুলতান বাইবার্স সরাসরি ইলখানাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা দিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হন। এমনকি মামলুক-সালজুক সীমান্তে সুলতান বাইবার্সের পক্ষে ঘোষণাও দেয়া হয়- “সুলতান বাইবার্সের এই অভিযান মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে, তাই কোনো মুসলিম যেন মামলুকদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার না ধরে। মুসলিমরা মামলুকদের বিপক্ষে না গেলে তাদের ক্ষমা করা হবে”।

সে যুদ্ধযাত্রায় সুলতান বাইবার্সের সাথে ছিল ১০ হাজার মামলুক অশ্বারোহী ও ১ হাজার বাছাইকৃত কুমান অশ্বারোহীসহ মোট ১১ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য। পদাতিক মামলুক সৈন্য ছিল ১৫ হাজার। সব মিলিয়ে মোট নিয়মিত সৈন্য দাঁড়ালো ২৬ হাজার। এর বাইরে অনিয়মিত সৈন্য ছিল আরো ৫ হাজার বেদুইন যোদ্ধা। এবার নিয়মিত-অনিয়মিত মিলিয়ে বাইবার্সের মোট সেনাসংখ্যা ৩১ হাজারে গিয়ে ঠেকলো।

রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা দিয়ে সুলতান বাইবার্সের আনাতোলিয়া অভিযাত্রী এ অভিযানের সংবাদ ইলখানাত শাসক আবাগা খানের কাছে যথাসময়েই এসে পৌঁছলো। সালজুক রুমে নিজেদের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখতে আবাগা খান তৎক্ষণাৎ ৭ হাজার রাজকীয় ইলখানি অশ্বারোহী সৈন্য পাঠিয়ে দেন। তখনকার শিয়া পারওয়ানা মুহাদাবউদ্দিন আলি আদ দায়লামি সালজুক রুমে নিয়োজিত মোঙ্গল সেনাদের মধ্য থেকে বাছাই করে ১১ হাজার সৈন্য প্রস্তুত করেন। ইলখানাতের অপর করদরাজ্য জর্জিয়া ৩ হাজার বর্মাবৃত নাইট যোদ্ধা তোকাতে-এ প্রেরণ করে। সেই সাথে সালজুক রুমের দুই অংশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ২০ হাজার মুসলিম সৈন্যও তোকাতে-এ এসে সমবেত হয়। ফলে ১৮ হাজার দুর্ধর্ষ মোঙ্গল সৈন্যসহ সম্মিলিত বাহিনীর মোট সেনাসংখ্যা দাঁড়ায় ৪১ হাজার। ভাবা যায়! এক বাইবার্সকে ঠেকাতে সূর্যপূজার মোঙ্গলদের সাথে একই পতাকাতলে সমবেত হলো শিয়া, জর্জীয় খ্রিস্টান, এমনকি নামধারী সালজুক মুসলিমরাও!! সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন আবাগা খান কর্তৃক প্রেরিত পারস্যের বর্ষিয়ান মোঙ্গল সেনাপতি মেঙ্গু তিমুর। জর্জিয়ান নাইটদের নেতৃত্বে থাকেন প্রিন্স তুয়াদান। চূড়ান্ত যুদ্ধের আগেই সালজুক রুম সুলতান তৃতীয় কাইখুসরু আবাগা

খান কর্তৃক প্রেরিত ৭ হাজার রাজকীয় মোঙ্গল অশ্বারোহী সৈন্যকে বিশেষ মুহূর্তের জন্য লুকিয়ে রাখেন। ফলে মোঙ্গলদের বাহ্যিক সৈন্যসংখ্যা এবার ৩৪ হাজারে দাঁড়ালো।

সুলতান বাইবার্স এই অভিযানের মতো এতো ঢাক-ঢোল পিটিয়ে আর কোনো অভিযানেই নামেননি। এভাবে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে, শত্রুদের জানিয়ে ইতিপূর্বে তিনি আর কোনো যুদ্ধও পরিচালনা করেননি। কিন্তু এবারে এমন করার কারণ হলো, এবারের যুদ্ধক্ষেত্র আনাতোলিয়ার সালজুক রুম হচ্ছে মূলত মুসলিম রাজ্য। যাতে মুসলিমরা তার গতিরোধ করে না দাঁড়ায় এবং তার তলোয়ার মুসলিম রক্তে রঞ্জিত না হয়, সে জন্যেই তিনি পূর্ব ঘোষণা দিয়ে আনাতোলিয়ায় পদার্পণ করেন। কিন্তু কুদরতের ফয়সালা ছিল ভিন্ন। তাই জানান দিয়েও কোন লাভ হয়নি। ফলে আলবিস্তানের মহাসমরে মোঙ্গলদের সাথে গান্ধার মুসলিমরাও সমান কচুকাটা হলো। তাছাড়া নবম ক্রুসেডে অতিউৎসাহী মোঙ্গলদের নেতৃত্ব প্রদান, সামাগার কর্তৃক তার তিনটি শহর লুণ্ঠন এবং ধাওয়া করেও সামাগারের মোঙ্গল ফৌজকে ধরতে না পারায় বাইবার্স ছিলেন চরম ক্ষিপ্ত। এসব কার্যকারণের ভিত্তিতেই বাইবার্স এবার ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধে নামেন।

অবশেষে সুলতান বাইবার্স তার ৩১ হাজার সৈন্য নিয়ে আধুনিক তুরস্কের কাহরামানমারাস প্রদেশের বর্তমান এলবিস্তানে মেঙ্গু তিমুরের নেতৃত্বাধীন ৪১ হাজার সৈন্যের মুখোমুখি হন। বর্তমানে স্থানটির নাম এলবিস্তান হলেও এর প্রকৃত ও তখনকার নাম ছিল আলবিস্তান। টানটান উত্তেজনায় আলবিস্তান প্রান্তরে বাইবার্স ও মেঙ্গু তিমুর যখন মুখোমুখি অবস্থানে উৎকণ্ঠিত পারওয়ানা তখন তোকাত-এ, শঙ্কিত আবাগা খান মারাগায় বসে সর্বশেষ খবরের অপেক্ষায় ছটফট করছিলেন-কী হচ্ছে আলবিস্তানে?

১৫ এপ্রিল ১২৭৭ সাল। আলবিস্তান। আনাতোলিয়ার ~~হৃদপিণ্ড~~ অবস্থিত ঐতিহাসিক প্রান্তরে মুখোমুখি অবস্থানে দুর্ধর্ষ দুটি সেনাদল ~~একদিকে~~ চিতারাজ বাইবার্সের নেতৃত্বে ৩১ হাজার মামলুক সৈন্যের অপরাধে মুসলিম বাহিনী। অপরদিকে ৪১ হাজার সম্মিলিত সৈন্যের দুরন্ত মোঙ্গল ফৌজ। টানটান উত্তেজনা সর্বত্র। উভয়পক্ষই শেষ মুহূর্তের রণপ্রস্তুতিতে ব্যস্ত। অনবরত বাজছে কানফাটা নাকারা। হঠাৎ করেই বেজে উঠলো চমকিত যুদ্ধের দামামা। মধ্যযুগীয় যুদ্ধরীতিতে যুদ্ধের শুরুতেই প্রচণ্ডগতির অশ্বারোহী আক্রমণ (Cavalry charge) ছিল ফল নির্ধারক একটা ব্যাপার। মোক্ষম আঘাত হানতে পারলে এক আঘাতেই কেব্লা ফতেহ! এতেই শত্রুর পরাজয় ছিল নির্ঘাত। মোঙ্গল সেনাপতি মেঙ্গু তিমুরের পরিকল্পনা ছিল, প্রথম আঘাতেই মামলুক অশ্বারোহী

বাহিনীকে পাশ থেকে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে শেষ করে দেয়া। অতঃপর পুরো বাহিনী নিয়ে বাকি মামলুকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। সর্বশেষে ময়দানে আসবে রিজার্ভ সেই ৭ হাজার রাজকীয় মোঙ্গল অশ্বারোহী সেনা, যাদেরকে বিশেষ মুহূর্তের জন্যই লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এরা এসেই আক্রমণের পর আক্রমণে বিপর্যস্ত মুসলিম বাহিনীকে কচুকাটা করে ময়দান সাফ করে ফেলবে।

এ পর্যন্ত মোঙ্গলদের মুখোমুখি হওয়া প্রায় প্রতিটি যুদ্ধেই মামলুকরা আগে হামলা চালিয়ে এসেছে। কিন্তু এবার এর ব্যতিক্রম ঘটলো। চতুর মেঙ্গু তিমুর পরিকল্পনা মতো যুদ্ধের সূচনাতেই ১১ হাজার আনাতোলীয় মোঙ্গল অশ্বারোহীকে মামলুকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার হুকুম দিলেন। মোঙ্গল অশ্বারোহী বাহিনীর তীব্র আক্রমণের মোকাবেলায় ১০ হাজার মামলুক অশ্বারোহীও বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। শুরু হলো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এবার একটু আগেভাগেই মোঙ্গলদের তরুণের তাস ৭ হাজার বাছাইকৃত ভারী রাজকীয় মোঙ্গল অশ্বারোহী রণক্ষেত্রে দৃশ্যমান হলো। তারা এসেই যুদ্ধে ব্যস্ত মামলুক অশ্বারোহীদের উপর পার্শ্ব দিয়ে টুটে পড়লো। মামলুক অশ্বারোহীরা যখন ১৮ হাজার ভারী মোঙ্গল অশ্বারোহী বাহিনীর যুগপৎ আক্রমণ রুখে দিচ্ছিল ঠিক তখনই মেঙ্গু তিমুর তার অবশিষ্ট বাহিনী নিয়ে মামলুক বাহিনীর বাকি অংশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বাইবার্সের মামলুক বাহিনীও তুমুল প্রতিরোধ গড়ে তুললো। ফলে পুরো ময়দানজুড়ে এবার শুরু হলো সর্বাঙ্গীক যুদ্ধ।

আলবিস্তানের মহাসমরে লড়াই চলছে ভীষণ। কেউ কাউকে ছাড় দিচ্ছে না ইঞ্চি পরিমাণ। সর্বাঙ্গীক মোঙ্গল হামলার জবাব মামলুক বাহিনী তখন পর্যন্ত দ্বিধাবিভক্ত হয়েই দিচ্ছিল। ১৮ হাজার মোঙ্গল অশ্বারোহীর বিরুদ্ধে ১০ হাজার মামলুক অশ্বারোহী, জর্জিয় ও সালজুক রুমের ২৩ হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে মামলুক ও বেদুইনদের ২০ হাজার সৈন্য জীবনবাজি রেখে লড়াই করছিল। ভয়াবহ যুদ্ধের একপর্যায়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন প্রিন্স তুয়াদান ধরে ফেললেন, মামলুক বাহিনীর বাম অংশটিই তুলনামূলক দুর্বল। কারণ এদিকেই আছে ৫ হাজার অনিয়মিত বেদুইন সৈন্য। তুয়াদানের ইশারায় ৭ হাজার রাজকীয় ভারী মোঙ্গল অশ্বারোহী সৈন্য এবার সেদিকেই ঝাঁপিয়ে পড়লো। অনিয়মিত বেদুইন সেনাদের উপর রাজকীয় ভারী অশ্বারোহীদের আক্রমণে যা হবার এখানেও তাই হলো। অশ্বারোহী মোঙ্গল সেনাদের প্রবল আক্রমণে বেদুইন সৈন্যরা ভড়কে গেলো। তারা অঘোরে মারা পড়তে লাগলো। একাতরে পিষ্ট হয়ে চললো সারির পর সারি। মুহূর্তেই ছত্রখান হয়ে গেল বাইবার্সের বাম বাহু। দেখতে দেখতে বাম বাহুর অভাবনীয় এ বিপর্যয়ের প্রভাব পুরো বাহিনীতেই ছড়িয়ে পড়লো। এভাবেই গোটা মুসলিম বাহিনীর পা-ও একসময় টলে উঠলো। অপরাজেয়

মামলুক বাহিনীতে পরাজয়ের চিহ্নও তাই পরিষ্কার ফুটে উঠলো। অবস্থা এমনই নাজুক হয়ে দাঁড়ালো যে, সুলতান বাইবার্‌সের ব্যক্তিগত পতাকাবাহী (সানজাকিয়াহ) পর্যন্ত শহিদ হয়ে গেলেন! ময়দানের অবস্থা যখন এমনই টলটলায়মান, তখন সুলতান বাইবার্‌স চিতাবেগে গর্জে উঠলেন আরেকবার। নামের সার্থকতার প্রমাণ দিতে এবার স্বয়ং নেমে এলেন আলবিস্তানের মহারণে। বাইবার্‌স তার বাছাইকৃত রিজার্ভ ১ হাজার কুমান অশ্বারোহী বিশেষ সৈন্যকে তলব করলেন। মাত্র ১ হাজার সৈন্য নিয়েই তিনি হিংস্র চিতার ন্যায় হামলে পড়লেন উন্মত্ত মোঙ্গল বাহিনীর উপর। বাইবার্‌সের এ বিজলি আক্রমণ ফের ধাঁধিয়ে দিল শত্রুর চোখ। থমকে দাঁড়ালো ইতিহাসের ঘূর্ণয়মান চাকা। চলতে শুরু করলো উল্টোপথে।

মামলুক বাহিনীর পরাজয় যখন ছিল সময়ের ব্যাপার, ঠিক তখনই বাইবার্‌স তার নিজস্ব ১ হাজার কুমান অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে মামলুক বাহিনীর পেছন দিক দিয়ে সবার অলক্ষ্যে ময়দান থেকে বেরিয়ে গেলেন। অনেকটা পথ ঘুরে তিনি আবার হঠাৎ করেই উদয় হলেন যুদ্ধক্ষেত্রের ডান বরাবর। এ যেন ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি! ৩৩ বছর আগে ১২৪৪ সালে তখন এমনই একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। মান-এ জড়ো হওয়া কয়েক হাজার ক্রুসেড সৈন্যের পেছন দিক দিয়ে তরুণ বাইবার্‌স তখন মাত্র ১ হাজার সৈন্য নিয়েই দুর্দান্ত আক্রমণ শানিয়েছিলেন। তার অবিস্মরণীয় সে হামলাও ছিল ঘুরপথে। দুর্গম নেগেভ মরুর বুক চিড়ে। বাইবার্‌সের আকস্মিক সেই হামলাতেই ক্রুসেডারদের মেরুদণ্ড তখন ভেঙ্গে গিয়েছিল। জেরুসালেমও দ্বিতীয়বারের মতো সহজেই উদ্ধার হয়েছিল। দুঃসাহসী সে যুদ্ধের মাধ্যমেই দুনিয়াবাসীকে বাইবার্‌স তার আগমনী বার্তা শুনিয়েছিলেন। জীবন সায়াহে এসেও চিরতরুণ বাইবার্‌স রয়ে গেছেন আজও সেই একই ক্ষিপ্রগতির! সুলতান বাইবার্‌স ঘুরপথে আলবিস্তান রণাঙ্গনের ডান দিকে এসেই ক্রমেই হিংস্র হয়ে ওঠা মোঙ্গল বাহিনীর ডান বাহুর উপর তীব্র আক্রমণ চালালেন। কে জানতো! অভিষেক যুদ্ধের ধাঁচে পরিচালিত এবারের এই বিধ্বংসী হামলাই তার জীবনের শেষ ঝলক হিসেবে চিরতাস্বর হয়ে থাকবে যুগ-যুগান্তরে। কাল থেকে কালান্তরে। মোঙ্গলদের ডান দিকে তখন ছিল ১১ হাজার মোঙ্গল অশ্বারোহী সৈন্য। বাইবার্‌সের আক্রমণ এতোই বজ্রগতির ছিল যে, হিংস্র মোঙ্গলরা সহসাই খড়কুটোর মতো উড়ে যেতে লাগলো। স্বয়ং বাইবার্‌সের নেতৃত্বাধীন ক্ষুদ্র এ বাহিনীর প্রবল চাপ সহ্যে পারলো না মোঙ্গল বাহিনীর দুর্ধর্ষ ডান অংশ। জায়গায়-জায়গায় কর্তিত মুণ্ড আর লাশের স্তূপ জমে উঠলো। ফলে পেডুলামের মতো ঝুলতে থাকা যুদ্ধের ভাগ্য এবার মামলুকদের দিকেই একটু-একটু করে ঝুঁকতে শুরু করলো।

সুলতান বাইবার্দের পতাকাবাহী শহিদ হওয়ার পর উল্লসিত মেঙ্গু তিমুর বাইবার্দের ময়দানে দেখতে না পেয়ে এবং মুসলিম বাহিনীর চরম দূরাবস্থা দেখে মামলুকদের বিধ্বস্ত বাম বাহুর দিকে এসে চিৎকার করে ঠাট্টাচ্ছিলে বারবার বলতে থাকেন, “আজ কোথায় তোমাদের সুলতান”? জবাবে মামলুক সেনাপতি আমির সুংকুর আল আসকার তখন যুদ্ধক্ষেত্রের ডান দিকে দেখিয়ে বললেন “ঐদিকে”। মেঙ্গু তিমুর সবিস্ময়ে ডানে তাকিয়ে দেখেন, মোঙ্গলদের ডান বাহুর উপর দিয়ে তখন বয়ে চলছে প্রলয়ঙ্করী বাইবার্দের ঝড়। এ যেন বিধ্বংসী মরুঝড়। দলা পাকানো লাশ আর মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশাল বিশাল স্তুপ দাঁড়িয়ে আছে যত্রতত্র! সেই ঝড় এবারে খোদ মেঙ্গু তিমুরের দিকেই ধেয়ে আসছে! বাইবার্দের রক্তরূপ দেখেই মেঙ্গু তিমুরের পিলে চমকে উঠলো! নিরাপদ আশ্রয়ের খুঁজে তিনি তাই দ্রুত প্রস্থান করলেন। বাইবার্দের মোড় পরিবর্তনকারী অবিশ্বাস্য এ আক্রমণে মামলুক বাহিনীতে দ্বিগুণ সাহসের সঞ্চার হয়। তাদের টলে যাওয়া পা-ও ফের জমে যায়। অনুপ্রাণিত মামলুকরা এবার সত্যিকার অর্থেই হিংস্র হয়ে ওঠে। তারা মোঙ্গলদের নিশ্চিহ্ন করতে থাকে মহাসমারোহে। আচমকা রণাঙ্গনের কায়াটাই আমূল পাল্টে যায়। বাইবার্দের তোপে মোঙ্গলরা সহসাই রণেভঙ্গ দেয়। অবশেষে উন্মত্ত মামলুকদের হাতে বিশাল মোঙ্গল বাহিনী পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। বাইবার্দের নেতৃত্বে পরিচালিত তীব্র আক্রমণ এতোই নিষ্ঠুর ছিল যে, ডান অংশের ১১ হাজার মোঙ্গল অস্থারোহী সৈন্যের একজনও আলবিস্তান থেকে জীবন্ত ফেরত যেতে পারেনি! অবশ্য মুসলিম বাহিনীর বাম অংশে থাকা ৫ হাজার বেদুইনের মাঝে ৩ হাজার রণাঙ্গনেই শহিদ হয়ে যায়। বাকি ২ হাজার গুরুতর আহতাবস্থায় জীবিত থাকে। সামগ্রিকভাবে সম্মিলিত মোঙ্গল বাহিনীর ১৯ হাজার সেনা নিহত হয়। এর মধ্যে রাজকীয় বাহিনীর ২ হাজার সহ মোট ১৩ হাজার মোঙ্গল সৈন্য, সালজুক রুমের ৪ হাজার এবং ২ হাজার জর্জীয় নাইট সেনা ছিল। গুরুতর আহত ও ধৃত হয় ১২ হাজার সৈন্য। কিয়ামতের সেই বিভীষিকা থেকে কোনোক্রমে জান নিয়ে পাল্লাতে পারে মাত্র ১০ হাজার বহুজাতিক সেনা। পলায়নপর সেনাদের অধিকাংশই ছিল রাজকীয় মোঙ্গল বাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্য। সালজুক মুসলিম বাহিনীর অধিকাংশ সেনাই মামলুক বাহিনীর হাতে ধৃত হয়।

আলবিস্তানের মহারণে সম্মিলিত বাহিনীর অভিযান ছিল সালজুক ও মোঙ্গল বাহিনী একইসাথে দুদিক দিয়ে সাঁজাঘি অভিযান চালিয়ে মামলুকদের চিড়েচ্যাপ্টা করে দেবে। কিন্তু বাইবার্দের অকল্পনীয় পাল্টা আক্রমণে কার্যত তা হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া সালজুকরা যে প্রাণপণ যুদ্ধ করেনি, এটা বেশ ভালোই বোঝা গিয়েছিল। কারণ আলবিস্তানের এই যুদ্ধে মোঙ্গলদের তুলনায়



সালজুকদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল যথেষ্ট কম। ২০ হাজার সালজুক সেনার মধ্যে মাত্রই ৪ হাজার নিহত হয়। পক্ষান্তরে মোঙ্গলদের ক্ষেত্রে সে সংখ্যাটা ছিল ১৮ হাজার-এ ১৩ হাজার। আলবিস্তান যুদ্ধের জীবিত প্রায় সকল সালজুক সৈন্যই মামলুকদের হাতে বন্দি হয়। এদের অধিকাংশই আবার মামলুক বাহিনীতে যোগ দেয়। এমনকি বন্দি মোঙ্গলদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে মামলুক সেনাদলে নাম লেখায়। এমনই দুজনের নাম ‘কিপচাক’ ও ‘সালার’। যারা পরবর্তীতে সুলতান কালাউনের আমলে দুর্ধর্ষ মামলুক সেনাপতি হিসেবে বিশ্বখ্যাত হয়ে ওঠেন। আলবিস্তানের যুদ্ধে বাইবার্সের বাম বাহু ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় তিনি ছিলেন মারাত্মক ক্রুদ্ধ, ব্যথিত। বাইবার্স অভাবনীয় এ ক্ষতি পূরণের জন্য হামাহর আমিরকে দ্রুত নতুন সৈন্য প্রেরণের নির্দেশ দেন। নির্দেশ পেয়েই হামাহর আমির আইবাক আশ শাইখির নেতৃত্বে তাজাদম ৫ হাজার অশ্বারোহী সেনা পাঠিয়ে দেন। বাইবার্স তার বাম বাহু ধ্বংসের হোতা পালিয়ে যাওয়া অবশিষ্ট সেই রাজকীয় মোঙ্গল সেনাদের কাছ থেকে এবার চরম প্রতিশোধ নেবার মনস্থির করলেন।



২০ এপ্রিল ১২৭৭ সাল। সুলতান বাইবার্স এবার আলবিস্তানের উত্তরে অবস্থিত কায়সারিয়া নগরীর উপর সরোষে টুটে পড়লেন। কারণ আলবিস্তানে তার বাম বাহু ধ্বংসের হোতা পালিয়ে যাওয়া প্রায় ৫ হাজার সৈন্যের সেই রাজকীয় মোঙ্গল সেনাদল তখন সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এরা ছাড়াও সেখানে তখন আনাতোলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জড়ো হওয়া সর্বমোট ২০ হাজার মোঙ্গল সৈন্য অবস্থান করছিল। বেদুইন বাহিনী হারানোর শোকে ক্রুদ্ধ বাইবার্স এবার তাই সরাসরি কায়সারিয়ার উপর চড়াও হলেন। ফলে কায়সারিয়া প্রান্তরে শুরু হলো আরো একটি মামলুক-মোঙ্গল মহাযুদ্ধ। আলবিস্তানের পর এখানেও মোঙ্গলরা প্রাণপণ যুদ্ধ করে দুর্ধর্ষ মামলুকদের হাতে সোচনীয়ভাবে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হলো। খোদ মোঙ্গল সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হলেন। ক্রুদ্ধাঙ্গ মামলুক সৈন্যরা মেঙ্গু তিমুরকে এমনভাবে ধাক্কা খেতে খেতে করে বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে দেয় যে, তার লাশ আর খুঁজেই পাওয়া যায়নি! সেই ৫ হাজার রাজকীয় মোঙ্গল সৈন্যদের অধিকাংশই কায়সারিয়ার ভয়াবহ যুদ্ধে নিহত হয়। শোকাহত বাইবার্সের আদেশে গুর্জ দিয়ে মাথার খুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রাজকীয় বাহিনীর অবশিষ্ট আহত সৈন্যদেরও যুদ্ধক্ষেত্রেই হত্যা করা হয়।

আলবিস্তান ও কায়সারিয়ার শানদার বিজয়েও সুলতান বাইবার্স খুশি হতে পারলেন না! তিনি সবসময় বিমর্ষ হয়েই থাকতেন। এর কারণ জানতে চাইলে বাইবার্স বলতেন: “আমি কীভাবে আনন্দিত হব? অথচ আলবিস্তানে আমার বাম বাহুটাই বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিলো, ১০ হাজার মামলুক অশ্বারোহী ৩০ হাজার মোঙ্গল অশ্বারোহীর মুখোমুখি হলেও পরিশেষে আমরাই তাদের পরাজিত করব। কিন্তু আলবিস্তানে আমার গোটা বাহিনী মাত্র ৭ হাজার মোঙ্গল সৈন্যের মোকাবেলা করেই নাকাল হয়ে পড়েছিল। মোঙ্গলরা আমার অন্তরকে ব্যথা-যাতনায় ভরে দিয়েছে। কিন্তু মহান আল্লাহর কৃপায় আমরাই এখনো টিকে আছি, মোঙ্গলরা পরাজিত হয়েছে। যদি আল্লাহর করুণা আমাদের প্রতি না থাকতো এবং বরাবরের মতো তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ বা বেশি হতো তবে তারাই বিজয়ী আর আমরা পরাজিত হতাম। তাহলে ব্যাপারটা মোটেই সুখকর হতো না।”

এমনই ছিলেন বাইবার্স। তিনি কখনোই আত্মতৃপ্তিতে ভোগতেন না। আত্মসন্তোষ, অমিতাচার তার ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারতো না। কোনো যুদ্ধজয়ের কৃতিত্বই একা নিজের ভাগে নিতেন না। বিরাট যুদ্ধজয়ের চেয়েও বাইবার্স বেশি গুরুত্ব দিতেন তার সৈনিকদের সার্বিক নিরাপত্তা ও কল্যাণের প্রতি। একারণেই দেখা যেতো, একটু বেশি সেনাক্ষয়ের বিনিময়ে বিরাট বিজয় অর্জিত হলেও তিনি প্রায়ই অতৃপ্ত ও বিষণ্ণ থাকতেন। ঠিক এমনটাই হয়েছিল, আলবিস্তানের বিপর্যয় পরবর্তী সময়ে।

২৩ এপ্রিল ১২৭৭ সাল। সুলতান বাইবার্স বিজয়ী বেশে কায়সারিয়া শহরে প্রবেশ করেন। সর্বত্র নাকারা পিটিয়ে মুসলিমদের বিজয়বার্তা প্রচার করা হয়। সেদিন ছিল ঈদুল আযহা। সুলতান বাইবার্সের আদেশে প্রত্যেক সামর্থবান মুসলিম পশু জবাই করে সোল্লাসে ঈদ উদযাপন করেন। টানা চৌত্রিশ বছর পর আনাতোলিয়া অঞ্চলে এই পশু জবাই প্রকারান্তরে মোঙ্গল দাঙ্গাগুলির বিরুদ্ধে কষে চপেটাঘাতেরই নামান্তর। মোঙ্গল শাসিত আনাতোলিয়ায় সুলতান বাইবার্সের নেতৃত্বে ঈদুল আযহা পালন নিঃসন্দেহে ইসলামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। কারণ কুরবানি তো বহুদূর খাওয়ার জন্য হলেও গলা কেটে পশু জবাই মোঙ্গলদের কাছে মহাপরাধ হিসেবে গণ্য হতো। অথচ কী আশ্চর্য! নির্বিচারে মানুষ হত্যা এদের কাছে কোনো ব্যাপারই ছিলো না। এ যেন আধুনিক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সেকেলে সংস্করণ! বৌদ্ধধর্মে “জীব হত্যা মহাপাপ”। কিন্তু বর্তমান সময়ে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য, থাইল্যান্ডের পাতানি প্রদেশসহ প্রায় সকল বুদ্ধিস্ট অঞ্চলেই মুসলিমদের উপর চলছে নির্মম গণহত্যার তাণ্ডবলীলা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ—এরা অন্তত প্রাণী; কিন্তু এদের

চোখে মানবসভ্যতারই শ্রেষ্ঠ জাতি মুসলিমরা তা-ও না। তদ্রূপ একই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সেকালের বর্বর মোঙ্গলদেরও।

মূলত দুটি কারণে মুসলিমরা তখন মোঙ্গলদের চক্ষুশূল ছিল। প্রথমত খাওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহর নামে পশু জবাই করা। যা না করলে মুসলিমদের জন্য কোনো পশুই হালাল হয় না। দ্বিতীয়ত প্রবহমান পানিতে হাত মুখ ধোয়া, অজু-গোসল করা। এটাও মুসলিমদের জন্য অপরিহার্য। কেননা পবিত্রতা হাসিল ছাড়া কোনো ইবাদতই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। অথচ মোঙ্গলদের বিচিত্র আইনে মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক এ দুটি কাজই ছিল চরম গর্হিত, দণ্ডনীয় অপরাধ। অর্থাৎ পশু খেতে চাইলে জবাই ছাড়া অন্য যে কোনো পন্থায় মেরেই তবে খেতে হবে। মুসলিমদের জন্য যা মেনে চলা অসম্ভবই ছিল। আর প্রবহমান পানিতে সরাসরি হাত-মুখ না ধুয়ে, আবদ্ধ পানিতে বা পাত্র দিয়ে পানি ব্যবহার করতে হবে। যা মানা অসম্ভব না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই দুষ্কর হয়ে উঠতো। মোঙ্গলদের নিষিদ্ধ এ দুটি আইন মুসলিম বিধানে অবশ্য পালনীয় হওয়ায় তারা মুসলিমদেরকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতো।

তৎকালীন মোঙ্গল শাসিত সকল রাজ্যেই এ দুটি কাজ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় ছিল। এমনকি এই তুচ্ছ দুটি কাজ করার অপরাধে মুসলিমদেরকে প্রাণদণ্ডও দেয়া হতো। ১২৪৩ সালের পর থেকে দীর্ঘ ৩৪ বছর যাবত এই একই বিধান মোঙ্গল শাসিত আনাতোলিয়া অঞ্চলেও জারি ছিল।

কায়সারিয়া যুদ্ধজয়ের পর সুলতান বাইবার্স তাই প্রকাশ্যে ঈদুল আযহা পালন করেন। শুধু তাই নয়; প্রত্যেক সৈন্য ও অধিবাসীকে সামর্থ অনুযায়ী কুরবানি করতেও নির্দেশ দেন। এমনকি নামাজের জন্য প্রবহমান নদী ও খালেই অজু-গোসল করার আদেশ দেন! এভাবেই বাইবার্সের সৌজন্যে আনাতোলিয়া অঞ্চলে ইসলামের দুটি অলঙ্ঘনীয় বিধান ফের জারি হলো!

সুলতান বাইবার্স কায়সারিয়ায় অবস্থানকালেই সেখানকার মুসলিম অধিবাসী ও কারামানিয়ান তুর্করা বাইবার্সের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। এদিকে হামাহ থেকে প্রেরিত আইবাক আশ শাইখির নেতৃত্বাধীন নতুন বাহিনী তখনো এসে পৌঁছায়নি। তার উপর মোঙ্গল শাসিত আনাতোলিয়ায় নিরাপদ সরবরাহের নিশ্চয়তা না থাকায় কেন্দ্র থেকে তখন মামলুক বাহিনীর রসদও আসছিল না। তাই সুলতান বাইবার্স ঈদ উদযাপনের পরদিনই নিজ রাজ্যের উদ্দেশ্যে সৈন্যে রওয়ানা হন। বাইবার্স হালবে পৌঁছেই মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে নতুন যুদ্ধ শুরু লক্ষ্যে সর্বাত্মক সৈন্যদের রসদ সরবরাহের ব্যাপারটি নিশ্চিত করেন এবং হামাহ থেকে আগত নতুন সৈন্যদের ডেকে পাঠান।

বাইবার্স যতোদিন আনাতোলিয়ায় ছিলেন মোঙ্গল নিযুক্ত পারওয়ানা ততোদিন আত্মগোপনে ছিলেন। বাইবার্স আনাতোলিয়া থেকে চলে যাওয়ামাত্রই তিনি আত্মপ্রকাশ করে বাইবার্সকে ব্যঙ্গ করে একখানা চিরকুট পাঠান: “এত দ্রুত চলে গেলেন কেন?” বাইবার্সও মোক্ষম জবাব দেন: “আলবিস্তানের যুদ্ধে আপনি কোথায় ছিলেন?” বাইবার্সের তীর্থক এ জবাবে পারওয়ানা তখনই চুপসে যান। তবে তিনি প্রতিশোধ নেবার প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি আদ্যোপান্ত সব জানিয়ে আবাগা খানকে চিঠি লিখেন। তার সাহায্য চেয়ে নতুন মোঙ্গল বাহিনী প্রেরণের দাবিও জানান। পারওয়ানার পত্র মারফত মোঙ্গল বাহিনীর লজ্জাস্কর বিপর্যয়ের চরম এই দুঃসংবাদ শুনে ক্রুদ্ধ আবাগা খান এবার স্বয়ং আনাতোলিয়ায় চলে আসেন। এসেই বাইবার্সের প্রতি সমর্থন জানানোর অপরাধে কায়সারিয়ার মুসলিম অধিবাসীদের উপর নিষ্ঠুর গণহত্যা চালান। কারামানীয় তুর্কদের যাদের নাগালই পাওয়া গেল তাদেরই নির্বিচারে হত্যা করা হলো।

অস্থির আবাগা খান একসময় নিজে আলবিস্তান প্রান্তরে যান। সেখানে তখন প্রাণের কোনো স্পন্দনই ছিল না। শুধু পঁচা-গলা ছিন্ন-ভিন্ন অগণিত মোঙ্গল সৈন্যের লাশই পড়েছিল। হৃদয়বিদারক এ অবস্থা দেখে আবাগা খান ক্রোধে ফুঁসে উঠলেন। যখন জানতে পারলেন যুদ্ধের সময় পারওয়ানা যুদ্ধক্ষেত্রের ধারে-কাছেও ছিলেন না তখন তিনি আরো ক্রুদ্ধ হন। পারওয়ানাকে সাথে সাথেই অন্ধ করে দেন। কিন্তু আবাগা খানের উপদেষ্টারা পারওয়ানার প্রাণদণ্ড দাবি করলে আবাগা খান পারওয়ানাকে এবার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। পারওয়ানার দুর্গতির এখানেই শেষ নয়; পারওয়ানার দণ্ড কার্যকর হলে তার গোশত রান্না করে তা দিয়েই স্বয়ং আবাগা খান ও মোঙ্গল নেতৃবৃন্দ দুপুরের ভোজ সম্পন্ন করেন!

এদিকে ইলখানাত শাসক আবাগা খান যখন আনাতোলিয়ায় অক্ষম ক্ষোভ ঝাড়ছেন বাইবার্স তখন হালবে অবস্থান করছিলেন। আবাগা খান কর্তৃক কায়সারিয়ায় মুসলিম অধিবাসী ও কারামানীয়দের উপর গণহত্যার সংবাদ শুনে বাইবার্স খুবই মর্মাহত, ক্রুদ্ধ হলেন। তবু তিনি উস্কানিত হওয়া দিলেন না। মাথা ঠাণ্ডা রেখেই নতুন যুদ্ধের প্ল্যান সাজাতে শুরু করলেন। মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে হুট করে প্রতিশোধমূলক যুদ্ধের সিদ্ধান্ত না নিয়ে তিনি ধীরে ধীরে যুদ্ধপ্রস্তুতি নিতে লাগলেন। বাইবার্সের নির্দেশে তাই দীর্ঘদিন থেকে মামলুক সেনাদল হালবে এসে জড়ো হতে লাগলো। ক্রমেই বাড়ছে বাইবার্সের সৈন্যসংখ্যা। বাইবার্স চাচ্ছিলেন পর্যাপ্ত রসদ ও প্রয়োজনীয় সেনা সংগ্রহের পরই তিনি মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে ফয়সালামূলক একটা অভিযানে অবতীর্ণ হবেন। কারণ স্বয়ং আবাগা খান আনাতোলিয়ায় এসে পড়ায় বড় ধরনের সংঘাতের সমূহ ঝুঁকি

তখন বিদ্যমান ছিল। বাইবার্স তাই ছোটখাটো যুদ্ধে না জড়িয়ে খোদ আবাগা খানকেই ফাঁদে ফেলতে নতুন একটা চাল চাললেন। তিনি মামলুক সেনাপতি তেইবার্স আল ওয়াজিরিকে ১০ হাজার সৈন্যসহ সিলিসিয়ায় প্রেরণ করেন। কেননা আবাগা খানের আগমনে উদ্দীপ্ত হয়ে সেখানকার আর রুম্মানা শহরের আর্মেনীয় খ্রিস্টানরা ইতোমধ্যেই বিদ্রোহ করে বসেছে। অবশ্য সে বিদ্রোহের নাটেরগুরু মূলত মোঙ্গলরাই ছিল। কেননা সেখানে তখন অনেক মোঙ্গল সেনা অবস্থান করছিল। যারা আলবিস্তানের যুদ্ধের সময় দিগ্বিদিক থেকে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল।

১২৭৭ সালের মাঝামাঝিতে তেইবার্স আল ওয়াজিরি খ্রিস্টান ও মোঙ্গল অধুষিত আররুম্মানা শহরে হামলা চালান। আবাগা খান এই সংবাদে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ তার সেনাবাহিনীর একাংশকে আররুম্মানার সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। কিন্তু তেইবার্সের নেতৃত্বে মামলুকরা তীব্র আক্রমণ চালিয়ে আর্মেনীয় ও মোঙ্গলদের পরাজিত করে আর রুম্মানা অধিকার করে নেয়। বাইবার্সের আদেশে সমস্ত আর্মেনীয় ও মোঙ্গল সৈন্যদেরকে হত্যা করে কায়সারিয়া গণহত্যার চরম প্রতিশোধ নেওয়া হয়।

বাইবার্সের চাল ছিল, তেইবার্স আররুম্মানায় হামলা চালালে শহর রক্ষায় আবাগা খান নিজেই আররুম্মানায় চলে যাবেন। তখন আবাগা খানকে পেছন থেকে ধাওয়া করে বাইবার্স তাকে খাঁচায় বন্দি করবেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। কারণ আবাগা খানকে মামলুকভীতি অষ্টপ্রহর তাড়া করে ফিরছিল! আবাগা খানও তাই মামলুকদের মুখোমুখি হলেন না। তবে আররুম্মানায় তার চোখের সামনেই মোঙ্গলদের এমন করুণ পরিণতি দেখে ভীতু আবাগা খানও নিজেকে আর সংবরণ করে রাখতে পারলেন না। ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি এবার স্বয়ং বাইবার্সের বিরুদ্ধেই ৩০ হাজার মোঙ্গল সৈন্যের বিশাল এক বাহিনীকে শামের উদ্দেশে প্রেরণ করলেন। লক্ষ্য তাদের হালব। বাইবার্সের অবস্থানস্থল আবাগা খান কর্তৃক প্রেরিত বিশাল এই বাহিনী শামে পৌঁছার আগেই মামলুক অগ্রবর্তী বাহিনীর সেনাপতি আইবাক আশ শাইখি মোঙ্গল বাহিনীর প্রতি কেবল ভীতিকর এই বার্তাটাই পৌঁছে দিলেন: “সুলতান বাইবার্স ৪০ হাজার সৈন্য নিয়ে মোঙ্গলদের স্বাগত জানাতে হালবে অপেক্ষা করছেন।” ব্যস! এটুকু সংবাদ আবাগা খান পর্যন্ত পৌঁছামাত্রই তার সবে পাকিয়ে ওঠা যুদ্ধসাধ নিমিষেই উবে গেল। ভীত আবাগা খান সাথে সাথেই তার সৈন্যদের নিরাপদে ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন।

হতাশ আবাগা খান এবার আনাতোলিয়া থেকে মারাগা অভিমুখে ফিরতি যাত্রা শুরু করলেন। সবাই এটা ভাবলো যে, আবাগা খান ফিরে যাচ্ছেন; কিন্তু আবাগা

খানের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে তিনি ঘুরপথে শামের উত্তর সীমান্তে এসে হাজির হওয়ার ইচ্ছা করলেন। সাথে তার ৩০ হাজার দুর্ধর্ষ মোঙ্গল সৈন্য। আবাগার উদ্দেশ্য ছিল, উত্তর শামের হালবে অবস্থানরত বাইবার্সকে আচমকা আক্রমণ করে কুপোকাত করা। কিন্তু আবাগার সে খাহেশও পূরণ হলো না। কারণ আবাগার উপর বাইবার্স সার্বক্ষণিক নজর রাখছিলেন। বাইবার্স ছিলেন চালাকের বাপ! আবাগার অনক্ষ্যে তিনি তাই আনাতোলিয়া থেকেই আবাগার পিছু নিলেন। আবাগার মতো বাইবার্সেরও উদ্দেশ্য ছিল সুবিধামতো স্থানে হঠাৎ করেই আবাগার উপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। কিন্তু কুদরতের কী আজব ফয়সালা! বাইবার্স বা আবাগা-কারো উদ্দেশ্যই পূরণ হলো না! অকস্মাৎ দুপক্ষই নিজেদের অজান্তে মুখোমুখি হয়ে গেলো বর্তমান তুরস্কের আদিইয়ামিনে। বাইবার্স ছিলেন আদিইয়ামিন প্রান্তরের দক্ষিণে আর আবাগা খান উত্তরে। দুটি বাহিনীই সবিষ্ময়ে মুখোমুখি থমকে দাঁড়ালো। তবে আদিইয়ামিন প্রান্তরে প্রকৃতপক্ষে সেদিন কোনো যুদ্ধই হলো না। বাইবার্স দর্শনেই হতভাগা আবাগা ভড়কে গেলেন। জংলী মোঙ্গলরাও আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। পুরোনো সেই মামলুকভীতি তাদের মেরুদণ্ডে ভয়ের চোরাশ্রোত বইয়ে দিলো। আবাগা খানের নেতৃত্বাধীন মোঙ্গলরা তাই কালবিলম্ব না করেই আদিইয়ামিন থেকে উর্ধ্ব্বাশ্বাসে পালালো। তারা পালাচ্ছিল তো পালাচ্ছিলই! আর বাইবার্সের নেতৃত্বে মামলুকরা তাদের তাড়া করে ফিরছিল মাইলের পর মাইল। আবাগা খান আলবিস্তানের প্রতিশোধ নিতে যতো দ্রুত আনাতোলিয়ায় এসেছিলেন তার চেয়েও দ্বিগুণ গতিতে ফিরে যান মারাগায়। অবশ্য বাইবার্স তাদেরকে ভ্যান হুদ পর্যন্ত ধাওয়া করেছিলেন। এই পশ্চাদ্ধাবনেই আরো ৩ হাজার মোঙ্গল সৈন্যকে মামলুকরা হত্যা করে। ভ্যান হুদে এসেই বাইবার্স মোঙ্গলদের ছেড়ে দেন। নিজে চলে আসেন শামে। তিনি প্রথমে হালব, সেখান থেকে হামাহ হয়ে দামেশক পৌঁছান। দামেশকে এসেই তিনি মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে আরো একটি সর্বাঙ্গিক যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দেন।

সুলতান বাইবার্সের দামেশকে প্রত্যাবর্তন শুধু শুধু মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতির জন্যই ছিল না। নইলে প্রস্তুতি তো শামের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর হালবেও নেয়া যায়; বরং এর পেছনে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্রুসেডারদের গতিবিধির উপর নজর রাখা। যাতে প্রয়োজনে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধেও যথাসময়ে অভিযান পরিচালনা করা যায়। কারণ লেভান্টজুড়ে তখন খ্রিস্টানদের মধ্যেই গৃহযুদ্ধ চলছিল। কে জানে! গৃহযুদ্ধের দাবানল কখন কোন দিকে ছড়িয়ে পড়ে! তাছাড়া ইউরোপে বহুদিন থেকেই নতুন ক্রুসেডের সম্ভাবনা দানা বাঁধছিলো। নবম ক্রুসেডের পরাজিত সেনাপতি ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম এডওয়ার্ড

(যুদ্ধকালীন প্রিন্স এডওয়ার্ড) বাইবার্সের কাছে খ্রিস্টানদের লজ্জাজনক পরাজয় ও অপমানজনক সন্ধি কোনোমতেই মেনে নিতে পারেননি। রাজা প্রথম এডওয়ার্ডের বন্ধু থিওবাল্ড ভিসকন্টি ১২৭১ সালে পোপ প্রথম গ্রেগরি উপাধি ধারণ করে খ্রিস্টানদের পোপ নির্বাচিত হলে এডওয়ার্ড খুবই খুশি হন। বন্ধুত্বের দাবিতে তিনি পোপকে অনুরোধ করেন, বাইবার্সের বিরুদ্ধে সমস্ত খ্রিস্টান জগতকে ঐক্যবদ্ধ করে দশম ক্রুসেডের ডাক দিতে। বন্ধুর অনুরোধে পোপ প্রথম গ্রেগরি রাজি হয়ে যান। ১৫ জুলাই ১২৭৪ সালে ফ্রান্সের লিওন শহরের সেন্ট জন গির্জার সমাবেশ থেকে তিনি দশম ক্রুসেডের ডাক দেন। কিন্তু খ্রিস্টান রাজারা বাইবার্সের ভয়ে এতোই ভীত ও হতাশাস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাদের কেউই খোদ পোপের ডাকা এই ক্রুসেডে সাড়া দেননি। আসলে বাইবার্সের বিরুদ্ধে ডাকা নবম ক্রুসেডের সময় খ্রিস্টীয় জগতে ঐক্যের যে ভিত্তি গড়ে উঠেছিল, এ পর্যায়ে এসে তা পুরোমাত্রায়ই ভঙল হয়ে গিয়েছিল। সেজন্য দশম ক্রুসেডে অংশ না নিয়ে খ্রিস্টানরা বরং লেভান্তের দাবি নিয়ে নিজেরাই রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। আর এই অনৈক্য-গৃহযুদ্ধের পেছনে প্রধান ভূমিকা রেখেছিলেন ক্রুসেডের জনকরাষ্ট্র স্বয়ং ফরাসি সম্রাট প্রথম চার্লস।

তখনকার সময়ে সিসিলি, নেপলস, কান্ট্রি অব ত্রিপোলি, এমনকি ইংল্যান্ডও ফরাসি সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। উচ্চাভিলাষী ফরাসি সম্রাট প্রথম চার্লস চাইলেন, লেভান্তের খ্রিস্টান অধিকৃত বাকি অঞ্চলগুলোও নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে। সেমতে লেভান্তের কাছেই ভূমধ্যসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র সাইপ্রাসে হামলা করতে তিনি তার টেম্পলার নাইটদের নির্দেশ দিলেন। অপরদিকে কিংডম অব জেরুসালেমকে দখলে আনতে তিনি অভিনব এক চাল দিলেন। ১২৬৮ সালে বাইবার্সের দখলে যাওয়া ক্রুসেডরাজ্য এন্টিয়কের শেষ রানী ছিলেন মেরি। তিনি চার্লসের পরামর্শে ক্রুসেডরাজ্য কিংডম অব জেরুসালেমের উপর তার স্বামীর উত্তরাধিকারের দাবি তুললেন। চার্লসের উস্কানিতে খ্রিস্টজগতের কাছে তিনি দাবি জানান, যেহেতু তিনি রাজ্যচ্যুত এবং তার স্বামীও জেরুসালেম রাজ্যের একজন গর্বিত উত্তরাধিকার ছিলেন, সেহেতু জেরুসালেম রাজ্যের কর্তৃত্ব তার হাতেই অর্পণ করা হোক। কিন্তু জেরুসালেম রাজ্য সঙ্গে সঙ্গেই সে দাবি প্রত্যাখ্যান করে দেন। এর দ্বারা চার্লসের উদ্দেশ্য ছিল, জেরুসালেম রাজ্যের দাবি নিয়ে খ্রিস্টানদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হোক। এই সুযোগে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার অজুহাতে চার্লস কিংডম অব জেরুসালেমের উপর সামরিক হস্তক্ষেপ চালিয়ে একে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেবেন! বাস্তবে হলো-ও তাই। মেরির দাবির পরিপ্রেক্ষিতে খ্রিস্টীয় লেভান্টে পক্ষ-বিপক্ষ চরম গোলমাল শুরু হলো। এবার ঝোপ বুঝে কোপ দিলেন ফরাসি সম্রাট প্রথম চার্লস। তার নির্দেশে

সিসিলির ফরাসি রাজপ্রতিনিধি রজার জেরুসালেম রাজ্যের রাজধানী আক্কা আক্রমণ করে বসেন। আর এতে করেই লেভান্টে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। একপর্যায়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১২৭৭ সালে রজার আক্কা দখল করে নেন। রজারের লেভান্টে আগমন এবং সেখানকার গৃহযুদ্ধের সংবাদ পেয়েই বাইবার্স আনাতোলিয়া থেকে দামেশক চলে আসেন। কারণ ক্রুসেডারদেরকে তিনি মোটেই বিশ্বাস করতেন না। হতে পারে গৃহযুদ্ধ একটা ক্যামোফ্লেজ! হয়তো এর আড়ালেই ক্রুসেডাররা চালাকি করে মুসলিম ভূমিতে হামলে পড়তে পারে। অথচ বাস্তবে এটা কোনো চালাকি ছিল না। মুসলিম ভূমিতে ক্রুসেডারদের হামলা করার সেই মুরোদ তখন আর ছিল না। বাইবার্সের ভয়ে তারা এতোই ভীত হয়ে পড়েছিল যে, নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ করলেও মুসলিম সীমান্ত তারা ভুলেও অতিক্রম করেনি। এমনকি মামলুক ত্রিসীমানার ধারে-কাছেও ঘেঁষেনি। তবু সদাসতর্ক বাইবার্সের নির্দেশে সীমান্ত চৌকিগুলোতে কড়া প্রহরা বসানো হলো এবং সর্বত্র গুপ্তচর ছড়িয়ে দেয়া হলো। আর সুলতান বাইবার্স! তিনি তখন দামেশকে বসে একদিকে লেভান্টের চলমান ঘটনাপ্রবাহের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন, অপরদিকে মোঙ্গল-ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে নতুন যুদ্ধায়োজনের ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। অথচ ঘুণাঙ্করেও জানলেন না, তিনি আর কোনোদিনই দামেশক থেকে বেরুতে পারবেন না!



১২৭৭ সাল। দামেশক। আধুনিক সিরিয়ার রাজধানী। সারি সারি বাগান, রাশি রাশি সৌন্দর্যের অপার বিস্ময়কর এক নগরী। তিলোত্তমা এই নগরী তখনকার দিনেও ছিল অখণ্ড শামের রাজধানী। এমনকি মামলুক সালতানাতের এশীয় অংশের রাজদণ্ডের কেন্দ্রও ছিল এই দামেশক। এই দামেশক সেই দামেশক, বাইবার্স যেখানে বাল্যকালেই আইতাকিন বাদশ্বাহীর দাস হিসেবে এসেছিলেন। আর আজ! আজ তিনিই এই নগরীর নিয়ন্তা, কর্ণধার। শুধু দামেশকই নয়; তার আগুলের ইশারায় এখন পরিচালিত হয় এরকম আরো শতশত নগরী। কারণ তিনি যে এখন এশিয়া-আফ্রিকাব্যাপী বিশাল বিস্তৃত দোদও প্রতাপশালী একটা সাম্রাজ্যেরই শীর্ষ ব্যক্তি। তখনকার বিশ্বশক্তি মামলুক সালতানাতের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান-আল মালিকুয যাহির রুকনুদ্দিন বাইবার্স। সেই তিনিই এখন দামেশকে অবস্থান করছেন। সেখানে তিনি কেবলমাত্র মোঙ্গল-



ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গিক যুদ্ধের প্রস্তুতিই নিচ্ছেন না; বরং ঐতিহ্যবাহী এই শহরে বিরাট একটা পাঠাগার নির্মাণের উদ্যোগও তিনি হাতে নিয়েছেন। মাদরাসার ছাত্রদের গবেষণার সুবিধার্থে বাইবার্সের নিবিড় তত্ত্বাবধানে দ্রুততম সময়ে সেখানে তাই গড়ে উঠলো পরিকল্পিত এই আজিমুশান গ্রন্থাগার। ‘মাকতাবাতুয যাহিরিয়া’ নামে যা আজও বিশ্বখ্যাত। শুধু পাঠাগারই নয়; বরং পাঠাগারকে ঘিরে সেখানে তিনি গড়ে তুললেন বিশাল একটা স্বতন্ত্র কমপ্লেক্সই। যাতে ছিল উচ্চতর গবেষণাধর্মী মাদরাসা ও ইবাদাতের জন্য সুরম্য মসজিদ। ফলে সেখানে একই সাথে চলতো শিক্ষা, দীক্ষা, গবেষণা ও ইবাদত। বিরাট এই প্রকল্পের নির্মাণ কাজ যখন প্রায় শেষের পথে ঠিক তখনই ঘটে গেলো অনাকাঙ্ক্ষিত, অনভিপ্রেত এক বিয়োগান্তক ট্র্যাজেডি! উম্মাহর ইতিহাসেরই অন্যতম মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। যার দুঃসহ প্রভাবে জাতি হলো মুক-বধির, বিষাদগ্রস্ত। গণমানুষের চিন্তা-চেতনা হয়ে পড়লো ন্যূজ-স্থবির, জরাগ্রস্ত। থমকে দাঁড়ালো স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, সময়ের গতি।

আর দশটা যাযাবর জাতির মতো কুমানরাও ‘কুমিস’ পান করতে ভালোবাসতো। ব্যতিক্রম ছিলেন না বাইবার্সও। ‘কুমিস’ হচ্ছে ঘোড়ার দুধ থেকে তৈরি করা এক প্রকারের লাবাং (শরবত) বিশেষ। ঘোড়ার দুধে মিষ্টি থাকে বেশি পরিমাণে এবং এর পুষ্টিগুণও অনেক। তাই এই কুমিস ছিলো বাইবার্সের খুবই প্রিয় পানীয়। উল্লেখ্য, কুমিস ছিল নিঃসন্দেহে হালাল একটা পানীয়।

১ জুলাই ১২৭৭ ঈসায়ি। ২৭ মুহাররাম ৬৭৬ হিজরি সাল। প্রতিদিনের অভ্যাস মতো সুলতান বাইবার্স এদিনও যথারীতি কুমিস পান করলেন। কুমিস পান করামাত্রই বাইবার্সের চেহারা নীল বর্ণ ধারণ করতে থাকে। ধীরে ধীরে পুরো চেহারাটাই নীলাভ হয়ে যায়। ফলে উপস্থিত সবাই নিশ্চিত ধরে নেন, এই কুমিসে ভয়ঙ্কর ধরণের বিষ মেশানো ছিল! সেই বিষ এতোই মারাত্মক ছিলো যে, আল্লাহর ইচ্ছা না থাকায় হাকিমরা প্রাণান্ত চেষ্টা করেও সুলতান বাইবার্সকে বাঁচাতে পারলেন না। হাকিমদের শত আশ্বাস সত্ত্বেও ভয়াবহ এই বিষক্রিয়ার মধ্যেই সুলতান কালিমা পড়তে থাকেন এবং কালিমা পড়ার অবস্থাতেই ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ১৮ দিন কম ৫৫ বছর। তিনি দোর্দণ্ড প্রতাপে টানা প্রায় ১৭ বছর প্রশ্নাতীত নিষ্ঠা ও অদ্বৈত সততার সাথে বিশাল বিস্তৃত মামলুক সালতানাত শাসন করেন। তার ব্যক্তিগত কর্মজীবনের বেশিরভাগ সময়ই ব্যয় হয় সেনা পোশাকে। ঘোড়ার পীঠেই কাটে তার জীবন, যৌবন, কৈশোর সব। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দুর্ধর্ষ মামলুক সেনাপ্রধান হিসেবে তিনি দীর্ঘ ৩৩ বছর পূর্ণ করেন। সৈনিক জীবনে তার অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে মিশরীয়

ইতিহাসে তিনি আজও ‘কায়রোর বজ্র’, ‘আসাদুল মিশর’ (মিশরের সিংহ) অভিধায় বরণ্য। আর ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের স্মৃতিপটে তিনি আজও জাগরুক, ভীতিকর সেই একই নামে—‘দ্য প্যাস্চার’।

সুলতান বাইবার্দের মরদেহ দামেশকে তারই নির্মিত মাদরাসা-মসজিদ চত্বরের নির্ধারিত স্থানে দাফন করা হয়। এরকম চমৎকার ব্যবস্থা সুলতান নুরউদ্দিন জঙ্গি রাহ. সর্বপ্রথম চালু করেন। তারই নির্মিত নুরি মসজিদে তিনি নিজের কবরের স্থান রেখে যান। এই নুরি মসজিদের সাথে একটি মাদরাসাও ছিল। এমন সমাধি নির্মাণে তার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে মসজিদের মুসল্লি ও মাদরাসার ছাত্ররা দৈনিক তার কবর ঘিয়ারত করতে পারেন। সুলতান বাইবার্দের ও সুলতান নুরউদ্দিনের এই সুন্দর পদ্ধতিটি অনুসরণ করেন। বাইবার্দের তারই নির্মিত মসজিদের পাশে মাদরাসার নিচে নিজের কবরের জমি বরাদ্দ করে যান। সুলতান বাইবার্দের রাহ.‘র মাজারের স্থানটি বর্তমানে সিরিয়ার রাজধানী দামেশকের পুরাতন অংশে অবস্থিত। উল্লেখ্য, তার দুই পূর্বসূরী, ক্রুসেডের কিংবদন্তিভূত্য যোদ্ধা সুলতান নুরউদ্দিন জঙ্গি রাহ. ও সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী রাহ. এই দামেশকেই সমাহিত আছেন।

সুলতান বাইবার্দের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা, মসজিদ এমনকি তার সমাধির প্রতিও সিরিয়ার বর্তমান শিয়া সরকারের কোনো নজর নেই। তাই বর্তমানে কাজাখস্তান সরকারের আর্থিক সহায়তায় এগুলোর দেখভাল হয়ে আসছে। মিশরের সিংহের মৃত্যুতে শুধু মিশরই নয়; বরং গোটা মামলুক সালতানাত এমনকি পুরো মুসলিম জাহানই তখন শোকে মূহমান হয়ে পড়েছিল। কেন নয়—এই বাইবার্দেরই যে ছিলেন ক্রুসেড-মোগল তুফানের বিরুদ্ধে উম্মাহর সুদৃঢ় ছাতা। সুরক্ষাকারী মজবুত কেল্লা। সুলতান বাইবার্দের মৃত্যুতে কার্যত তারই হাতেগড়া অদম্য মামলুক বাহিনীও তখন ঝিমিয়ে পড়েছিল! তবে সেটা ছিল সাময়িক। পরবর্তীতে সুলতান কালাউনের নেতৃত্বে ক্রুসেড-মোগলদের বিরুদ্ধে তারা তাদের কার্যকারিতার প্রমাণ আরো একবার ঠিকই দিয়েছে। কে বা কারা সুলতান বাইবার্দের কুমিসে বিষ মিশিয়েছিল, তা আজও জানা যায়নি। এটা এখনো ইতিহাসের অনুদ্ব্যটিত এক রহস্যই হয়ে আছে!

মিল্লাতে ইসলামিয়ার অতন্দ্র প্রহরী সুলতান বাইবার্দের কাছে গোটা জাতিই চিরঞ্চা। কোনো প্রতিদানেই এ ঋণ শোধরানো নয়। সব বিনিময়ের ভার তাই মহান রাব্বের আলাহ উপরই ন্যস্ত রইলো। সোনালি যুগ পরবর্তী উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ এই যোদ্ধাকে মহান আল্লাহ তাআলা যথাযথ প্রতিদানে সম্মানিত করুন! আমিন!!

## পরিশিষ্ট

একনজরে সুলতান বাইবার্স রাহ.।

পূর্ণ নাম: আবুল ফাতিহ আল মালিকুয যাহির রুকনুদ্দিন বাইবার্স আল বান্দুকদারী।

মূল নাম: বে-বার্স। আরবি রূপ বাইবার্স।

নামের অর্থ: কিপচাক-কুমান ভাষায় বে অর্থ প্রধান আর বার্স মানে চিতা। অতএব বে-বার্স এর পুরো অর্থ দাঁড়ালো “প্রধান চিতা”। প্রকৃতপক্ষেই তিনি প্রতিটি যুদ্ধে চিতার ক্ষিপ্রতা দেখিয়ে তার নামের সার্থকতার প্রমাণ অজস্রবার দিয়েছেন।

রাজকীয় নাম: রুকনুদ্দিন (ধর্মের স্তম্ভ)। দ্বীনের অসামান্য খেদমত ও ইসলামের প্রতি তার অসাধারণ দায়িত্ববোধই প্রমাণ করে প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন ধর্মের স্তম্ভ।

উপাধি: আল বান্দুকদারি। বাইবার্স বাল্যকাল থেকেই আইতাকিন আল বান্দুকদার নামক জনৈক আমিরের দাস ছিলেন। তাই নিজের নামের সাথে আল বান্দুকদারী শব্দটি তিনি সর্বদাই ব্যবহার করতেন। কেননা আইতাকিন বান্দুকদার তাকে দাস হিসেবে নয়; বরং নিজ পুত্রের মতোই লালন-পালন করেছেন। সেজন্যে শত্রুর নিদর্শন হিসেবে সুলতান হবার পরও বাইবার্স তার নামের সাথে এই উপাধিটি ব্যবহার করতেন।

রাজকীয় উপাধি: মালিক আয যাহির (প্রকাশ্য রাজা)। তিনি রাজকর্ম ও যুদ্ধক্ষেত্রে সমান বিচক্ষণ-পারদর্শী ছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা। তাই সিংহাসনে আরোহণের সময় উলামাদের পরামর্শে তাদেরই দেয়া এই উপাধিটি তিনি গ্রহণ করেন।

উপনাম: আবুল ফাতিহ (বিজয়ীর পিতা)। দীর্ঘ ৩৩ বছরের যুদ্ধজীবনের কোনো একটিতেও তিনি পরাজিত হননি। তার নেতৃত্বে পরিচালিত প্রতিটি যুদ্ধেই মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হয়েছে। সেজন্যেই মামলুক সাম্রাজ্যের উলামারা বাইবার্সকে অনন্য এই উপাধিতে ভূষিত করেন।

জন্ম: ১৯ জুলাই ১২২৩ সাল।

জন্মস্থান: আধুনিক কাজাখস্তানের কিপচাক ভ্যালি, রাশিয়ার উরাল ও ভল্গা নদীর মধ্যবর্তী ককেশাস পর্বতমালার পাদদেশে বৃহত্তর সারকোসিয়ায় অবস্থিত।

নৃতাত্ত্বিক পরিচয়: কিপচাক-কুমান বংশোদ্ভূত।

ভূতাত্ত্বিক পরিচিতি: সারকাসিয়ান।

ভাষা: কিপচাক-কুমান (তুর্কি)।

ধর্ম: ইসলাম।

মতাদর্শ: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ (সুন্নি)।

মাযহাব: হানাফি।

দৈহিক গড়ন: প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ মতে বাইবার্স ছিলেন অনেকটাই লম্বা-চওড়া গড়নের। বহু লোকের মাঝেও তার উঁচু মাথা চোখে পড়তো। তার কণ্ঠ ছিল গমগমে-ভারী। চুল ও দাড়ি ছিল স্বর্ণাভ। গোফ ছিল পাতলা অথচ ঝুল ছিল লম্বা। যুদ্ধের সময় গোফের দুই প্রান্ত তিনি পাকিয়ে রাখতেন। চোখের মণি ছিল গাঢ়ো নীল বর্ণের। ছানীর কারণে ডান চোখে তিনি কম দেখতেন। সময় নষ্ট হবে বলে সিংহাসনে আরোহণের পরও তিনি চোখের চিকিৎসা করাননি। তার কাঁধ ছিল প্রশস্ত।

গায়ের রঙ: বাইবার্সের গায়ের রঙ ছিল ধবধবে ফর্সা। তবে মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম ও টানা যুদ্ধাভিযানের কারণে শেষ বয়সে তার গায়ের রঙ পুড়ে অনেকটাই কালচে হয়ে গিয়েছিল।

মেজাজ: তার মেজাজ ছিল কড়া। নীতির ক্ষেত্রে আপোসহীন। বিশেষত মোঙ্গল ও ক্রুসেডারদের সাথে কথা বলার সময় তার মেজাজ আরো চড়া থাকতো। একারণেই খ্রিস্টানরা বাইবার্সকে উম্মেজাজি ও কর্কশ মনে করতো।

দাম্পত্য সঙ্গিনী: মুসাম্মাত আনতারা। একমাত্র স্ত্রী ছাড়া বাইবার্স অন্য কোনো নারী এমনকি ক্রীতদাসীর সাথেও মেলামেশা করতেন না।

সন্তান-সন্ততি: পারিবারিক জীবনে বাইবার্স তিন পুত্র ও সাত কন্যা সন্তানের জনক ছিলেন। পুত্র সন্তানদের মধ্য থেকে পরবর্তীতে আল বারাকাহ ও সুলামিশ সুলতান হয়েছিলেন।

বাহরি মামলুক সেনাপ্রধানের দায়িত্বে: ৩৩ বছর। ১২৪৪-১২৭৭ সাল।

সর্বপ্রথম যুদ্ধ: আল হারাবিয়াহ ১২৪৪ সাল। ষষ্ঠ ক্রুসেডে সুলতান আস সালিহ কর্তৃক পরিচালিত জেরুসালেম উদ্ধার অভিযানে।

সর্বশেষ যুদ্ধ: আনাতোলিয়ার যুদ্ধ ১২৭৭ সাল। সালজুক ক্রুসেডে উদ্ধারে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে মামলুক সালতানাত কর্তৃক পরিচালিত অভিযান।

আবিষ্কার: মিদফা। বাইবার্স আবিষ্কৃত পৃথিবীর প্রথম হাতকর্ত্তমান। যার সর্বপ্রথম ব্যবহার আইন জালুত প্রান্তরে হয়েছিল। এটা মূলত ছিলো মোঙ্গলদের অবিশ্বাস্য দূরপাল্লার ধনুকের জবাব। চলন্তাবস্থায় নিক্ষেপযোগ্য এ মিদফার অগ্নিগোলা অনেক দূরে গিয়ে আঘাত হানতো। ব্যাপক ধ্বংসশীল এ মিদফা ছিলো তখনকার সময়ের সর্বাধুনিক অস্ত্র।

মামলুক সিংহাসনে আরোহণ: ৩৭ বছর বয়সে। ২৪ অক্টোবর ১২৬০ সাল।

রাষ্ট্র পরিচালনা: ১৬ বছর ৮ মাস ৬ দিন। ১২৬০-১২৭৭ সাল।

মৃত্যু: বৈশাখ প্রয়াগে। ২৭ মুহাররাম ৬৭৬ হিজরি, ১ জুলাই ১২৭৭ সাল।

মৃত্যুকালে বয়স: ৫৩ বছর ১১ মাস ১৩ দিন।

মৃত্যুস্থান: বর্তমান সিরিয়ার রাজধানী দামেশকের পুরাতন অংশ।

সমাধি: মাকতুবাভূয় যাহিরিয়ার মাদরাসা-মসজিদ চত্বর, পুরাতন দামেশক, সিরিয়া।

উল্লেখযোগ্য সামরিক কৃতিত্ব: দ্বিতীয়বার বাইতুল মাকদিস উদ্ধার। দ্বিতীয় দফায় আব্বাসীয় খিলাফাহর পুনঃপ্রতিষ্ঠা। টানা চারটি ক্রুসেডের সফল মোকাবেলা। প্রায় পুরো লেভান্ট অধিকার করে ভূমধ্যসাগরে মুসলিম বিশ্বের অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। শাম সাগরের উপকূলীয় চারটি ক্রুসেডরাজ্যের মধ্যে দুটিকেই (এন্টিয়ক, সিলিসিয়া) মামলুক সালতানাতভুক্ত করা। বাকি দুটির মধ্যে একটির (জেরুসালেম) অধিকাংশ, অপরটির (ত্রিপোলি) কিয়দাংশ দখলে আনা। প্রচণ্ড গতিময় মোঙ্গল তুফানের কার্যকর প্রতিরোধ। আইন জালুত, হিমস, আলবিস্তানসহ ক্রমাগত অসংখ্য যুদ্ধের মাধ্যমে ইলখানি মোঙ্গলদের কোমর ভেঙ্গে দেয়া। বিশ্বত্রাস হাশাশিন গুপ্তঘাতকদের সমূলে উচ্ছেদসহ অজস্র সুকীর্তিতে মুসলিম ইতিহাসে তিনি আজও হয়ে আছেন অক্ষয়, চিরঅমর। মহাকালের সুবিস্তৃত দর্পণেও তাই অনেকগুলো নামের ভিড়ে আলাদা মাহাত্ম্যে সদা জ্বলজ্বল করছে একটাই নাম রুকনুদ্দিন বাইবার্স-‘দ্য প্যাছার’!!

The Online Library of Bangla Books

**BANGLA BOOK**.ORG

## গ্রন্থপঞ্জি

□ আল মুকাদ্দিমা ।

আবু জায়েদ আবদুর রাহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন খালদুন ।

দিব্যপ্রকাশ থেকে বাংলায় অনূদিত ।

□ ইসলামি বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ড ।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত ।

□ সিরাত আজজাহির বাইবার্স ।

জামাল আল গাইতানি কর্তৃক কায়রো থেকে প্রকাশিত ।

□ তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলক ।

মুহাম্মাদ ইবন জারির আততাবারি রাহ. ।

□ তারিখুল মালিক আজজাহির ।

ইযযুদ্দিন ইবন শাদ্দাদ রাহ. ।

□ হুসনা আল মুহাদারা আখবারুল মিসরি ওয়াল কাহিরাহ, দ্বিতীয় খণ্ড ।

আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি রাহ. । কায়রো থেকে প্রকাশিত ।

□ Sultan Baibars & Mamluks নামের ফেসবুক পেজ ।

□ সমসাময়িক বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও ফিচার ।

---

The Online Library of Bangla Books

**BANGLA BOOK**.ORG